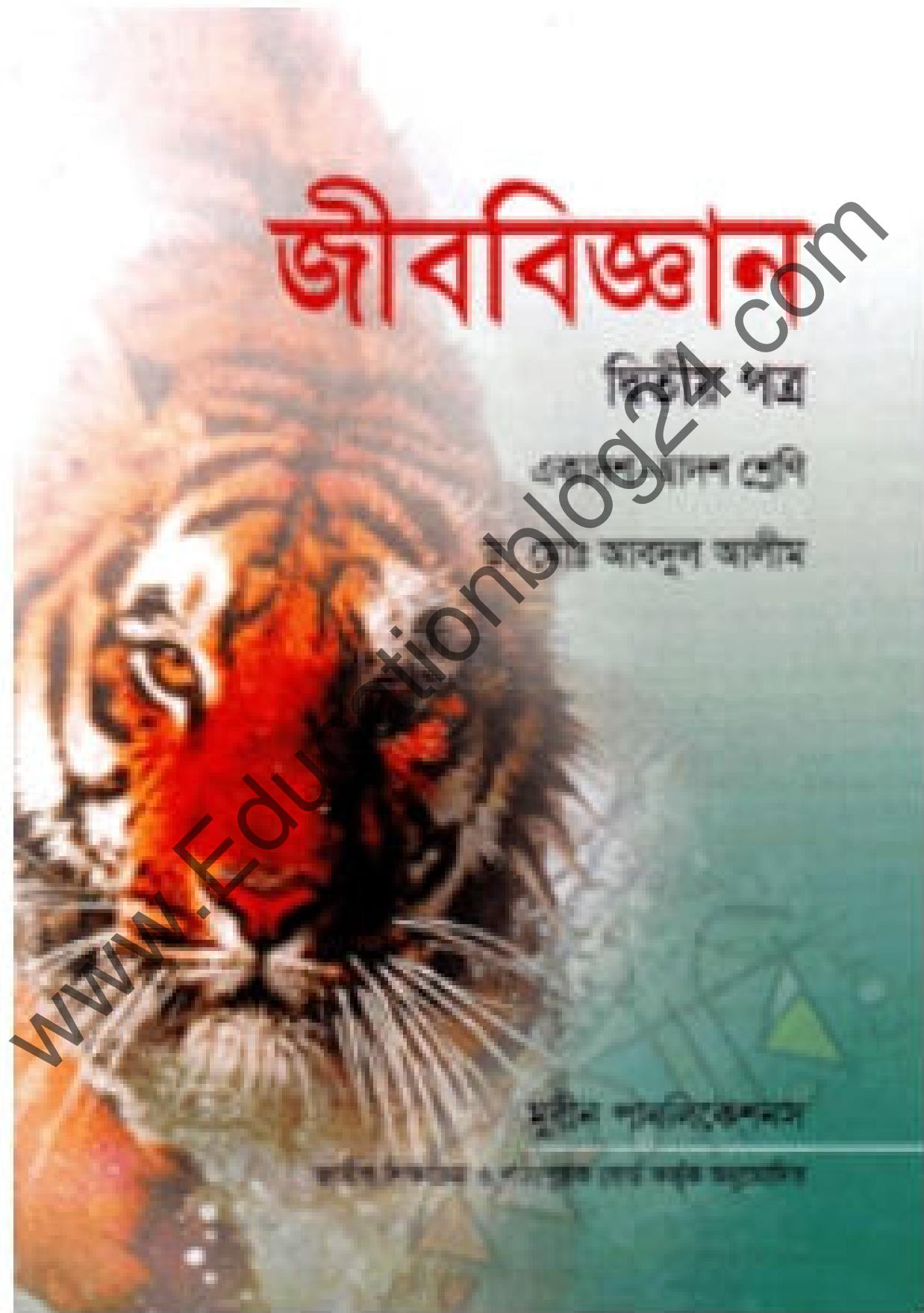


জীববিজ্ঞান

মিলন প্রক্ষেপ

একাডেমিক প্রক্ষেপ

ডঃ আবদুল আলীম

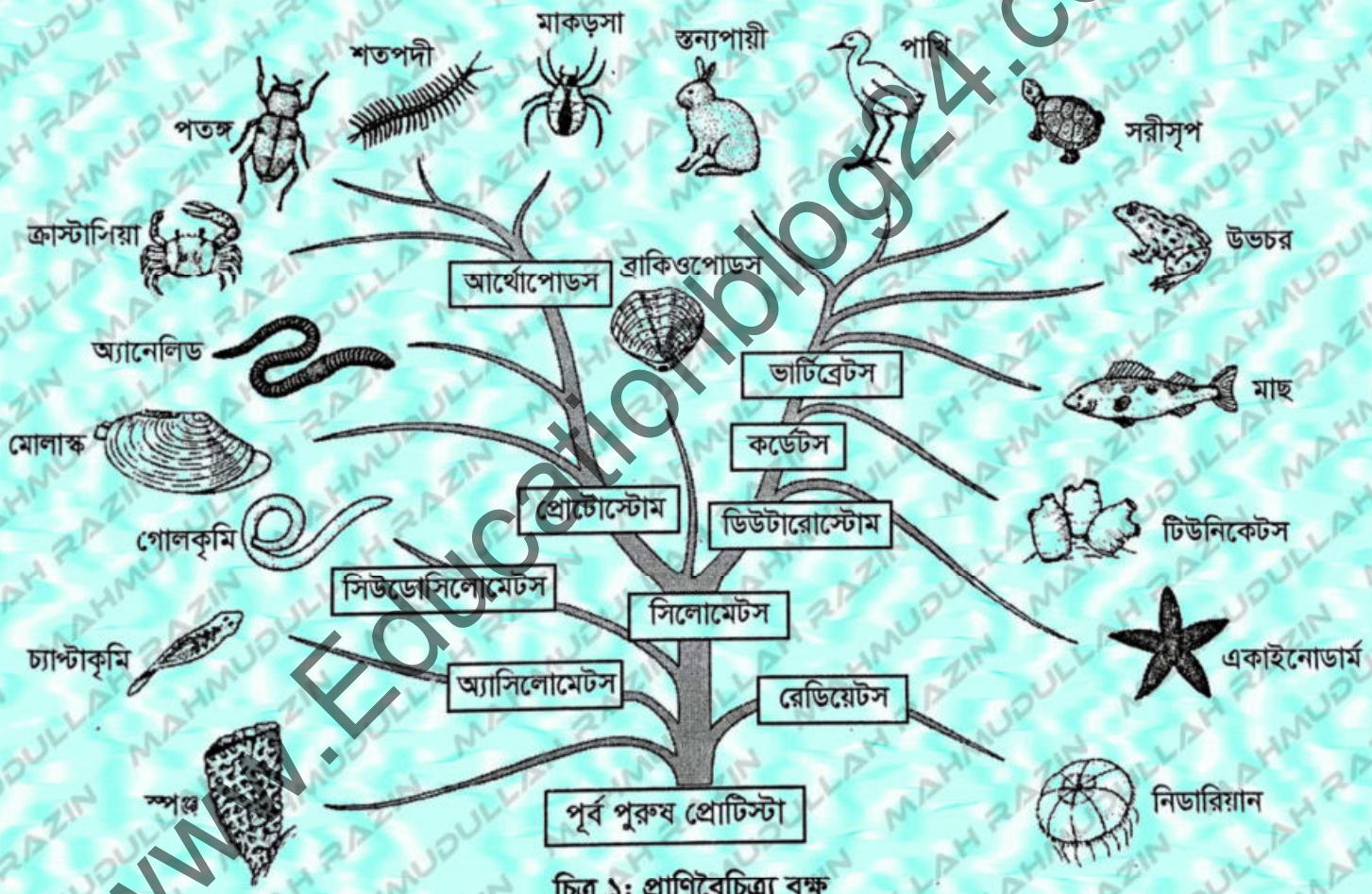


অধ্যায় ১

প্রাণীর ভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর জীবজগতে দুটি ধারা বিকশিত। একটি ধারা উড়িজগত এবং অন্যটি প্রাণিজগত। Animalia রাজ্যের অন্তর্গত বহুকোষী (metazoa) জীবদের প্রাণী বলা হয়। ধারণা করা হয়, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের 10 থেকে 20 মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণী বাস করে, তবে বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় 1.3 মিলিয়ন প্রাণীর বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতিতে প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। সহজভাবে অধ্যয়ন করার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীগণ এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words): প্রাণিবৈচিত্র্য, প্রতিসাম্য, খঙ্কায়ন, প্রাক্তিকতা, ক্লিভেজ, জগীয় স্তর, শিলোম, দ্বিতীয় প্রাণী, ত্রিতীয় প্রাণী, ট্যাক্সোনমিক হায়ারাকি, দ্বিপদ নামকরণ, নামের বৈধতা, নন-কর্ডাটা, কর্ডাটা।



পিরিয়ড সংখ্যা ৭। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)-

- প্রাণিজগতের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ভিত্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নন-কর্ডাটা প্রাণীকে পর্ব পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে।
- কর্ডাটা প্রাণীকে শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে।
- ব্যবহারিক-বিভিন্ন প্রাণী শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।

১.১ প্রাণিগতের ভিন্নতা

যেসব জীব নিজ দেহে খাদ্যের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ধিদের উপর নির্ভরশীল তাদের প্রাণী (animals) বলে। প্রাণীর কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- ১। প্রাণীরা জটিল বহুকোষী (multicellular) পরভোজী জীব।
- ২। প্রাণিকোষে উদ্ধিদ ও ছাঁআকের মতো কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না; প্রাণিকোষে প্রোটিন ও লিপিড নির্মিত প্লাজমা আবরণী (plasma membrane) দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে; এদের কোষে সেন্ট্রিওল থাকে।
- ৩। প্রাণিদেহে স্লায়কোষ ও পেশিকোষ নামক বিশেষ দুধরনের কোষ রয়েছে যারা যথাক্রমে প্রাণীর উদ্দীপনা পরিবহন ও চলনে সহায়তা করে।
- ৪। অধিকাংশ প্রাণীই যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন করে যেখানে ডিপ্লয়েড দশা প্রধান; জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজনন ও মৃত্যু এসব ধাপে প্রাণীর সুনির্দিষ্ট জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির ও ধরনের প্রাণীদের প্রাণিবৈচিত্র্য বলে। পৃথিবীর মাটি, বায়ু ও পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত ও প্রজাতিগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য বলে।

প্রকৃতিতে তিন ধরনের প্রাণিবৈচিত্র্য দেখা যায়, যথা-

১। জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity): জিনগত ভিন্নতার কারণে যখন একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তখন তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে। এক্ষেত্রে প্রজাতিতে রেস (race), জাত (variety) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। যেমন-বিশেষ সকল মানুষ *Homo sapiens* প্রজাতিভুক্ত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর Negroid, Mongoloid, Caucasoid ইত্যাদি রেস দেখা যায়। রেশম পোকা, ধান, গম, ইঙ্গু ইত্যাদি জীবের একই প্রজাতিতে একাধিক জাত (varieties) দেখা যায়।

২। প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity): ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে। কখনোই দুটি প্রজাতির প্রাণী একরকম হয় না। একই গতভূক্ত প্রজাতির মধ্যেও ক্রোমোসোম সংখ্যা ও আঙিক গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- বাঘ (*Panthera tigris*) ও সিংহ (*Panthera leo*) একই গণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

৩। বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (Ecological diversity): পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর সাথে জীবজগতের মিথস্ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশীয় একক বা বায়োম সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বায়োমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় প্রাণিগত রয়েছে। বিভিন্ন বায়োমে বিদ্যমান প্রাণিগতের বৈচিত্র্যকে বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য বলে। বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের কারণে তুন্দা অঞ্চলে সাদা ভালুক এবং বনভূমি অঞ্চলে কালো ভালুক দেখা যায়।

প্রাণীর ভিন্নতার পরিমাপ

জীববিজ্ঞানগত এ পর্যন্ত 1.3 মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণী শনাক্ত করেছেন। ধারণা করা হয় পৃথিবীতে প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা আরো অনেক বেশি, প্রায় 10-20 মিলিয়ন, অন্তেকের মতো এ সংখ্যা 100-200 মিলিয়ন। পৃথিবীতে প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যার প্রকৃত তথ্য মানুষ আজও নির্ণয় পারেনি। মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা জিনগত বৈচিত্র্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ এর ব্যপকতা অনেক বেশি। প্রজাতি বৈচিত্র্য সম্পর্কে মানুষের কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

Lecointre and Guyader (2001)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান প্রধান প্রধান প্রাণীর একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক তালিকা পাশে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	সাধারণ নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতি
1	স্পঞ্জ	10,000
2	নিডারিয়ান	9,000
3	নেমাটোড	20,000
4	অ্যারাকনিড	74,445
5	ক্রাস্টিসিয়ান	38,839
6	ইনসেষ্ট	827,875
7	রটিফার	1,800
8	চ্যাপ্টাকৃমি	13,780
9	মোলাক্ষ	117,495
10	অ্যানেলিড	14,360
11	একাইনোডার্ম	6,000
12	কোমলাস্থিযুক্ত মাছ	846
13	অস্থিযুক্ত মাছ	23,712
14	জীবিত উভচর	4,975
15	জীবিত কচ্ছপ	290
16	লিঙার্ড ও সাপ	6,850
17	পাখি	9,672
18	স্তন্যপায়ী	4,496

১.২ প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি ও নীতি

আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পারম্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী প্রাণীদের রাজ্য, পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতিতে দলভুক্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস (Classification) বলে। প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার শুরু থেকেই অনেক বিজ্ঞানী প্রাণীদের শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। জীবদের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-1778)। তাঁকে আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক (Father of Taxonomy) বলা হয়।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

কিছু সুস্পষ্ট ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। যেসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা হয় সেসব বৈশিষ্ট্যই প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিসমূহ হলো-

- | | |
|--|---|
| ১। সংগঠন মাত্রা (Levels of organization) | ৭। দেহ অক্ষ ও তল (Body axes and plane) |
| ২। প্রতিসাম্য (Symmetry) | ৮। সিলোম (Coelom) |
| ৩। খঙ্কায়ন (Metamerism) | ৯। ক্লিভেজ ও পরিস্ফুটন (Cleavage and development) |
| ৪। অঞ্চলায়ন (Tagmatization) | ১০। জৰীয় স্তর (Germ layers) |
| ৫। উপাঙ্গ (Appendages) | ১১। নটোচোর্ড (Notochord) |
| ৬। প্রান্তিকতা (Polarity) | ১২। মেরুদণ্ড (Vertebral column) |

নিম্নে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান কয়েকটি ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। সংগঠন মাত্রা (Levels of organization)

প্রাণীর দৈহিক গঠনের কোষীয় সংগঠন মাত্রায় ভিন্নতা দেখা যায়। সংগঠন মাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

(ক) কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী (Cellular level of organization): এক্ষেত্রে প্রাণীর দেহের কোষগুলো হালকাভাবে সজ্জিত থেকে দেহ গঠন করে। উদাহরণ- Porifera পর্বের সকল প্রাণী।

(খ) কোষ-কলা সংগঠন মাত্রার প্রাণী (Cell-tissue level of organization): এক্ষেত্রে প্রাণীর দেহে বিদ্যমান একই কাজে নিয়োজিত কোষগুলো কলা গঠন করে। উদাহরণ- Cnidaria পর্বের সকল প্রাণী।

(গ) কলা-অঙ্গ সংগঠন মাত্রার প্রাণী (Tissue-organ level of organization): এক্ষেত্রে প্রাণীর দেহে বিদ্যমান বিভিন্ন কলা দলবদ্ধ হয়ে কলা গঠন করে। উদাহরণ- Platyhelminthes পর্বের সকল প্রাণী।

(ঘ) অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার প্রাণী (Organ system level of organization): এক্ষেত্রে প্রাণীর দেহে বিদ্যমান কলা ও অঙ্গগুলো সম্পর্কিতভাবে অঙ্গ-তন্ত্র গঠন করে। উদাহরণ- Nematoda, Annelids, Mollusca, Arthropods, Echinodermata ও Chordata পর্বের সকল প্রাণী।

২। প্রতিসাম্য (Symmetry)

অক্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের বিভাজন প্রকৃতিকে প্রতিসাম্য বলে। অর্থাৎ প্রাণিদেহকে কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সদৃশ্য সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মকে প্রতিসাম্য বলে। প্রাণিজগতে প্রধানত চার ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়:

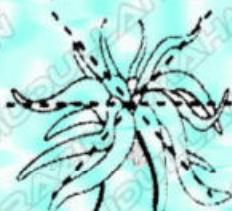
(ক) দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry): যখন কোনো প্রাণিদেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর অনুদৈর্ঘ্যভাবে কেবল একবার দুটি সমান অংশে (ডান ও বাম অংশ) ভাগ করা যায় তখন তাকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বলে। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য প্রাণীর শ্রেণিভাস্তুক ধাপ বাইলেটারিয়ায় (Bilateria) স্থাপন করা হয়। এরা অঙ্গ সংগঠন মাত্রার ত্রিতীয়ী প্রাণী। যেমন- Platyhelminthes, Nematoda, Annelids, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata ও Chordata পর্বের প্রাণী।

(৬) অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry): যখন কোনো প্রাণিদেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর যে কোনো তলে সমান অংশে বিভক্ত করা যায় তখন তাকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। অরীয় প্রতিসাম্য প্রাণীর শ্রেণিতাত্ত্বিক ধাপ রেডিয়াটার (Radiata) হিসেবে করা হয়। এরা কলা সংগঠন মাত্রার বিস্তরী প্রাণী। যেমন- Cnidaria ও Ctenophora পর্বের প্রাণী।

জেলিফিসে অরীয় প্রতিসাম্যতার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এদের দেহে চারটি নালী সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে যার ফলে একটি চতুর্বীয় প্রতিসাম্যতা (tetramerism) সৃষ্টি হয়। একাইনোডার্ম জাতীয় কিছু প্রাণী যেমন- সমুদ্র তারা (sea stars), সমুদ্র আর্চিন (sea urchins), সমুদ্র লিলি (sea lilies) ইত্যাদি প্রাণীতে বিশেষ ধরনের পঞ্চঅরীয় প্রতিসাম্যতা (pentamerism) দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্র থেকে সমদ্রুতভাবে দেহের পাঁচটি অংশ বিচ্ছুরিত হয়।



দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য
(মানুষ)



অরীয় প্রতিসাম্য
(নিডারিয়ান)



পঞ্চঅরীয় প্রতিসাম্য
(সমুদ্র তারা)



দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য
(অ্যান্থোজোয়ান)



গোলীয় প্রতিসাম্য (প্রোটোজোয়া)



চতুর্বীয় প্রতিসম (জেলিফিস)



অপ্রতিসাম্য (স্পঞ্জ)

চিত্র ১.২ প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য

(গ) দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry): যখন কোনো প্রাণিদেহকে উহার মৌখিক-পরাঙ্গমৌখিক অক্ষ বরাবর দুটি তলে সমানভাবে বিভক্ত করা যায় তখন তাকে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য বলে। Ctenophora ও Anthozoa জাতীয় প্রাণীতে এ ধরনের প্রতিসাম্যতা দেখা যায়।

(ঘ) গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry): যখন কোনো গোলাকার জীবদেহকে উহার কেন্দ্র বরাবর দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা যায় তখন তাকে গোলীয় প্রতিসাম্য বলে। Radiolarian protozoa জাতীয় প্রোটিস্টাতে এ ধরনের প্রতিসাম্যতা দেখা যায়।

(ঙ) অপ্রতিসাম্য (Asymmetry): যখন কোনো প্রাণিদেহকে উহার কেন্দ্রীয় অক্ষ বা অন্য কোনো তলে সমানভাবে বিভক্ত করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্যতা বলে। Porifera (স্পঞ্জ) ও পরিণত Gastropod (Mollusca) জাতীয় প্রাণীতে অপ্রতিসাম্যতা দেখা যায়।

প্রাণিজগতে প্রতিসাম্যতার সুবিধা

- দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা প্রাণীর মন্তকায়নের সাথে জড়িত অর্থাৎ এদের দেহের সম্মুখ প্রান্ত বিশেষায়িত হয়ে মন্তক গঠন করে যেখানে শ্বাস, সংবেদী ও খাদ্য গ্রহণকারী অঙ্গসমূহের কেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়।
- দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমন একটি আকৃতি প্রদান করে যাতে এরা একটি দিকে দ্রুত চলতে পারে।
- অরীয় প্রতিসাম্যতা প্রাণীর খাদ্য সংগ্রহ ও প্রতিরক্ষায় সহায়তা করে।

৩। খণ্ডকায়ন (Metamerism)

প্রাণিদেহে এক্টোডার্ম ও মেসোডার্ম উভ্যত সদৃশ্য একাধিক খণ্ডের রৈখিক বা অনুদৈর্ঘ্যিক পুনরাবৃত্তিকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম বলে। এরূপ প্রাণিদেহের প্রতিটি অংশকে খণ্ড বা segment বা somite বা metamere বলে। মেটামেরিজম প্রকৃত বা অপ্রকৃত ধরনের হতে পারে। Annelida পর্বের প্রাণীদের প্রকৃত খণ্ডায়িত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সেস্টোড (ফিতাকুমি) জাতীয় প্রাণিদেহে অপ্রকৃত মেটামেরিজম বা অপ্রকৃত খণ্ডায়ন দেখা যায়।

খঙ্গকায়নের বৈশিষ্ট্য:

- প্রাণিগতের মধ্যে আ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীতে প্রথম খঙ্গকায়ন পরিলক্ষিত হয়।
- প্রকৃতিতে অতীব প্রতিষ্ঠিত আর্থোপোডা ও কর্ডটা প্রাণীদের মধ্যে খঙ্গকায়ন পরিলক্ষিত হয়।

- আ্যানেলিডা পর্বের প্রাণিদেহে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন খঙ্গকায়ন দেখা যায়।
- আর্থোপোডা পর্বের প্রাণিদেহে কেবল বাহ্যিক খঙ্গকায়ন দেখা যায়।
- কর্ডটা পর্বের প্রাণিদেহে অভ্যন্তরীন খঙ্গকায়ন দেখা যায়।

খঙ্গকায়নের গুরুত্ব:

- খঙ্গকায়ন প্রাণীকে চলনে সহায়তা করে।
- প্রাণিদেহের খঙ্গগুলো উন্নত ধরনের বিকাশ অবস্থা প্রদর্শন করে যাতে বিবর্তনের নির্দর্শন চির: ১.৩ আ্যানেলিড-একটি পাওয়া যায়।



৪। অঞ্চলায়ন (Tagmatization)

Arthropoda পর্বের প্রাণীদের দেহ বাহ্যিকভাবে খঙ্গায়িত হলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই খঙ্গগুলো সুস্পষ্ট নয় বরং একেতে কিছু খঙ্গক একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যকরি অঞ্চল সৃষ্টি করে। এরূপ প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমা (tagma) বলে। Arthropoda-দের দেহে খঙ্গগুলোর এরূপ অঞ্চলীকরণকে Tagmatization বা অঞ্চলায়ন বলে। যে বিবর্তনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে অঞ্চলায়ন সম্পন্ন হয় তাকে ট্যাগমোসিস (tagmosis) বলে। Arthropoda-দের শ্রেণিবিন্যাসে অঞ্চলায়নের গুরুত্ব অনেক।

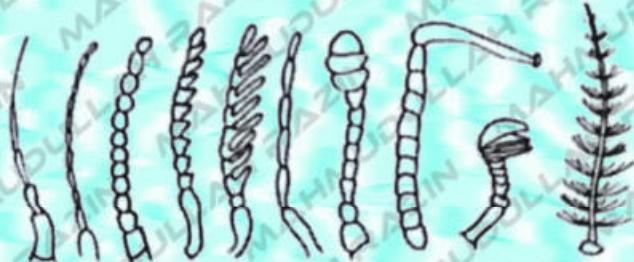
পতঙ্গ (ঘাসফড়ি, মৌমাছি, আরশোলা) জাতীয় প্রাণিদেহে দেহের খঙ্গগুলো মিলিত হয়ে মন্তক (head), বক্ষ (thorax) ও উদর (abdomen) নামক তিনটি ট্যাগমা গঠন করে। ক্রান্টসিয়া (চিংড়ি, কাঁকড়া) জাতীয় প্রাণিদেহের খঙ্গগুলো মিলিত হয়ে শিরোবক্ষ (cephalothorax) ও উদর (abdomen) নামক দুটি ট্যাগমা গঠন করে। অ্যারাকনিড (মাকড়শা) জাতীয় প্রাণিদেহের খঙ্গগুলো মিলিত হয়ে প্রোসোমা (prosoma) ও অপিসথোসোমা (opisthosoma) নামক দুটি ট্যাগমা গঠন করে।

৫। উপাঙ্গ (Appendages)

প্রাণিদেহের সাথে সংযুক্ত যেসব বাহ্যিক ও নড়নক্ষম অঙ্গ প্রাণীর খাদ্যসংহরণ, চলন, সংবেদন ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থাকে তাদের উপাঙ্গ বলে। প্রাণিদেহে বিভিন্ন ধরনের উপাঙ্গ থাকে যেগুলো শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণিদেহের যে সব উপাঙ্গকে শ্রেণিবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে

গণ্য করা হয় সেগুলো হলোঁ:



সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা- প্রোটোজোয়াতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাটেনা ও স্টাইল- আর্থোপোডাতে ব্যবহৃত হয়।

পা বা পোডিয়া- প্রোটোজোয়া ও মোলাক্ষাতে ব্যবহৃত হয়।

পাখনা- মাছে ব্যবহৃত হয়।

ডানা- পতঙ্গ ও পাখিতে ব্যবহৃত হয়।

বাহু- উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ব্যবহৃত হয়।

চির: ১.৪ বিভিন্ন ধরনের অ্যাটেনা যা পতঙ্গের শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়

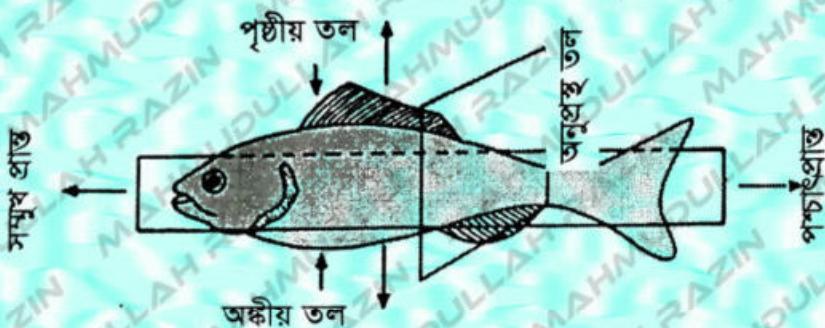
৬। প্রান্তিকতা (Polarity)

মন্তক ও মুখের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর দেহের যে মেরুকরণ করা হয় তাকে প্রান্তিকতা বলে। প্রাণিদেহের যে প্রান্তে মন্তক থাকে তাকে সম্মুখ প্রান্ত বা অগ্র প্রান্ত (anterior end) বলে। মন্তকের বিপরীতে অবস্থিত প্রান্তকে পশ্চাত প্রান্ত (posterior end) বলে। আবার প্রাণীর যে প্রান্তে মুখ থাকে তাকে মৌখিক প্রান্ত (oral end) বলে। মুখের বিপরীত প্রান্তকে পরাগমৌখিক প্রান্ত (aboral end) বলে।

৭। দেহ অক্ষ ও তল (Body axes and plane)

প্রতিসম প্রাণীতে দেহের কেন্দ্র বরাবর একটি সরল রেখা কল্পনা করা যায়। একে দেহ অক্ষ (axis) বলে। দেহের যে অক্ষ মাথা হতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ (longitudinal axis) এবং দেহের যে অক্ষ আড়াআড়িভাবে অবস্থিত

তাকে অনুপ্রস্থ অক্ষ (transverse axis) বলে। অন্যদিকে দেহ অক্ষের সাথে সম্পর্কিত করে প্রাণিদেহকে অঙ্গসংস্থানিকভাবে ছেদ করা যায়। একে তল (plane) বলে। প্রাণিদেহে তিন ধরনের তল থাকে, যথা- স্যাজিটাল তল (sagittal plane), ফ্রন্টাল তল (frontal plane) এবং অনুপ্রস্থ তল (transverse plane)।



চিত্র ১.৫ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণিদেহের বিভিন্ন তল ও অক্ষ

৮। সিলোম (Coelom)

বহুকোষী ত্রিস্তরী প্রাণিদেহের পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী তরলপূর্ণ গহনাকে দেহগহ্বর বলে। মেসোডার্ম উদ্ভৃত পেরিটোনিয়াম পর্দা বেষ্টিত দেহগহ্বরকে সিলোম বলে। Hyman (1951) এর মতে 'সিলোম হলো পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম কলার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে'। সিলোম প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের বিশেষ ভিত্তি বৈশিষ্ট্য।

সিলোমের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বহুকোষী ত্রিস্তরী প্রাণীদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

(ক) সিলোমবিহীন প্রাণী (Acoelomate animals):

জ্ঞানীয় অবস্থায় এসব প্রাণীর ব্লাস্টোসিল মেসোডার্মাল কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। পরিণত প্রাণীতে দেহগহ্বর মেসোনকাইম ও পেশি দ্বারা পূর্ণ থাকে। উদাহরণ- Platyhelminthes, Nemertea পর্বের প্রাণী।

(খ) অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী (Pseudocoelomate animals): জ্ঞানীয় অবস্থায় এসব প্রাণীর ব্লাস্টোসিলের বর্হিভাগ মেসোডার্মাল কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। পরিণত প্রাণীতে দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে না। দেহগহ্বরের চারদিকে পেশিস্তর বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ- Nematoda, Acanthocephala, Rotifera, Entoprocta পর্বের প্রাণী।

(গ) প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী (Coelomate animals):

জ্ঞানীয় অবস্থায় এসব প্রাণীর ব্লাস্টোসিল মেসোডার্মাল কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং অন্ত্রের চারদিকে একটি নিরেট বক্ষনী তৈরি করে। পরিণত প্রাণীতে এদের দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এক্ষেত্রে দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালি সংলগ্ন আবরণীকে যথাক্রমে প্যারাইটাল ও ভিসেরাল আবরণী বলে। উদাহরণ- Mollusca, Annelida, Echinodermata ও Chordata পর্বের প্রাণী।

জ্ঞানীয় বিকাশকালীন সময়ে সিলোম সৃষ্টির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রকৃত সিলোমকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়:



চিত্র ১.৬ সিলোমবিহীন, অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত ও প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণিদেহের প্রস্তুতি। (উৎস: Hickman: 2015)

(i) **সাইজোসিলাস সিলোম (Schizocoelous coelom):** জ্ঞানীয় মেসোডার্মাল কলা বিদীর্ঘ (split) হয়ে যে সব সিলোম সৃষ্টি হয় তাদের সাইজোসিলাস সিলোম বলে। Annelida, Arthropoda, Mollusca পর্বের প্রাণীর সিলোম এ প্রকৃতির। মৌলাঙ্কা ও আর্থোপোডাদের এ ধরনের সিলোম রক্ত দ্বারা পূর্ণ থাকে বলে এদের হিমোসিল (haemocoel) বলে।

(ii) **এন্টারোসিলাস সিলোম (Enterocoelous coelom):** জ্ঞানীয় আর্কেন্টেরনের প্রাচীরে সৃষ্টি মেসোডার্মাল থলি (mesodermal pouch) থেকে যে সব সিলোম উৎপত্তি লাভ করে তাদের এন্টারোসিলাস সিলোম বলে। Echinodermata ও Chordata-দের সিলোম এ ধরনের।

সিলোমের গুরুত্ব:

- ১। সিলোম প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীন অঙ্গসমূহকে ঘর্ষণের হাত হতে রক্ষা করে।
- ২। নরমদেহ বিশিষ্ট প্রাণীতে (অ্যানেলিড) তরলপূর্ণ সিলোম চলনের সময় হাইড্রোস্ট্যাটিক কক্ষাল ছিসেবে কাজ করে।
- ৩। সিলোম দেহ প্রাচীরের ভেতরে প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গকে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পেতে ও নড়তে সাহায্য করে।
- ৪। সিলোম দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে বর্জ্য পদার্থ, পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাস পরিবহনে সহায়তা করে।

৯। ক্লিভেজ ও জ্ঞানীয় বিকাশ (Cleavage and development)

যে পদ্ধতিতে যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী জ্ঞণ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সংস্কেত বলে। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি জ্ঞণের প্রথম নিরেট দশাকে মরুলা (morula) বলে। ফাঁপা ব্লাস্টুলা (blastula) সৃষ্টির মাধ্যমে ক্লিভেজের সমাপ্তি ঘটে। ডিমে কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিকে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক (holoblastic) কিংবা আংশিক বা মেরোব্লাস্টিক (meroblastic) হতে পারে। ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে কুসম থাকে তাকে ভেজিটাল মেরু (vegetal pole) এবং যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে অ্যানিমেল মেরু (animal pole) বলে।

ক্লিভেজ নির্ধারিত (determinate) ধরনের হতে পারে অর্থাৎ বিকাশমান কোষগুলোর ভবিষ্যত পরিণতি জ্ঞণের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারিত হয়। ক্লিভেজ অনির্ধারিত (indeterminate) ধরনের হতে পারে অর্থাৎ বিকাশমান কোষগুলোর ভবিষ্যত পরিণতি অঙ্গ গঠন করার সময় নির্ধারিত হয়। জাইগোটের বিভাজন তল, কুসুমের পরিমাণ ও বিস্তৃতি এবং ব্লাস্টোমিয়ারের পরিণতি ইত্যাদি বিষয় ক্লিভেজের ধারা নির্ধারণ করে।

বিভাজন তলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ তিনি প্রকার, যথা-

(ক) **অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage):** এক্ষেত্রে বিভাজন তলগুলো জাইগোটকে সর্বদা অরীয় ও সুষমভাবে বিভক্ত করে। Arthropoda পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজ অরীয় ধরনের।

(খ) **দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ: (Bilateral cleavage):** এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজের ন্যায় কিন্তু পরবর্তী বিভাজন মধ্যরেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ঘটে বলে চারটি করে দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। Chordata পর্বের প্রাণীতে এ ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়।

(গ) **সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage):** Annelida ও Mollusca পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঠিক ততীয় বিভাজনের সময় অ্যানিমেল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারসমূহ ভেজিটাল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর সাথে চক্রকারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে। এ ধরনের ক্লিভেজকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে।

ক্লিভেজ ও জ্ঞানীয় বিকাশের উপর ভিত্তি করে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীদের প্রোটোস্টোমিয়া (protostomia) ও ডিউটারোস্টোমিয়া (deuterostomia) নামের দুটি দলে ভাগ করা হয়। প্রোটোস্টোম প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্লিভেজ সর্পিল ও নির্ধারিত ধরনের এবং জ্ঞানীয় ব্লাস্টোপোর পরিণত প্রাণীতে মুখছিদ্রে পরিণত হয়। Annelida, Arthropoda ও Mollusca প্রধান প্রোটোস্টোম পর্ব। ডিউটারোস্টোম প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্লিভেজ অরীয় ও অনির্ধারিত ধরনের এবং জ্ঞানীয় ব্লাস্টোপোর পরিণত প্রাণীতে পায়ুছিদ্রে পরিণত হয়। Echinodermata ও Chordata প্রধান ডিউটারোস্টোম পর্ব।

১০। জ্ঞানীয় স্তর (Germ layers)

যৌন জননকারী বহুকোষী প্রাণীর জাইগোট বিভাজিত হয়ে নিরেট মরুলা ও ফাঁপা ব্লাস্টুলা দশা অতিক্রম করে দ্বিতীয় বা ত্রিতীয় গ্যাস্ট্রুলাতে পরিণত হয়। জ্ঞণের গ্যাস্ট্রুলা দশায় বিদ্যমান এসব কোষীয় স্তরসমূহকে জ্ঞানস্তর বা জার্ম লেয়ার বলে। জ্ঞানস্তরের প্রাণীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা রাখে। জ্ঞানস্তরের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী প্রাণীদের দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(ক) দ্বিতীয় প্রাণী (Diploblastic animal): যেসব প্রাণীর জন্মে এক্টোডার্ম ও এভোডার্ম নামক দুটি স্তর বিদ্যমান থাকে তাদের দ্বিতীয় প্রাণী বলে। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিতীয়।

(খ) ত্রিতীয় প্রাণী (Triploblastic animal): যেসব প্রাণীর জন্মে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এভোডার্ম নামক তিনটি স্তর বিদ্যমান থাকে তাদের ত্রিতীয় প্রাণী বলে। Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chordata ইত্যাদি পর্বের প্রাণীরা ত্রিতীয়। বিজ্ঞানী Heinz Christian Pander, 1817 সালে মুরগীর জন্ম পর্যবেক্ষণের সময় প্রাণীর তিনটি জীবীয় স্তর আবিষ্কার করেন।

১১। নটোকর্ড (Notochord)

নটোকর্ড হলো মেসোডার্ম উত্তৃত কোষ দ্বারা গঠিত স্থিতিস্থাপক দণ্ডাকৃতির একটি বিশেষ গঠন যা উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে বিদ্যমান থাকে। নটোকর্ডের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(ক) নন-কর্ড্যাট (Non-chordate): যে সব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড থাকে না তাদের নন-কর্ড্যাট বলে। যেমন, Porefera থেকে Echinodermata পর্বের সকল প্রাণী।

(খ) কর্ড্যাট (Chordate): যে সব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড থাকে তাদের কর্ড্যাট বলে। যেমন, Choradata পর্বের সকল প্রাণী।

১২। মেরুদণ্ড (Vertebral column)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড ক্লাপ্টিত হয়ে শক্ত ও মজবুত মেরুদণ্ড (vertebral column) গঠন করে। মেরুদণ্ডটি এক সারি ক্ষুদ্র অঙ্গ বা ক্ষেরক্ষার (vertebrae) সমষ্টিয়ে গঠিত হয় যেগুলো আন্তঃক্ষেরক্ষার পাত (intervertebral discs) দ্বারা একে অন্য থেকে আলাদা থাকে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে প্রাণীর সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) সুরক্ষিত থাকে। মেরুদণ্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, যাদের মেরুদণ্ড আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী (vertebrates) এবং যাদের মেরুদণ্ড নেই তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী (invertebrates) বলে।

দ্বিতীয় ও ত্রিতীয় প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

দ্বিতীয় প্রাণী	ত্রিতীয় প্রাণী
১। প্রাণীর জীবীয় অবস্থায় এক্টোডার্ম ও এভোডার্ম নামক দুটি কোষস্তর থাকে।	প্রাণীর জীবীয় অবস্থায় এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এভোডার্ম নামক তিনটি কোষস্তর থাকে।
২। মেসোগ্রিয়া বিদ্যমান।	মেসোগ্রিয়া থাকে না।
৩। জগন্তরের কোষগুলো পরিণত প্রাণীতে কোন অঙ্গ বা তত্ত্ব গঠন করে না।	জগন্তরের কোষগুলো পরিণত প্রাণীতে সুনির্দিষ্ট কলা, অঙ্গ ও তত্ত্ব গঠন করে।
৪। প্রাণীর দেহে নিমাটোসিস্ট বিদ্যমান।	প্রাণীর দেহে নিমাটোসিস্ট থাকে না।
৫। দেহ গহ্বর সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর।	দেহ গহ্বর সিলোম।

রেডিয়াটা ও বাইলেটারিয়া-এর মধ্যে পার্থক্য

রেডিয়াটা	বাইলেটারিয়া
১। দ্বিতীয় প্রাণী, দেহ অরীয় প্রতিসম।	ত্রিতীয় প্রাণী, দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।
২। কিছু প্রাণীতে গৌণ অভিযোজনের কারণে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়।	কিছু প্রাণীতে গৌণ অভিযোজনের কারণে অরীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়।
৩। অঙ্গ-তত্ত্ব সুস্পষ্ট নয়।	অঙ্গ-তত্ত্ব সুস্পষ্ট।
৪। সিলোম অনুপস্থিত।	সিলোম অনুপস্থিত অথবা অপ্রকৃত বা প্রকৃত ধরনের।
৫। কর্ণিকা ও নিমাটোসিস্ট বিদ্যমান।	কর্ণিকা থাকলেও নিমাটোসিস্ট থাকে না।
৬। পরিপাকতত্ত্ব কেবল মুখছিদ্দি দ্বারা বাইরে মুক্ত হয়।	পরিপাকতত্ত্ব মুখছিদ্দি ও পায়ু দ্বারা বাইরে মুক্ত হয়।

প্রোটোস্টেমিয়া ও ডিউটারোস্টেমিয়া-এর মধ্যে পার্থক্য

প্রোটোস্টেমিয়া	ডিউটারোস্টেমিয়া
১। ক্লিভেজ সর্পিল ও নির্ধারিত।	ক্লিভেজ অরীয় ও অনির্ধারিত।
২। পরিণত প্রাণীতে ব্লাস্টোপোর মুখছিদ্রে পরিণত হয়।	পরিণত প্রাণীতে ব্লাস্টোপোর পায়ুছিদ্রে পরিণত হয়।
৩। সিলোম সাইজোসিলাস ধরনের।	সিলোম এন্টারোসিলাস ধরনের।
৪। ভ্রগে আর্কেটেরন গঠিত হয় না।	ভ্রগে আর্কেন্টেরন গঠিত হয়।
৫। লার্ভা দশা ট্রিকোফোর।	লার্ভা দশা ট্রিনারিয়া অথবা বাইপিনারিয়া।

নন-কর্ডটা ও কর্ডটা-এর মধ্যে পার্থক্য

নন-কর্ডটা	কর্ডটা
১। নটোকর্ড অনুপস্থিত।	জীবনচক্রের কোন না কোন দশায় নটোকর্ড থাকে।
২। নার্ভকর্ড অক্ষীয়, নিরেট ও গ্যাংলিয়নবিহীন।	নার্ভকর্ড পৃষ্ঠীয়, ফাঁপা ও গ্যাংলিয়নযুক্ত।
৩। গলবিলীয় ফুলকারক্র অনুপস্থিত।	গলবিলীয় ফুলকারক্র বিদ্যমান।
৪। পায়ু পশ্চাত লেজ অনুপস্থিত।	পায়ু পশ্চাত লেজ বিদ্যমান।
৫। হৃৎপিণ্ড পৃষ্ঠীয়।	হৃৎপিণ্ড অক্ষীয়।
৬। রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকলে উহা প্লাজমায় থাকে।	রক্তের হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্ত কণিকায় থাকে।
৭। কক্ষাল থাকলে সেটি বহিঃকক্ষাল।	অস্তঃকক্ষাল ও বহিঃকক্ষাল বিদ্যমান।
৮। হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র অনুপস্থিত।	হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।
৯। তৃক হতে চোখ সৃষ্টি হয়।	মস্তিষ্ক হতে চোখ সৃষ্টি হয়।
১০। অক্ষীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের পশ্চাত্দিকে এবং পৃষ্ঠীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের সম্মুখদিকে রক্ত প্রবাহিত হয়।	অক্ষীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের সম্মুখদিকে এবং পৃষ্ঠীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের পশ্চাত্দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়।

অমেরুন্দত্তী ও মেরুন্দত্তী-এর মধ্যে পার্থক্য

অমেরুন্দত্তী	মেরুন্দত্তী
১। মেরুন্দও ও সুমুদ্রা কাও অনুপস্থিত।	মেরুন্দও ও সুমুদ্রা কাও বিদ্যমান।
২। দেহ দ্বিপার্শ্বীয় বা অরীয় প্রতিসম।	দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।
৩। পায়ু পশ্চাত লেজ অনুপস্থিত।	পায়ু পশ্চাত লেজ বিদ্যমান।
৪। পৌষ্টিকনালি স্নায়ুরজ্জুর পৃষ্ঠাদিকে অবস্থিত।	পৌষ্টিকনালি স্নায়ুরজ্জুর অক্ষদিকে অবস্থিত।
৫। গলবিলীয় ফুলকারক্র অনুপস্থিত।	গলবিলীয় ফুলকারক্র বিদ্যমান।
৬। হৃৎপিণ্ড পৃষ্ঠীয় বা পার্শ্বীয় অথবা অনুপস্থিত।	হৃৎপিণ্ড অক্ষীয়।
৭। পৃষ্ঠীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের সম্মুখদিকে রক্ত প্রবাহিত হয়।	পৃষ্ঠীয় রক্তনালি দিয়ে দেহের পশ্চাত্দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়।
৮। হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র অনুপস্থিত।	হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।
৯। রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকলে উহা প্লাজমায় থাকে।	রক্তের হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্ত কণিকায় থাকে।
১০। নার্ভকর্ড অক্ষীয়, নিরেট ও গ্যাংলিয়নবিহীন।	নার্ভকর্ড পৃষ্ঠীয়, ফাঁপা ও গ্যাংলিয়নযুক্ত।

প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের নীতি

১ শ্রেণিবিভাগ স্তর বা ধাপ (Taxonomic Categories)

শ্রেণিবিন্যাস করার সময় প্রাণীদের বিভিন্ন স্তরে বা ধাপে স্থাপন করা হয়। এসব স্তর বা ধাপকে শ্রেণিবিন্যাস স্তর বা ধাপ বলে। কোনো প্রাণীকে শ্রেণিবিভাগ স্তরের যে কোনো ধাপে স্থাপন করলে সেটি যে নাম প্রাপ্ত হয় তাকে ঐ প্রাণীর ট্যাক্সন (একবচন axon, বহুবচন-Taxa) বলে। Carolus Linnaeus (1753) প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ছয়টি স্তর বা ট্যাক্সার বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসে সাতটি ধাপ ব্যবহাব করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ধাপে সাজানোকে শ্রেণিবিভাগ পদসোপান বা ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি (Taxonomic hierarchy) বলে।

শ্রেণিবিভাগ স্তর

1. Kingdom (রাজ্য)
2. Phylum (পর্ব)
3. Class (শ্রেণি)
4. Order (র্গ)
5. Family (গোত্র)
6. Genus (গণ)
7. Species (প্রজাতি)

২ প্রাণীর প্রজাতি ও উপপ্রজাতি (Species and Sub species)

প্রাণী শ্রেণিবিন্যাস স্তরের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক হলো প্রজাতি। Earnest Mayr (1942) প্রথম species শব্দটি ব্যবহাব করেন তাব মতে “প্রজাতি হলো এমন একটি জীবগোষ্ঠী যারা বিজেদের মধ্যে যৌন মিলনে এবং উর্বর সম্মান উৎপাদনে সক্ষম, কিন্তু প্রায় অনুরূপ দৈহিক গঠন বিশিষ্ট নিকটতম জীবগোষ্ঠী হতে জননসূত্রে আলাদা।”

Earnest Mayr প্রজাতিতে কতগুলো বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

(i) প্রতিটি প্রজাতি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র; (ii) প্রজাতি একটি অভিন্ন জিন ভাগারের আধার যাতে জিনের মুক্ত প্রবাহ অঙ্কুণ্ড থাকে; (iii) প্রতিটি প্রজাতি সংশ্লিষ্ট পরিবেশে ভাবিয়োজিত হওয়ার জন্য সদা প্রচেষ্টারত থাকে; (iv) প্রজাতির সদস্যরা পরস্পরের মধ্যে জিন বিনিময়ে সক্ষম, (v) প্রতিটি প্রজাতিরই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে।

কোনো একটি প্রজাতির ব্যাপক ভৌগোলিক বিস্তৃতির কারণে বিচি ও ভিন্ন ধরনের দুই বা ততোধিক জীবগোষ্ঠীর (population) সৃষ্টি হতে পাবে। একই প্রজাতির প্রাণীর ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে অঙ্গসংস্থানিক ভিন্নতার সৃষ্টি হয়। একই প্রজাতিভুক্ত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ন এসব ভিন্ন প্রাণীদের উপপ্রজাতি (sub-species) বলে। [Singular- Species (Sp) and Plural. Species(Spp)].

৩। প্রাণীর নামকরণ (Nomenclature of animal)

কোনো বিশেষ প্রাণীকে শনাক্তকরণের জন্য শ্রেণিবিন্যাসের কিছু নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসারে প্রাণীর প্রতিটি প্রজাতির যে বিশেষ নাম প্রদান করা হয় তাকে নামকরণ (nomenclature) বলে। প্রাণীর নামকরণ দুপ্রকার, যথা-

(ক) দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature): জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী গণ ও প্রজাতি নামের দুটি পদ ব্যবহাব করে প্রাণীর যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। এভাবে সৃষ্টি নামকে প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) বলা হয়। সুইডিশ শ্রেণিতত্ত্ববিদ Carolus Linnaeus, 1758 খ্রিস্টাব্দে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। দ্বিপদ নামকরণের নিয়মানুযায়ী মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens* L.। এখানে *Homo* গণ, *sapiens* প্রজাতি নামের নির্দেশক এবং L. লিনিয়াসের নামের আদ্যক্ষর।

(খ) ত্রিপদ নামকরণ (Trinomial nomenclature): জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী গণ, প্রজাতি ও উপপ্রজাতি নামের তিনটি পদ ব্যবহাব করে প্রাণীর যে নামকরণ করা হয় তাকে ত্রিপদ নামকরণ বলে। প্রাণীর উপপ্রজাতির (sub-species) নামকরণ করা হয় ত্রিপদ নামকরণের নিয়মানুযায়ী। যেমন- সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম *Panthera leo*। কিন্তু ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে ভারতীয় ও আফ্রিকান সিংহের মধ্যে দৈহিক অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এদেরকে দুটি উপপ্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম- *Panthera leo leo* (আফ্রিকান সিংহ) ও *Panthera leo persica* (ভারতীয় সিংহ)। দুটি প্রাণীই *Panthera leo* এর উপপ্রজাতি। জার্মান অর্নিথোলজিস্ট Hermann Schlegel (1844) প্রাণীর ত্রিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন যা ICZN দ্বারা স্বীকৃত।

প্রাণীর নামকরণের নিয়মাবলি (Rules of Nomenclature)

সুইডিশ বিজ্ঞানী Carolous Linnaeus (1758) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Systema Naturae* এর দশম সংস্করণে প্রাণীর নামকরণের নীতিমালা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এ নীতিমালার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রাণীর নামকরণ যে নিয়মে করা হয় তা Linnaeus-এর নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত এবং ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) কর্তৃক অনুমোদিত। নিম্নে প্রাণীর নামকরণের নিয়মাবলির গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হলো-

১। প্রতিটি প্রাণীর একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নাম থাকবে, কখনোই একই নাম দুটি প্রাণীর ক্ষেত্রে কিংবা দুটি নাম একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

২। প্রাণীর দ্বিপদ নামের দুটি অংশ এবং ত্রিপদ নামের তিনটি অংশ থাকবে; দ্বিপদ নামের প্রথম অংশ গণ এবং দ্বিতীয় অংশ প্রজাতির নির্দেশক। ত্রিপদ নামের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ যথাক্রমে গণ, প্রজাতি ও উপপ্রজাতির নির্দেশক।

৩। প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই ল্যাটিন কিংবা ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত শব্দ দ্বারা গঠিত হতে হবে।

৪। বৈজ্ঞানিক নাম ছাপানো হলে ইটালিক ফর্মে অর্থাৎ ডান দিকে বাঁকানো হবে। এ নাম হাতে লেখলে ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার করে গণ ও প্রজাতি অংশের নিচে আলাদাভাবে দাগ টানতে হবে।

৫। দ্বিপদ নামের গণ অংশটি বিশেষ্য (noun) যার প্রথম অক্ষর বড় হরফে (capital letter) এবং প্রজাতি অংশটি বিশেষণ (adjective) যার প্রথম অক্ষর ছোট হরফে (small letter) লেখতে হবে।

৬। অঞ্চাধিকার আইন (law of priority) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নামই স্বীকৃতি পাবে।

৭। প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের শেষে জনকের নাম ও সন উল্লেখ করতে হবে। যেমন- *Homo sapiens* Linnaeus, 1758.

৮। কোন কারণে প্রাণীর গণ নামের পরিবর্তন হলে এর প্রথম জনকের নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, লিনিয়াস বাঘের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন *Felis tigris* যা পরবর্তীতে *Panthera tigris* হিসেবে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম *Panthera tigris* (L) হিসেবে লেখা হয়।

৯। সাধারণত গণ নামের শেষে *idea* যোগ করে গোত্রের নাম গঠন করা হয়।

১০। কোনো প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের গণ ও প্রজাতি অংশের নাম একই হতে পারে। যেমন, *Catla catla*। এ অবস্থাকে টটোনিম (tautonym) বলে।

১১। নামকরণের সময় যে প্রাণীকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হবে তাকে টাইপ স্পেসিমেন (type specimen) হিসেবে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রাণীর নামের বৈধতা (Validity of animal name)

নামকরণের আইন অনুযায়ী যখন কোনো প্রাণীর নাম প্রস্তাব করা হয় সেটি নামকরণের স্বীকৃতি পায়। এ নামকে প্রাপ্ত নাম (available name) বলা হয়। তবে স্বীকৃতি পেলেই যে একটি নাম বৈধ (valid) বা গৃহীত হয়ে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ একটি নাম নিম্নলিখিত দুটি কারণে বাতিল (invalid) হয়ে যেতে পারে-

□ প্রস্তাবিত নাম যদি আগেই অন্য কোনো প্রাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের নামকে হোমোনিম (homonym) বা সমনাম বলা হয়।

□ যে প্রাণীর জন্য নতুন নাম দেয়া হয় সে প্রাণীর যদি পূর্বে দেয়া একটি আইনসঙ্গত বৈধ নাম থাকে। এ ধরনের নামকে সিনোনিম (synonym) বা প্রতিনাম বলা হয়।

হোমোনিম ও সিনোনিম উভয়কে তাদের প্রয়োগ অনুযায়ী সিনিয়র (senior) বা জুনিয়র (junior) হিসেবে গণ্য করা হয়। যে নামটি আগে দেয়া হয় তাকে সিনিয়র এবং যে নামটি পরে দেয়া হয় তাকে জুনিয়র হোমোনিম বা সিনোনিম বলা হয়। অঞ্চাধিকার আইন অনুযায়ী কেবল সিনিয়র হোমোনিম এবং সিনিয়র সিনোনিম বৈধ নাম হিসেবে বিবেচিত হয়।

অঞ্চাধিকার আইন (Law of priority)

International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) এ বর্ণিত অঞ্চাধিকার আইন প্রাণীর নামকরণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু বিতর্কিত কিছু ধারার সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী নামকরণের নিয়মানুসারে দেয়া কোনো নামকে ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন বা রদবদল করা যাবে না। একটি প্রাণীর সে নামই গৃহীত নাম বলে বিবেচিত হবে যেটি

প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো গণ বা প্রজাতির একাধিক নাম দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তার প্রথম বা পুরাতন নামটিই বৈধ হবে। অন্যগুলো জুনিয়র সিলেনিম হিসেবে বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রাণীর নামকরণে অগ্রাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে, যদি-

(ক) পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর নামকরণের পূর্বে যদি প্রাণীর দেহের কোন অংশের নামকরণ করা হয়।

(খ) কোন প্রজাতির বিভিন্ন জনু, দৈহিক গঠন, পরিবর্তনশীল দশা কিংবা যৌন অবস্থাকে যদি বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। অথবা-

(গ) 1931 সালের পূর্বে যদি কোন জীবিত প্রাণীর নামকরণ করা হয়।

১.৩ প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই প্রাণীদের শনাক্ত করতে শিখেছিল। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। নিম্নে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো-

১। প্রাণী শনাক্তকরণে: শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নিরূপণ করে এদের শনাক্ত করা যায়। শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি আমাদের বিশ্বেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

২। প্রাণিজগত সম্পর্কে জানা: শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে পদ্ধতি আমাদের বিশ্বেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩। নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণে: নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং একে শ্রেণিবিন্যাস নিয়ামকের নির্দিষ্ট ধাপে স্থাপন করার জন্য শ্রেণিবিন্যাসের জ্ঞান অপরিহার্য। শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি নতুন আবিস্কৃত প্রাণীকে সুস্থিত, অনুপম ও সুস্পষ্ট নাম প্রদান করে।

৪। জাতিজনিক সম্পর্ক নির্ণয়: শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণীর জাতিজনিক সম্পর্ক নির্ণয় করে বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়।

৫। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বাছাইয়ে: ক্ষতিকর ও উপকারী প্রাণী প্রজাতির সঠিক পরিচয় দানের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বাছাইকরণ সহজ করে।

৬। বালাই দমনে: বালাই নিয়ন্ত্রণ ও দমনে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও জৈবিক নিয়ন্ত্রক প্রতিনিধি (biological control agents) শনাক্তকরণে এবং এদের বাস্তুতাত্ত্বিক উপাদান নির্ণয়ে শ্রেণিবিন্যাসের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

৭। উন্নত জাত উত্তোলনে: সংকরণ ও ক্রিয় প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশু-পাখি উত্তোলনের জন্য শ্রেণিবিন্যাসের জ্ঞান অপরিহার্য।

৮। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে: প্রাণী শ্রেণিবিন্যাস জীববৈচিত্র্য শনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখে।

৯। বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ: বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্রে শ্রেণিবিন্যাসের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ থেকে এদের বিবর্তনিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

১০। বিজ্ঞানের নতুন শাখার উন্নয়ন: জীববিজ্ঞানের নতুন শাখা যেমন- জীবভূগোল, জীবপদার্থ, জীবপ্রযুক্তি ইত্যাদি শাখার বিকাশে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের জ্ঞান অপরিহার্য।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতের সদস্যদের বর্তমানে প্রায় 33টি পর্বের অধিনে তালিকাভুক্ত করা হয়। পর্বে প্রজাতির সংখ্যা ও জীবগোষ্ঠীর আকার, বাস্তুতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের কর্মসূক্ষ্মতায় অংশগ্রহণের ব্যাপকতা এবং আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্কের মাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণীর পর্বসমূহকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। যথা- মুখ্য পর্ব (major phyla) এবং গৌণ পর্ব (minor phyla)।

□ মেজর ফাইলা: প্রাণীর যেসব পর্বের প্রজাতি সংখ্যা অনেক (পাঁচ হাজারের উপর), বাস্তুতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ ব্যাপক এবং যাদের জাতিতাত্ত্বিক অবস্থান সুস্পষ্ট সেসব পর্বকে মেজর পর্ব বা মুখ্য পর্ব বা প্রধান পর্ব বলে।

□ মাইনর ফাইলা: অন্যদিকে অখ্যাত ও সম্যক বর্ণিত প্রাণী নিয়ে গঠিত পর্বসমূহ যাদের প্রজাতি সংখ্যা খুব কম, বাস্তুতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ সামান্য এবং যাদের জাতিতাত্ত্বিক অবস্থান সন্দেহজনক তাদের মাইনর ফাইলা বা গৌণ পর্ব বা মিসেলেনিয়াস পর্ব বলা হয়।

Hickman *et al.* (2008) রচিত INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY (11th edition) পুস্তকের
বর্ণনা অনুযায়ী প্রাণীর পর্বসমূহ নিম্নরূপ-

Kingdom: ANIMALIA	Branch A: MESOZOA	: অল্ল কোষ বিশিষ্ট বহুকোষী প্রাণী। কলা বা অঙ্গ গঠিত হয় না।
	.	1. Phylum- Mesozoa
	Branch B: PARAZOA	: অসংখ্য কোষ বিশিষ্ট বহুকোষী প্রাণী। কলা বা অঙ্গ গঠিত হয় না।
	.	2. Phylum Porifera*
	.	3. Phylum Placozoa
	Branch C: EUMETAZOA	: প্রকৃত বহুকোষী প্রাণী। কলা অথবা অঙ্গ ও তন্ত্র গঠিত হয়।
	Grade I. Radiata	: দ্বিস্তরী অরীয় প্রতিসম প্রাণী। কলা গঠিত হয়, অঙ্গ-তন্ত্র গঠিত হয় না।
	.	4. Phylum Cnidaria*
	.	5. Phylum Ctenophora
	Grade II. Bilateria	: ত্রিস্তরী দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণী। কলা, অঙ্গ-তন্ত্র গঠিত হয়।
Group 1. Acoelomata সিলোমবিহীন প্রাণী	6. Phylum Platyhelminthes*	
	7. Phylum Gnathostomulida	
	8. Phylum Nemertia	
	9. Phylum Rotifera	14. Phylum Loricifera
	10. Phylum Gastrotricha	15. Phylum Entoprocta
	11. Phylum Nematoda*	16. Phylum Kinorhyncha
	12. Phylum Acanthocephala	17. Phylum Priapulida
	13. Phylum Nematomorpha	
	18. Phylum Mollusca*	26. Phylum Onychophora
Group 2. Pseudocoelomata আঙ্গসিলোমযুক্ত প্রাণী	19. Phylum Annelida*	27. Phylum Echiurida
	20. Phylum Arthropoda*	28. Phylum Pentastomida
	21. Phylum Sipunculida	29. Phylum Chaetognatha
	22. Phylum Pogonophora	30. Phylum Bryozoa
	23. Phylum Tardigrada	31. Phylum Echinodermata*
	24. Phylum Brachiopoda	32. Phylum Hemichordata
	25. Phylum Phoronida	33. Phylum Chordata*

[* Major phyla; others are Minor phyla]

১.৪ প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস: নন-কর্ডটা (Non Chordata)

প্রাণিদেহে নটোকর্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। (ক) নন-কর্ডটা এবং (খ) কর্ডটা। যেসব প্রাণিদেহে নটোকর্ড থাকে না তাদের নন-কর্ডটা বলে। প্রকৃতিতে নন-কর্ডটা প্রাণীর সংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় 95-97%। এরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে-

- ১। নটোকর্ড অনুপস্থিত।
- ২। স্নায়ুরজ্জু গ্রহিযুক্ত, অঙ্গীয় ও নিরেট।
- ৩। গলবিলীয় ফুলকারক্স এবং পায়ু পশ্চাত লেজ থাকে না।
- ৪। রক্ত সংবহনতন্ত্রে হ্রৎপিণ্ড পৃষ্ঠীয়।
- ৫। রক্তের হিমোগ্লোবিন রক্তরসে (plasma) থাকে।
- ৬। হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র থাকে না।
- ৭। চক্ষু ঢুক হতে সৃষ্টি হয়।

প্রাণিজগতে বিদ্যমান সকল পর্বের মধ্যে কেবল একটি পর্বের প্রাণীই কর্ডটা জাতীয়। বাকী সব পর্বের প্রাণী নন-কর্ডটা জাতীয়। নন-কর্ডটা দলের প্রধান পর্ব আটটি। নিম্নে এদের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

Phylum 1: PORIFERA (পরিফেরা) (L. porus-pore + ferre-to bear)

পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা আদি প্রকৃতির সরল বহুকোষী। এ পর্বের প্রাণীর সাধারণ নাম স্পঙ্গ (sponge)। এদেরকে সাধারণত 'ছিদ্র বহনকারী' (pore bearers) প্রাণী বলা হয় কারণ এদের দেহ প্রাচীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান থাকে। Ellis (1765) এদের দেহে পানি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেন। Linnaeus, Lamarck ও Cuvier এদেরকে Zoophyta দলভুক্ত করেন। Robert Grant (1836) Porifera পর্বের নামকরণ করেন এবং স্পঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 15000 (Hickman, 2008), যাদের প্রায় সকলেই সামুদ্রিক। মাত্র 150 প্রজাতির প্রাণী স্বাদু পানিতে বাস করে। এ পর্বের প্রাণীর অধিকাংশের প্রধান খাদ্য ব্যকটেরিয়া, কিছুসংখ্যক পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র পৃষ্ঠি কণা গ্রহণ করে। এদের কিছু সংখ্যক প্রাণী সালোকসংশ্লেষী অণুজীবদের দেহাভ্যন্তরে এন্ডোসিমবায়োন্ট (endosymbionts) হিসেবে বাস করতে দেয়। শীতপ্রধান এলাকার সমুদ্রের স্পঙ্গরা মাত্র কয়েক বছর বাঁচে কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রের কিছু স্পঙ্গ 200 বছর পর্যন্ত বাঁচে।

বৈশিষ্ট্য
১। এরা কোষীয় মাত্রায় বহুকোষী একক (solitary) বা উপনিবেশিক (colonial) হিসেবে প্রাণী।

২। এদের দেহে অবিশেষায়িত ধরনের কোষ থাকে যেগুলো থেকে অন্য যে কোন কোষ সৃষ্টি হতে পারে।

৩। দেহতলে অস্টিয়া (ostia) নামক অসংখ্য ছিদ্র বিদ্যমান যেগুলো দেহের অভ্যন্তরে বিশেষ নালিতঙ্গের (canal system) সাথে সংযুক্ত থাকে।

৪। নালিতঙ্গের অন্তঃপ্রাচীরে ফ্লাজেলাযুক্ত কলার কোষ (collar cells) বা কোয়ানোসাইট (Choanocytes) থাকে।

৫। নালিতঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় স্পঞ্জোসিল (spongocoel) থাকে যা অস্কিউলাম (osculum) নামক ছিদ্র দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৬। দেহপ্রাচীর বহিঃস্থ তুকীয় পিনাকোডার্ম (pinacoderm), অসংস্থ পরিপাকীয় কোয়ানোডার্ম (choanoderm) এবং মধ্যবর্তী মেসেনকাইম (mesenchyme) নিয়ে গঠিত।

৭। স্পিকিউল (spicules) বা স্পেজিন তন্ত্র (spongin fibres) অথবা উভয় পদার্থ দ্বারা গঠিত অস্তঞ্কক্ষাল বিদ্যমান।

৮। এদের কোন স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্র নেই।

৯। এদের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে। কুঁড়ি (buds) বা গেমিউল (gemmule) সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন প্রজনন ঘটে।

১০। উভলিঙ। পরিস্থিতিতে পরোক্ষ, জীবনচক্রে সন্তরনশীল অ্যাফিলাস্টুলা (amphiblastula) অথবা প্যারেনকাইমুলা (parenchymula) লার্ভা বিদ্যমান।

উদাহরণ: *Clathrina clathrus* (শ্বেতী স্পঙ্গ), *Spongilla fragilis* (স্বাদুপানির স্পঙ্গ), *Chalina oculata* (মৃত মানুষের আঙুল স্পঙ্গ), *Scypha gelatinosum* (সিলিয়াযুক্ত স্পঙ্গ), *Euspongia officinalis* (বাথ স্পঙ্গ), *Microciona prolifera* (লাল ছিদ্রাল স্পঙ্গ) ইত্যাদি।



চিত্র ১.৭: Porifera পর্বের কয়েকটি প্রাণী



স্পঞ্জিন তন্ত্র

Phylum 2. CNIDARIA (নিডারিয়া) (Gr. *knide* = nettle+L. *aria* = like or connected with)

পর্ব Cnidaria-তে (পূর্বনাম Coelenterata) মাংশল পলিপ, বর্ণময় সমুদ্র অ্যানিমন, শক্ত প্রবাল, নরম প্রবাল, আগাছা সদৃশ্য হাইড্রয়েড, জেলি ফিশ ইত্যাদি সকল প্রাণীই অন্তর্ভুক্ত। Leuckart (1847) Cnidaria পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 9,000 (Hickman, 2008) যাদের মধ্যে কেবল 20 টি প্রজাতির প্রাণী স্বাদুপানিতে বাস করে। বিচ্চির বর্ণময়, অরীয় প্রতিসম নিডারিয়ান প্রাণীদের সমুদ্রের ফুল (flower of the sea) বলা হয়। প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর পৃথিবীর অন্যতম প্রাচুর্যময় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র যেখানে সামুদ্রিক জীব প্রজাতির প্রায় 25% পাওয়া যায় এবং এটি সামুদ্রিক মাছের অন্যতম চারণভূমি বলে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্বের প্রায় সকলেই মাংসাসী এবং কর্ষিকাতে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের নিমাটোসিস্ট কোষ দ্বারা শিকার ধরে। এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত সামুদ্রিক বগ্লা, *Chironex fleckeri* পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত জেলিফিশ যা 67 জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এ পর্বের প্রাণীরা সমুদ্র তলদেশে এমন কলোনি গঠন করে যা কেবল ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের (tropical rain forest) সাথে তুলনীয়।

বৈশিষ্ট্য :

১। এরা কোষ-কলা মাত্রায় (cell-tissue grade) বহুকোষী প্রাণী যাদের দেহ অরীয় প্রতিসম।

২। এরা দ্বিতীয় প্রাণী। দেহ বাইরের এপিডার্মিস ও ভেতরের গ্যাস্ট্রোডার্মিস কোষস্তর এবং মাঝের কোষবিহীন মেসোগ্লিয়া নিয়ে গঠিত।

৩। এপিডার্মিসে নিডোব্লাস্ট (cnidoblast) নামক বিশেষ ধরনের কোষ থাকে যার অভ্যন্তরে বিষাক্ত তরলযুক্ত নিমাটোসিস্ট (nematocyst) ক্যাপস্যুল বিদ্যমান।

৪। দেহাভ্যন্তরে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোক্লুলার গহ্বর নামে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা গহ্বর বিদ্যমান যা একটি মুখছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে মুক্ত হয়। পায়ুছদ অনুপস্থিত।

৫। পরিপাক ক্রিয়া অন্তঃকোষীয় বা বহিকোষীয়।

৬। জীবনচক্রে অনুঘন্টক্রম (alternation of generations) বা মেটাজেনেসিস (metagenesis) দেখা যায়।

৭। জীবনচক্রে স্থির পলিপ (polyp) অথবা মুক্তজীবী মেডুসা (medusa) অথবা উভয় দশাই বিদ্যমান। কোন কোন ক্ষেত্রে বহুপ্রতা (polymorphism) দেখা যায়।

৮। এরা জলচর: অধিকাংশই সামুদ্রিক, কিছুসংখ্যক স্বাদুপানিবাসী; এক বা উপনিবেশিক প্রাণী।

উদাহরণ: *Hydra vulgaris* (হাইড্রা), *Aurelia aurita* (জেলিফিস), *Metridium senile* (সামুদ্রিক অ্যানিমোন), *Physalia physalis* (পর্তুগীজ যুদ্ধ মানব), *Porpita porpita* (নীল বোতাম জেলিফিস), *Pennatula phosphorea* (সামুদ্রিক কলম), *Meandrina meandrites* (ব্রেইন কোরাল) ইত্যাদি।



Aurelia



Metridium



Physalia



Porpita



Pennatula



Meandrina

চিত্র ১.৮: Cnidaria পর্বের কয়েকটি প্রাণী



দ্বিতীয় অবস্থা



নিডোব্লাস্ট কোষ



প্রবাল প্রাচীর

Phylum 3. PLATYHELMINTHES (প্লাটিহেল্মিনথিস) (Gr. *Platys* = flat + *helminth* = worm)

বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে *Platyhelminthes* পর্বের প্রাণীই প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী। এদের দেহে প্রথম অঙ্গ বা তন্ত্রের গঠন দেখা যায়। এরা সিলোমবিহীন এবং এদের সকলের দেহই নরম ও পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় চ্যাপ্টা পাতা বা ফিতার মতো। এজন্য এদের চ্যাপ্টাকৃমি (flat worm) বা ফিতাকৃমি (ribbon worm) বলা হয়। *Gegenbaur* (1859) সর্বপ্রথম *Platyhelminthes* পর্বের নামকরণ করেন। মুক্তজীবী চ্যাপ্টাকীট (flatworms), পরজীবী ফ্লুক (flukes), ফিতাকৃমি (tapeworms) ইত্যাদি সকল প্রাণীই এ পর্বভুক্ত। এ পর্বে প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 29,500 (*Hickman*, 2008)। পরজীবী ফিতাকৃমি (tapeworms) ও ফ্লুক (flukes) মানুষ ও গবাধিপশুর দেহের বেশ কয়েকটি রোগ সৃষ্টি করে। এদের অনেকে মাছের দেহে পরজীবীরূপে মাছ উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতি করে। *Schistosoma* গণের কয়েকটি প্রজাতির চ্যাপ্টাকৃমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের মানুষে সিস্টোসোমাসিস (schistosomiasis) বা শামুক ঝুর (snail fever) সৃষ্টি করে যা ম্যালেরিয়ার পরেই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশিষ্ট্য :

১। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, কলা-অঙ্গ মাত্রার প্রথম ত্রিস্তরী ও পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় চ্যাপ্টা দেহ বিশিষ্টি প্রাণী।

২। দেহ নরম ও সিলিয়াযুক্ত অথবা কিউটিকলযুক্ত এপিডার্মিস দ্বারা আবৃত।

৩। দেহে বাহ্যিক চোষক (suckers) অথবা ছক থাকে; কিছু প্রাণীতে খণ্ডক সদৃশ্য গঠন প্রোগ্লটিড (proglottids) থাকে।

৪। পৌষ্টিকতন্ত্র পায়ুচিন্দ্র বিহীন এবং শাখাবিত।

৫। দেহ সিলোমবিহীন; দেহগহ্বর পেশি ও প্যারেনকাইম দ্বারা পূর্ণ থাকে।

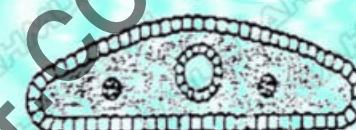
৬। রক্তসংবহন ও শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত; রেচনতন্ত্রে শিখাকোষ (flame cell) সমৃদ্ধ প্রোটোনেফ্রিডিয়া থাকে।

৭। সাধারণত অণুদৈর্ঘ্য স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যমান।

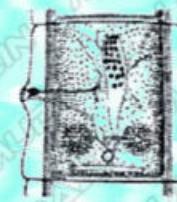
৮। প্রজনন যৌন প্রক্রিতির; উভলিঙ্গ, নিষেক অভ্যন্তরীণ, পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। জীবনচক্রে রেডিয়া, সারকারিয়া, স্প্যারোসিস্ট, সিস্টিসারকাস ইত্যাদি লার্ভা থাকে।

৯। এদের অধিকাংশই পরজীবী, কিছু সংখ্যক মুক্তজীবী।

উদাহরণ: *Dugesia tigrina* (মুক্তজীবী চ্যাপ্টা কৃমি), *Fasciola hepatica* (যকৃতকৃমি), *Polystoma integerrimum* (ব্যাঙের কৃমি), *Bipalium adventitium* (হাতুরি মন্তক কৃমি), *Echinococcus granulosus* (কুকুরের ফিতাকৃমি), *Taenia solium* (ফিতাকৃমি) ইত্যাদি।



অ্যাসিলোমেট দেহ



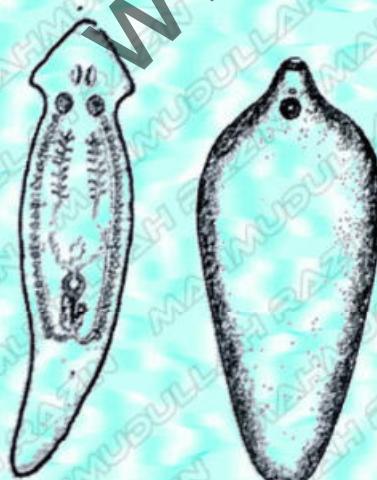
প্রোগ্লটিড



চোষক



শিখাকোষ



Dugesia



Fasciola



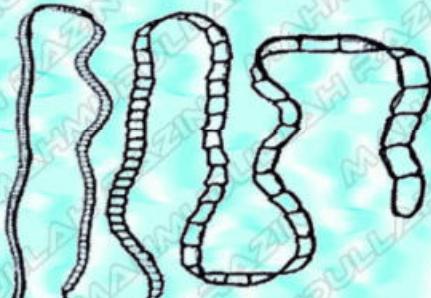
Polystoma



Bipalium



Echinococcus



Taenia

Phylum 4. NEMATODA (নেমাটোডা) (Gr. *Nematos* = thread + *helminth* = worm)

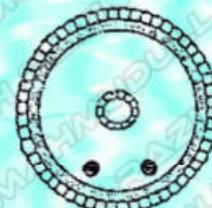
Nematoda-পর্বের প্রাণীর সাধারণ নাম সূতাকৃমি (thread worm) বা গোলকৃমি (round worm)। Gagenbaur (1851) Nematoda পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বে বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 25,000 (Hickman, 2008) যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন জীবদেহে পরজীবী। মুক্তজীবী নেমাটোড বিয়োজক হিসেবে এবং অণুজীব শিকারী হিসেবে বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ পর্বের পরজীবী প্রাণীরা মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। বাস্তুতাত্ত্বিক সকল পরিবেশেই এদের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। একটি পচা আপেলে 90,000টি নেমাটোড পাওয়া গেছে। অন্য একটি গবেষণার রিপোর্টে এক ঘন সেন্টিমিটার কাদায় 236 প্রজাতির নেমাটোড পাওয়া গেছে। সমুদ্র তলদেশের প্রাণী প্রজাতির 90%ই নেমাটোড। মুক্তজীবী প্রাণীরা ব্যাকটেরিয়া, সিস্ট, ছত্রাক, শৈবাল, ক্ষুদ্র প্রাণী, মলমৃত, মৃত প্রাণীর দেহ ইত্যাদি থেয়ে জীবনধারণ করে। নাইট্রোজেন খনিজভূত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেমাটোড নাইট্রোজেন চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বৈশিষ্ট্য :

- ১। দেহ ত্রিতীয়, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, অখণ্ডায়িত, অপ্রকৃতসিলোম বিশিষ্ট।
- ২। দেহ নলাকার, উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু, ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা।
- ৩। দেহপ্রাচীর নমনীয় ও অকোষী কিউটিকল, কোষীয় বা সিনসাইটিয়াল এপিডার্মিস এবং অণুদৈর্ঘ্য পেশি নিয়ে গঠিত।
- ৪। অন্ত এবং ডিম্বনালি বা শুক্রাশয় দ্বারা পূর্ণ থাকায় অপ্রকৃতসিলোমের গহরত্ব ছোট।
- ৫। পৌষ্টিকনালি সেঁজা এবং মুখছিদ্র, পায়ুছিদ্র ও পোশবহুল গলবিল সমৃদ্ধ।
- ৬। শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
- ৭। অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ, যৌন দ্বিপ্রতা (পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী বাহ্যিকভাবে দেখতে ভিন্নরকম) দেখা যায়।
- ৮। এরা জলচর কিংবা স্থলচর; মুক্তজীবী কিংবা পরজীবী।



দেহের উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু



অপ্রকৃতসিলোম

উদাহরণ: *Caenorhabditis elegans* (মুক্তজীবী গোলকৃমি), *Wuchereria bancrofti* (ফাইলেরিয়া কৃমি), *Ancylostoma duodenale* (মানুষের হক ওয়ার্ম), *Ascaris lumbricoides* (গোলকৃমি), *Trichuris trichiura* (চাবুককৃমি), *Loa loa* (চোখের কৃমি) ইত্যাদি।



Caenorhabditis elegans



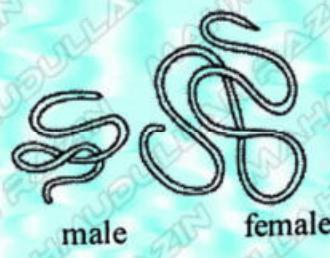
Wuchereria bancrofti



Ancylostoma duodenale

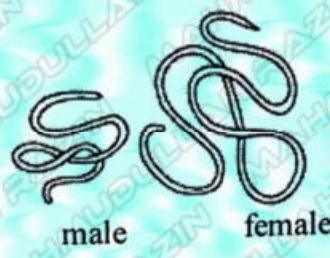


Ascaris lumbricoides



male

female



Loa loa

চিত্র ১.১০: Nematoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

Phylum 5. MOLLUSCA (মোলাক্ষা) (*L. molluscus* = soft)

Jonston (1650) Mollusca পর্বের নামকরণ করেন। Mollusca প্রাণিগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব। মোলাক্ষাদের সাম্প্রতিক বর্ণনাকৃত মোলাক্ষাদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 100,000। মোলাক্ষা সামুদ্রিক প্রাণীর বৃহত্তম পর্ব যাতে মোট সামুদ্রিক প্রাণীর 23% অন্তর্ভুক্ত। এদের অসংখ্য প্রজাতি স্বাদুপানি এবং স্লুভাগে ব্যাপক বিস্তৃত। অধিকাংশ মোলাক্ষাই তৃণভোজী বা হাঁকন খাদক, কিছুসংখ্যক প্রজাতি শিকারি। শামুক, বিনুক, ওয়েস্টার, স্ল্যাগ (খোলকবিহীন শামুক), অঞ্চেপাস, স্কুইড ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের আকারে ব্যপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এদের একটি প্রজাতির ‘জায়ান্ট স্কুইড’ ওজনে 270 কেজি, লম্বায় 12 মিটার এবং কর্ষিকার দৈর্ঘ্য 50 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। হাজার বছর ধরে মোলাক্ষা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া এসব প্রাণী থেকে প্রাণ্ত মুক্তা, টাইরিয়ান পার্পল ডাই, সি সিঙ্ক ও রাসায়নিক পদার্থ বিলাসী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মোলাক্ষার খোলস (*Cypraea moneta*) প্রাচীতিহাসিক সময়ে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিছু প্রজাতির মোলাক্ষ, বিশেষ করে শামুক ও স্ল্যাগ শস্যের বালাই হিসেবে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ নরম, অখঙ্গায়িত, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম (পরিণত গ্যাস্ট্রোপোড ব্যতিত)।

২। অধিকাংশই প্রাণীর দেহ প্রাথমিক ম্যান্টল (mantle) দ্বারা আবৃত থাকে, যা থেকে চুনময় অস্তঃঃ বা বহিঃখোলক গঠিত হয়।

৩। দেহের অক্ষীয় দিকে পেশিযুক্ত পদ বিদ্যমান যা চলন, গত করা বা সাঁতারের জন্য বিভিন্নভাবে অভিযোজিত।

৪। পৌষ্টিকনালি সোজা বা প্যাচানো অথবা U আকৃতির, বিনুক ব্যতীত সকলের মুখবিবরে রেডুলা (radula) বিদ্যমান।

৫। রক্ত সংবহনতন্ত্র অর্ধ মুক্ত ধরনের অথবা রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই থাকে।

৬। ফুলকা ও ম্যান্টল পর্দা দ্বারা শুমল সম্পন্ন হয়, স্লুচরদের ক্ষেত্রে পালমোনারি থলির বিকাশ ঘটে।

৭। একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ, যৌন জনন ঘটে, পরিশুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। জীবনচক্রে ট্রাকোফোর বা ডেলিজার বা গুচিডিয়াম লার্ভা থাকে।



পালমোনারি থলি



চিত্র ১.১১: Mollusca পর্বের কয়েকটি প্রাণী

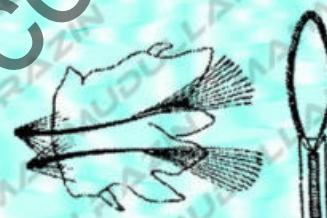
Phylum 6. ANNELIDA (অ্যানেলিডা) (Lt. *annulus*=small ring)

Lamark, 1809 খ্রিস্টাব্দে নরম দেহের খণ্ডায়িত প্রাণীদের Annelida হিসেবে চিহ্নিত করেন। পূর্বে বিজ্ঞানীরা এদেরকে কৃমি জাতীয় প্রাণীর সাথে Vermes দলভুক্ত করেছিলেন। এরা আণ্টি কীট (ringed worms) বা খণ্ডায়িত কীট (segmented worms) হিসেবে পরিচিত। কেঁচো, জঁক ও পলিকিট জাতীয় প্রাণী Annelida পর্বভুক্ত। এ পর্বে জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 17,000। এরা স্থলচর, মিঠাপানি বা সামুদ্রিক বিভিন্ন বাস্তুতাত্ত্বিক পরিবেশে অভিযোজিত। স্থলচর প্রাণীরা ভেজা স্যাতস্যাতে পরিবেশে বাস করে। এ পর্বের প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহ একসারি আংটি আকৃতির সমরূপ খণ্ডক বা মেটামিয়ার নিয়ে গঠিত। এ পর্বের প্রাণী সর্ব বিস্তৃত ও সুপরিচিত। এরা আকারে অতিক্রম 0.5 মিলিমিটার (যেমন- *Chaetogaster annandalai*) থেকে সর্ববৃহৎ 1.36 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট (যেমন, কেঁচো- *Michrochaetus rappi*) হতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

- ১। এরা ত্রিতীয় প্রতিসম, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, লম্বা নলাকৃতির ও নরম দেহ বিশিষ্ট প্রাণী।
- ২। এদের দেহপ্রাচীর এপিডার্মিস দ্বারা গঠিত যা একটি পাতলা ও নমনীয় কিউটিক্স দ্বারা আবৃত।
- ৩। এদের দেহ আংটির ন্যায় একাধিক সমরূপ খণ্ডক বা মেটামিয়ার (metamere) নিয়ে গঠিত।
- ৪। দেহে পেরিটোনিয়াম পর্দা বেষ্টিত ও তরল পূর্ণ প্রকৃত সিলোম বিদ্যমান।
- ৫। চলনঅঙ্গ সিটা (seta) অথবা প্যারাপোডিয়া (parapodia) অথবা অনুপস্থিতি।
- ৬। মুখ হতে পায় পর্যন্ত বিস্তৃত সোজা ও অখণ্ডায়িত পুরিপাকনালি নিয়ে পরিপাকতন্ত্র গঠিত।
- ৭। রেচন অঙ্গ প্যাচানো নেফ্রিডিয়া যা দেহের প্রতি খণ্ডকে বিদ্যমান থাকে। এজন্য এদের সেগমেন্টাল অর্গান (segmental organ) বলে।
- ৮। রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির; লাল বর্ণের রক্তে সাধারণত হিমোগ্লোবিন, হিমোইরিথ্রিন, ক্লোরোক্রিনিন ইত্যাদি রঞ্জক থাকে।
- ৯। উভলিঙ্গ অথবা একলিঙ্গ, জীবনচক্রে ট্রিকোফোর লার্ভা (trochophore larva) দশা থাকে, অনেকক্ষেত্রে অতৌন প্রজনন ঘটে।

উদাহরণ: *Metaphire posthuma* (কেঁচো), *Hirudinaria granulosa* (জঁক), *Neanthes virens* (নেরিস), *Aphrodita aculeata* (সমুদ্র উকুন), *Amphitrite ornata* (অরনেট কীট), *Tubifex tubifex* (রক্ত কীট), *Serpula vermicularis* (পাথা কীট) ইত্যাদি।



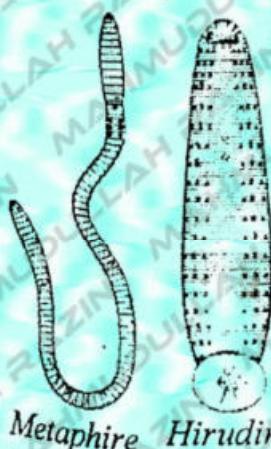
প্যারাপোডিয়া সিটা



নেফ্রিডিয়াম



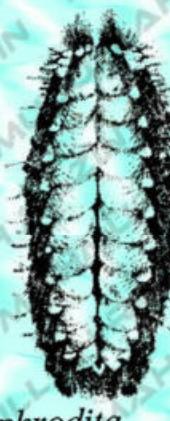
ট্রিকোফোর লার্ভা



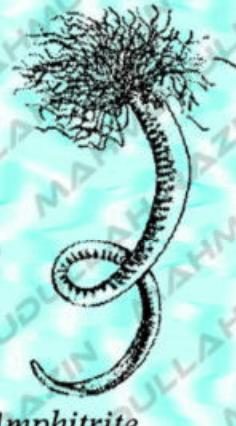
Metaphire Hirudinaria



Neanthes



Aphrodita



Amphitrite



Tubifex



Serpula

Phylum 7. ARTHROPODA (আর্থ্রোপোডা) (Gr. *arthron*-joint+ *podos*-foot)

প্রাণিগতের বৃহত্তম পর্ব হলো Arthropoda। Von Siebold (1845) Arthropoda পর্বের নামকরণ করেন। প্রাণিগতের প্রায় 80% প্রাণীই এ পর্বভুক্ত। বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 12,57000। বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যেও এরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। পরিবেশের বাসযোগ্য সকল স্থানেই এদের অভিযোজনিক বিচ্ছুরণ ঘটেছে। মাকড়শা (spiders), চেলা (scorpion), মাইট (mites), এঁটেল (ticks), খোলকি (crustacean), শতপদী (centipedes), পতঙ্গ (insects) ইত্যাদি সকল প্রাণীই এ পর্বভুক্ত। বাস্তুতাত্ত্বিক বিস্তার বৈচিত্র্যে আর্থ্রোপোডাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এদের অধিকাংশই তৃণভোজী (herbivores), কিছুসংখ্যক মাংসাসী (carnivours) অথবা সর্বভুক (omnivours) প্রকৃতির।

বৈশিষ্ট্য:

১। দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, খঙ্গায়িত এবং সুনির্দিষ্ট অঞ্চলায়ন (tagmatization) বিশিষ্ট।

২। দেহ কাইটিন নির্মিত শক্ত বহিঃকক্ষাল দ্বারা আবৃত থাকে যার নিয়মিত নির্মোচন (ecdysis) ঘটে।

৩। প্রতি দেহথঙ্গকে একজোড়া সন্ধিযুক্ত পা এবং মন্তকে দুজোড়া অ্যাটেনা (antenna) এবং একজোড়া জটিল চক্ষু (compound eyes) বিদ্যমান।

৪। মুখছিদ্র রূপান্তরিত জটিল প্রকৃতির মুখোপাঙ্গ দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে যা প্রাণীর খাদ্যগ্রহণের সাথে অভিযোজিত।

৫। রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত প্রকৃতির এবং হৃৎপিণ্ড, ধমনি ও হিমোসিল নিয়ে গঠিত।

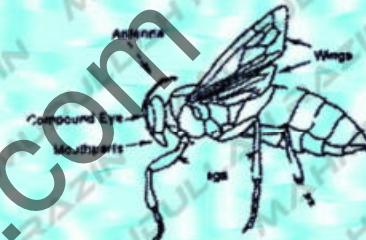
৬। সাধারণ দেহতল অথবা অঙ্গ ট্রাকিয়া (tracheae), ফুলকা (gills) ও বুক লাং (book lung) এর মাধ্যমে শ্বসন সম্পন্ন হয়।

৭। রেচনঅঙ্গ ম্যালপিজিয়ান নালি, সুজু গ্রহণ, কুঞ্চাল গ্রহণ বা সিলোম নালি।

৮। অধিকাংশ আর্থ্রোপোড একলিঙ্গ প্রাণী এবং এদের যুগ্ম প্রকৃতির জননাঙ্গ (শুক্রাশয় বা ডিমাশয়) বিদ্যমান।

৯। নিষেক অভ্যন্তরীন, অধিকাংশই ডিম পাড়ে; পরিস্কুটনে রূপান্তর দেখা যায়।

জীবনচক্রে লার্ভা, পিউপা বা নিশ্চ দশা দেখা যায়।



একটি পরিণত পতঙ্গ



পতঙ্গের মুখোপাঙ্গ



বুক লাং



Macrobrachium



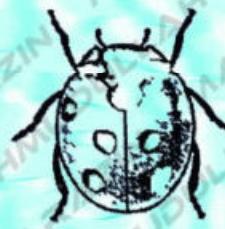
Musca



Papilio



Balanus



Coccinella



Eupagurus



Scolopendra



Mantis



Tachypleus



Lepisma

Phylum 8. ECHINODERMATA (একাইনোডামাটা) (Gr. *echinos*= spine + *derma*=skin)

Jacob Klein (1734) Echinodermata পর্বের নামকরণ করেন। এরা অতি পরিচিত সম্পূর্ণরূপে সামুদ্রিক প্রাণী। পানির সামান্য লবণ মাত্রা পরিবর্তনে এরা অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে এদেরকে মোহনা এলাকায়ও পাওয়া যায় না। এ পর্বের প্রাণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের সকলের দেহই চুন নির্মিত কটকময় ত্তক দ্বারা আবৃত থাকে। এজন্য এদের কটকত্তক প্রাণী বলা হয়। সমুদ্র তারা (sea stars), সমুদ্র আর্চিন (sea urchins), সমুদ্র শশা (sea cucumbers), সমুদ্র লিলি (sea lilies) এবং স্যান্ড ডলার (sand dollars) ইত্যাদি প্রাণী এ পর্বভূক্ত। এ পর্বে জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 7,500 (Hickman, 2008)। এদের অধিকাংশ প্রাণীই দেহের যে কোন কলা, অঙ্গ বা বাহর পুনরুৎপন্নির ক্ষমতা রাখে। এদের বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীতে খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতির ব্যপক তারতম্য দেখা যায়। প্রায় সকল সমুদ্র তারা মাংসাশী বা ছাঁকন খাদক। সমুদ্র আর্চিনরা শৈবাল কিংবা মাছের মৃত দেহ ভক্ষণ করে।

বৈশিষ্ট্য :

১। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী পঞ্চঅরীয় (pentamerous) প্রতিসম, অখণ্ডায়িত, তারকাকার, গোলাকার, চাকতির ন্যায় অথবা লম্বাকৃতির; লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় (bilateral) প্রতিসম।

২। দেহ কটকময়, ত্রিস্তর বিশিষ্ট এবং স্পাইন (spine) ও পেডিসিলারি (pedicellary) নামক বহিঃকক্ষালযুক্ত।

৩। দেহ ওরাল-অ্যাবওরাল তলে বিন্যস্ত, ওরালতলে পাঁচটি অ্যাম্বুল্যারি খাঁজ (ambulacral groove) বিদ্যমান থাকে।

৪। দেহে বিশেষ ধরনের পানি সংবহনতন্ত্র (water vascular system) বিদ্যমান থাকে।

৫। রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত তবে হিমালতন্ত্র (haemal system) ও পেরিহিমালতন্ত্র সংবহনতন্ত্রের কাজ করে।

৬। তৃকীয় ফুলকা, নালিকাপদ (tube feet) বা শ্বসনবৃক্ষ (respiratory trees) ইত্যাদি দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়, রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত।

৭। একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক ব্যাহ্যিক, জীবনচক্রে মুক্ত সন্তরণশীল বাইপিনারিয়া, অরিকুলারিয়া, অফিউকিটাস কিংবা একাইনোকিটাস লার্ভা বিদ্যমান।

৮। সকলেই মুক্তজীবী সমুদ্রিক; এদের কোন পরজীবী সদস্য নেই।

উদাহরণ: *Antedon bifida* (গোলাপী পালক তারা), *Astropecten irregularis* (সমুদ্র তারা), *Echinus esculentus* (সমুদ্র আর্চিন), *Cucumaria frondosa* (সমুদ্র শশা), *Ophiocoma scolopendrina* (ত্রিস্ল তারা), *Oreaster reticulatus* (সমুদ্র পেন্টাগন), *Anthenea pentagonula* (আকা সমুদ্র তারা), *Asterias rubens* (সমুদ্র তারা) ইত্যাদি।



স্পাইন ও পেডিসিলারি



পানি সংবহনতন্ত্র



হিমালতন্ত্র



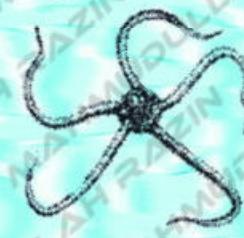
Antedon



Echinus



Cucumaria



Ophiocoma



Oreaster



Anthenea



Astropecten



Asterias

চিত্র ১.১৪: Echinodermata পর্বের কয়েকটি প্রাণী

১.৫ পর্বের প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস: কর্ডটা (CHORDATA)

কর্ডটা পর্বের প্রাণী মানুষের নিকট অতি পরিচিত। Balfour (1880) নটোকর্ডধারী প্রাণীদের নিয়ে Chordata পর্বটি সৃষ্টি করেন। যেসব প্রাণিদেহে জীবন চক্রের যে কোন দশায় অথবা সারাজীবন নটোকর্ড (notochord; Gr. *noton*, back, L. *chorda*, cord) নামক বিশেষ একটি গঠন বিদ্যমান থাকে তাদের কর্ডটা বলে। এ পর্বের প্রাণীদের দেহের কিছু বৈশিষ্ট্য অন্যান্য নন-কর্ডটা প্রাণীতেও থাকে যেমন- দ্বিপাঞ্চায় প্রতিসাম্যতা, সমুখ-পশ্চাত দেহ অঙ্গ, মেটামেরিজম এবং মস্তকায়ন। যদিও প্রাণিগতে এদের জ্ঞাতিতাত্ত্বিক অবস্থান সুস্পষ্ট নয় তবুও এদের দেহের অঙ্গ ও অঙ্গ-তন্ত্রের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য কর্ডটাকে অন্যান্য পর্ব হতে আলাদা করেছে। বাস্ততাত্ত্বিকভাবে এরা অন্যান্য প্রাণী হতে অধিক অভিযোজিত এবং যে কোন বাসস্থানে বাস করতে সক্ষম। নতুন অঙ্গের বিকাশ, অভিযোজনিক কৌশল ও অভিযোজনিক বিচ্ছুরণের মতো কিছু মৌলিক বিবর্তনিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে এরা প্রাণিগতের অন্যান্য পর্বের প্রাণী হতে যথেষ্ট এগিয়ে আছে। এ পর্বের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 68,500 (Hickman, 2008)।

বৈশিষ্ট্য

Chordata পর্বের প্রাণীর নিম্নের পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এদেরকে অন্যান্য পর্ব হতে আলাদা করেছে :

১। একটি নমনীয়, দণ্ডাকৃতির ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড (notochord) প্রাণীর জীবনের যেকোন দশায় বিদ্যমান থাকে। [নিম্নশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীতে (হাগফিশ ও ল্যাম্ফে) নটোকর্ড সারাজীবন বিদ্যমান থাকে কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এটি কোমলাঙ্গিক কিংবা অঙ্গ নির্মিত মেরুদণ্ড (vertebral column) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়]

২। একটি পৃষ্ঠীয় ফাঁপা ও নলাকার স্নায়ুরজ্জু (nerve cord) পরিপাক নালির উপর দিয়ে প্রসারিত থাকে। এর সমুখ অংশ স্ফীত হয়ে বিশেষায়িত মস্তিষ্ক (brain) গঠন করে এবং বাকী অংশ সুযুগ্মা কাণ (spinal cord) গঠন করে।

৩। জীবন চক্রের যে কোন দশায় গলবিলীয় ফুলকা থলি বা রঞ্জ (pharyngeal gill slits) বিদ্যমান থাকে। পূর্ণবয়স্ক জলচর কর্ডটাদের ক্ষেত্রে এগুলো গলবিলীয় ফুলকায় পরিণত হয়।

৪। গলবিলের মেঝেতে এন্ডোস্টাইল (endostyle) নামক গঠন থাকে যা পূর্ণবয়স্ক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে থাইরয়েড গ্রাহিতে পরিণত হয়।

৫। একটি পায়ু পশ্চাত লেজ (post anal tail) বিদ্যমান।



চিত্র ১.১৫: Chordata পর্বের প্রাণীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কর্ডটাদের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান-

১। এরা ত্রিতীয়, দ্বিপাঞ্চায় প্রতিসম, প্রকৃত সিলোমযুক্ত ডিউটারোস্টোম প্রাণী।

২। দেহের খণ্ডাক কেবল দেহপ্রাচীর, মস্তক ও লেজে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু সিলোম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় না।

৩। গুরু সংবহনতন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির, হৎপিণ অঙ্কীয়, হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।

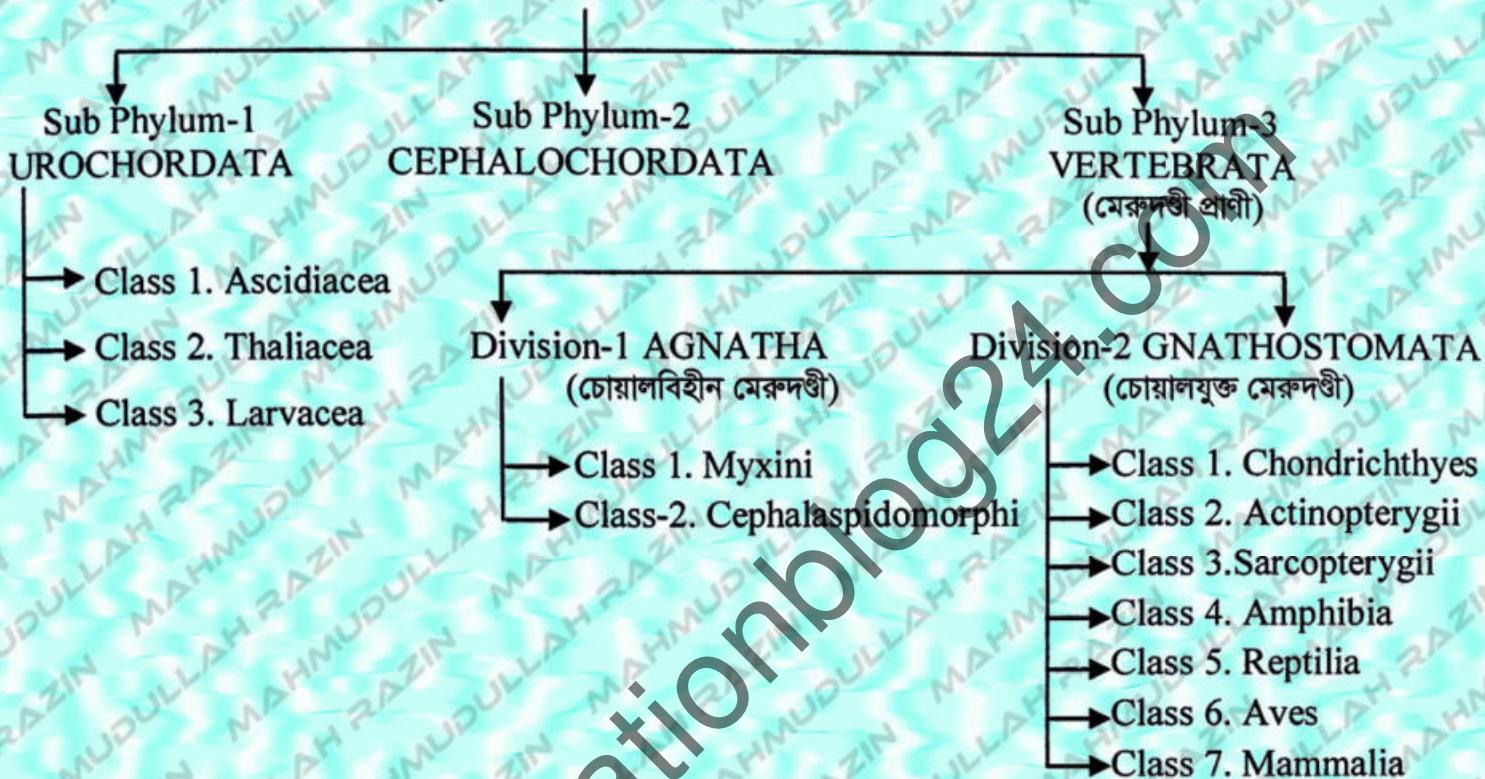
৫। পরিপাকতন্ত্র সম্পূর্ণ, এতে পাকস্থলি ও অন্ত সুস্পষ্টভাবে পৃথক।

কর্ডটা পর্বের জীবিত প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস

নিম্নে উল্লিখিত কর্ডটা পর্বের জীবিত প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসটি Cleveland P. Hickman এর 'Integrated Principal of Zoology (14th edition, 2008) পুস্তক অনুসরণে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রেণিবিন্যাসের ক্লাপরেখা

Phylum -CHORDATA



শ্রেণিবিন্যাসের বর্ণনা

নিম্নে কর্ডটা পর্বের বিভিন্ন উপপর্ব (Subphylum) ও শ্রেণির (Class) বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

Subphylum 1. UROCHORDATA (Gr. *oura* = tail and *chorda* = cord)

উপপর্ব Urochordata (লেজ-কর্ডটা) এর অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের সাধারণত টিউনিকেটস (Tunicates) বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে প্রায় 2804 প্রজাতির টিউনিকেট প্রাণী পাওয়া গেছে। এরা অগভীর সমুদ্রে বাস করে। বিজ্ঞানী Lamarck এদের Tunicata নামকরণ করেন। এদের প্রায় সকলের দেহেই সেলুলোজ গঠিত টিউনিক (tunic) বা টেস্ট (test) নামের একটি স্থিতিস্থাপক ও অঙ্গসংস্থ আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও টিউনিকেটা নামটি ব্যপক ব্যবহৃত হয়। টিউনিকেটের 'সাসপেনশন ফিল্ড' অর্থাৎ এরা সমুদ্রের পানি থেকে বিশেষ ধরনের ছাঁকন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য গ্রহণ করে। এদের দেহে ডাইডেমনিন (didemnins) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে যা ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্য :

- ১। সামুদ্রিক প্রাণী; লার্ভা দশা মুক্তজীবী, পূর্ণজ অবস্থায় নিশ্চল।
- ২। দেহের লেজ অংশে নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড সীমাবদ্ধ থাকে।
- ৩। অধিকাংশক্ষেত্রে দেহ টিউনিক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৪। গলবিল বৃহৎ থলির মতো; এর প্রাচীরে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র বিদ্যমান থাকে।
- ৫। রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত প্রকৃতির; হৃৎক্রে 'রিভার্স পেরিস্ট্যালসিস' দেখা যায়। অর্থাৎ রক্তপ্রবাহ প্রতিবাহ গতিপথ উল্টাদিকে পরিবর্তন করে।
- ৬। উভলিঙ্গ; জীবনচক্রে ট্যাডপোল (tadpole) নামক লার্ভা দশা বিদ্যমান।
- ৭। লার্ভার প্রতীপ ক্লাপান্তর (retrogressive metamorphosis) ঘটে অর্থাৎ উন্নত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুন্নত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

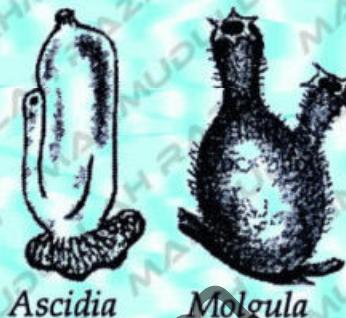


চিত্র ১.১৭: প্রতীপ ক্লাপান্তর

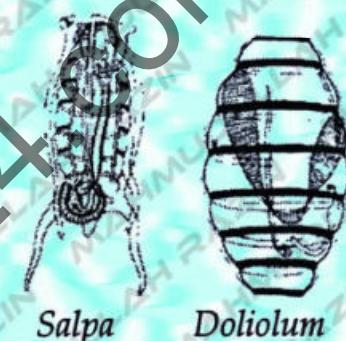
উপপর্ব Urochordata কে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-

Class 1. ASCIDIACEA (অ্যাসিডিয়াসিয়া)

১। এরা একক বা উপনিবেশিক, স্থির বা মুক্ত সন্তরণশীল টিউনিকেট যাদেরকে সাধারণত 'সমুদ্রের ফোয়ারা (sea squirt)' বলা হয়।



২। এরা দেহের পশ্চাত অংশ দিয়ে কেবল বন্ধন সাথে যুক্ত থাকে।



৩। এদের দেহ নরম ও চামড়ায় ন্যায় টিউনিক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

৪। দেহের মুক্ত প্রান্তে বহির্বাহী ও অন্তর্বাহী সাইফন থাকে।

৫। থলে আকৃতির গলবিলে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র থাকে; পৌষ্টিকনালি U আকৃতির।

উদাহরণ: *Ascidia mentula, Molgula oculata.*

CLASS 2. THALIACEA (থ্যালিয়াসিয়া)

১। এরা একক বা উপনিবেশিক, মুক্ত ভাসমান বেনথিক টিউনিকেট।

২। এদের দেহ পিপে (barrel) বা লেবু (lemon) আকৃতির ও লেজ বিহীন।

৩। এদের দেহ পাতলা ও স্বচ্ছ টিউনিক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

৪। দেহে কয়েকটি বৃত্তাকার পেশি বন্ধনী বিদ্যমান এবং দেহের এক প্রান্তে বহির্বাহী ও অন্য প্রান্তে অন্তর্বাহী সাইফন থাকে।

৫। এদের অনেকের দেহে আলোক বিচ্ছুরণকারী লুমিনাস অঙ্গ (luminous organs) থাকায় রাতের বেলায় উজ্জ্বল আলোর ছড়াতে দেখা যায়।

উদাহরণ: *Salpa maxima, Doliolum denticulatum.*

CLASS 3. LARVACEA (লার্ভাসিয়া)

১। এরা লার্ভা সদৃশ্য পেলাজিক প্রাণী এবং আকৃতির অনেকটা বাকা ট্যাডপোল লার্ভার মতো।

২। পরিণত প্রাণীর একটি দেহকাণ্ড ও লম্বা লেজ থাকে।

৩। এদের লেজে নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় নার্ভকর্ড এবং একসারি পেশি থাকে।

৪। এরা মিউকাস সমৃদ্ধ একটি নমনীয় বাসা তৈরি করে যা এদের খাদ্য গ্রহণে সহায়তা করে।

উদাহরণ: *Oikopleura dioica.*

Subphylum 2. CEPHALOCHORDATA (Gr. *Kephale* =head and *chorda* = cord)

উপপর্ব Cephalochordata দের সাধারণত বর্ণাফলক প্রাণী (lancelets) বলা হয়। এ উপপর্বের মাত্র একটি গণভূক্ত 33টি প্রজাতি আছে যেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন উপকূলের বালিময় তলদেশে বাস করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হিসেবে প্রাণিবিজ্ঞানে এদেরকে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা হয়। প্রাথমিক বর্ণনায় এদেরকে *Amphioxus* (Gr. *amphi*=both ends= *oxys*, sharp) হিসেবে উল্লেখ করলেও পরবর্তীতে অগাধিকার আইনের কারণে এরা *Branchiostoma* (Gr. *branchia*=gills, *stoma*= mouth) নাম ধারণ করে। কারণ এদের প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণীটিকে *Branchiostoma lanceolatum* হিসেবে বিজ্ঞানী *Peter Simon Pallas, 1774* সালে বর্ণনা করেছিলেন।

বৈশিষ্ট্য:

১। সামুদ্রিক প্রাণী; দেহ অর্ধস্বচচ, সরু, পাশ্বীয় চাপা, লম্বা ও উভয়প্রান্ত সূঁচালো।

২। দেহ 3-7 সেন্টিমিটার লম্বা এবং দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রায় 60 জোড়া ‘>’ আকৃতির মায়োটোম পেশি বিদ্যমান।

৩। এদের দেহের পৃষ্ঠাকে সম্মুখ থেকে পশ্চাত পর্যন্ত বিস্তৃত নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড আজীবন বিদ্যমান থাকে।

৪। অসংখ্য ওরাল সিরি (buccal cirri) সমৃদ্ধ একটি একটি ওরাল ছড় (oral hood) দ্বারা মুখছিদ্র পরিবৃত্ত থাকে।

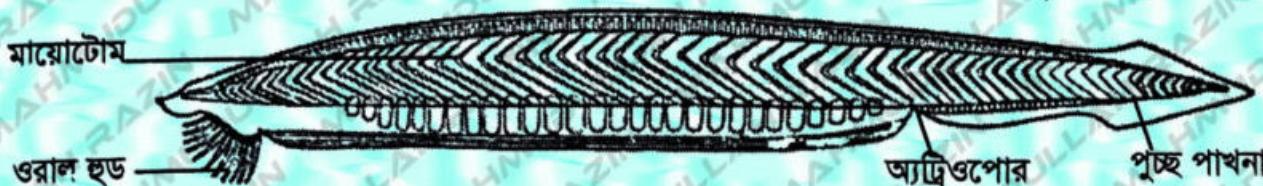
৫। গলবিলের প্রাচীরে বিদ্যমান অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র অ্যাট্রিয়াম (atrium) গহ্বরে উন্মুক্ত হয় যা একটি অ্যাট্রিওপোর (atriopore) দ্বারা দেহের বাইরে মুক্ত হয়।



৬। রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ ও উন্নত ধরনের, তবে কোনো হৃৎপিণ্ড ও শ্বসন রঞ্জক নেই; হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।

৭। সোলেনোসাইট কোষ (solenocytes) সমৃদ্ধ প্রোটোনেক্রিডিয়া এদের প্রধান রেচন অঙ্গ।

উদাহরণ: *Branchiostoma lanceolatum* (পূর্বনাম *Amphioxus*).



চিত্র ১.১৮: *Branchiostoma*

Subphylum 3. VERTEBRATA (Latin, *vertebratus* = vertebral column)

Chordata পর্বের তৃতীয় উপপর্ব Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণী উচ্চশ্রেণির প্রাণী হিসেবে পরিচিত। কর্ডটা পর্বের সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এদের অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো দ্বারা এদেরকে অন্য দুটি কর্ডট উপপর্ব এবং অন্যান্য নন কর্ডট হতে আলাদা করা যায়। এ উপপর্বের অন্য একটি নাম হলো Craniata যা অনেকের মতে অধিক গ্রহণযোগ্য, কেননা এ উপপর্বের সকল প্রাণীর প্রকৃত মেরুদণ্ড থাকে না (যেমন-চোয়াল বিহীন ল্যাম্প্রে ও হ্যাগফিস) কিন্তু সকলেরই কোমলাছি বা অস্থি নির্মিত মস্তিকের আবরণ ক্রেনিয়াম (cranium) বিদ্যমান থাকে। উপপর্ব Vertebrata তে Chordata পর্বের অধিকাংশ প্রাণীই অস্তর্ভুক্ত এবং এদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা 66,178 (IUCN, 2014)।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড রূপান্তরিত ও প্রতিস্থাপিত হয়ে কোমলাছি বা অস্থি নির্মিত মেরুদণ্ড গঠন করে।
- ২। নার্ভ কর্ডের সম্মুখ অংশ স্ফীত হয়ে বিষেশায়িত মস্তিক এবং বাকী অংশ সুস্থুদ্ধা কাও গঠন করে।
- ৩। কোমলাছি বা অস্থি নির্মিত অস্তঃকক্ষাল বিদ্যমান বা নিউরাল ক্রেস্ট কোষ থেকে সৃষ্টি মেরুদণ্ড ও করোটি নিয়ে গঠিত।
- ৪। দেহ তুক বা ইন্টেগ্রেট দ্বারা আবৃত থাকে যা এন্টোডার্ম উত্তৃত বাইরের এপিডার্মিস (epidermis) ও মেসোডার্ম উত্তৃত ভেতরের ডার্মিস (dermis) নিয়ে গঠিত।
- ৫। দেহে তুকোস্তুত গ্রস্তি, আইশ, পালক, নখ, নখড় শিঙ ও লোম বিদ্যমান থাকে।
- ৬। পরিপাকতন্ত্র সম্পূর্ণ; এটি পেশিময় পৌষ্টিকনালি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় নিয়ে গঠিত।
- ৭। রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ ধরনের; এটি সক্ষেচনশীল হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি এবং লাল বর্ণের রক্ত নিয়ে গঠিত।
- ৮। মেসোডার্মাল বৃক্ত প্রধান রেচন অঙ্গ; এটি দেহের পানি ও আয়নের সাম্যতা (osmoregulation) নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৯। ডিন অংশে বিভেদিত মস্তিকে 10 - 12 জোড়া করোটিক স্নায়ু (cranial nerves) থাকে।
- ১০। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য হরমোন নিঃসরণকারী বিভিন্ন অস্তঃক্রা গ্রহি বিদ্যমান।
- ১১। অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে দুইজোড়া উপাদিক কক্ষাল থাকে যারা সুনির্দিষ্ট অস্থিচক্র দ্বারা অবলম্বিত।

Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

মুখে চোয়ালের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে উপপর্ব Vertebrata কে দুটি অধিশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

Super Class 1. AGNATHA (Gr. *a*=absent, *gnathos*=jaw)

মুখে চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডীদের Agnatha বলা হয়। জীবিত হ্যাগফিস (hagfishes) ও ল্যাম্প্রে (lampreys.) এবং বিলুপ্ত অস্ট্রোডার্ম (ostracoderms) প্রাণী Agnatha অস্তর্ভুক্ত। এসব প্রাণিদেহে চোয়াল, আইশ এবং যুগ্ম উপাঙ্গ অনুপস্থিত। এদের দেহ লম্বা, নলাকার, অস্তঃকক্ষাল কোমলাছিময় এবং দেহে 5-15 জোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে। এরা পরজীবী বা মৃতজীবী খাদ্যাভাসে অভিযোজিত। অধিশ্রেণি Agnatha কে দুটি শ্রেণি Myxini ও Cephalaspidomorphi তে ভাগ করা হয়।

Class 1 MYXINI (মিক্সিনি) (Gr. *myxa* = slime)

Myxini শ্রেণির প্রাণীদের সাধারণত হ্যাগফিস (hagfish) বলা হয় যার আভিধানিক অর্থ হলো কুৎসিত মাছ। এদেরকে স্লাইম ইল (slime eel) নামেও অভিহিত করা হয়। এরা মুক্তজীবী মৃতপ্রাণী ভক্ষণকারী অথবা পরজীবী প্রকৃতির সামুদ্রিক প্রাণী। অ্যানেলিড, মোলাক্ষা, ক্রাস্টাসিয়ান ও প্রাণীর মৃতদেহ এদের প্রধান খাদ্য। এরা দেহে বিপুল পরিমাণ মিউকাস উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে সুপরিচিত। প্রায় 70 প্রজাতির হ্যাগফিস আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। এরা আদি প্রকৃতির মেরুদণ্ডী যাদের চোয়াল, যুগ্ম উপাঙ্গ ও বহিঃকক্ষাল নেই।
- ২। দেহ পিচ্ছল, দুর্বল প্রকৃতির, মুখছিদ্র প্রাতীয়, মুখচূঙ্গ অনুপস্থিত এবং মুখে চারজোড়া কর্ণিকা থাকে।
- ৩। নাসাথলি গলবিলে যুক্ত, ফুলকা ছিদ্র 5-15 জোড়া।
- ৪। মেরুদণ্ডে নটোকর্ড (notochord) এবং তন্ত্রময় নিউরাল টিউব (nural tube) থাকে।
- ৫। পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলি বিহীন; অন্ত্রে সিলিয়া কিংবা সর্পিল কপাটিকা থাকে না।
- ৬। পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জুর অগ্রভাগ মন্তিক্ষ গঠন করে; সেরিবেলাম নেই; করোটিক স্নায়ু 10 জোড়া।
- ৭। একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, ডিম কুসুমযুক্ত বৃহদাকৃতির, কোন লার্ভা দশা নেই।

উদাহরণ: *Myxine glutinosa* (আটলান্টিক হ্যাগফিস), *Eptatretus stoutii* (প্রশান্ত মহাসাগরীয় হ্যাগফিস)।

Class 2 CEPHALASPIDOMORPHI (সেফালাসপিডোমর্ফি) (Gr. *kephale* = head)

Cephalaspidomorphi শ্রেণির প্রাণীদের সাধারণত ল্যাম্প্ৰে (lamprey) বলা হয় যার আভিধানিক অর্থ হলো পাথরে আটকে থাকা। এরা সাধারণত স্বামুদ্রিক উপকূল ও স্বাদুপানিতে বাস করে। পরিণত ল্যাম্প্ৰে নদীতে প্রজনন করে এবং মরে যায়। এদের তরুণ অ্যামোসিট লার্ভা (ammocoete larva) নদীতে বাস করে। এরা নদীর বালিতে গর্ত তৈরি করে এবং ছাঁকন পদ্ধতিতে ডেট্রিটাস ও অণুজীব জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। কয়েক বছর পর এদের রূপান্তর ঘটে এবং এরা নদী বা সমুদ্রে গমন করে। সেখানে এরা মাছ বা জলচর স্তন্যপায়ীর দেহে বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। এদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা 46।



বৈশিষ্ট্য:

- ১। দেহ আইশবিহীন, সরু-বেলনাকার, বাইন মাছ সদৃশ এবং লম্বায় 13-100 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ২। দেহে চোয়াল, যুগ্ম উপাঙ্গ ও বহিঃকক্ষাল নেই; একটি বা দুটি পৃষ্ঠ পাখনা ও একটি পুঁজি পাখনা থাকে।
- ৩। পরিণত প্রাণীর মুখে চোষক সদৃশ্য মুখ চুঙ্গ (buccal funnel) এবং জ্বিহবায় সূ-উন্নত কেরাটিনযুক্ত দাঁত বিদ্যমান।
- ৪। দেহে তন্ত্রময় কোমলাত্মিযুক্ত অস্তঃকক্ষাল এবং মেরুদণ্ডে নটোকর্ড এবং তন্ত্রময় নিউরাল টিউব থাকে।

- ৫। পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলি বিহীন; অন্তে সর্পিল কপাটিকা থাকে।
 - ৬। নাসাথলি গলবিলে উন্মুক্ত হয় না, ফুলকা ছিদ্র 7 জোড়া।
 - ৭। একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, জীবনচক্রে অ্যামোসিট লার্ভা দশা বিদ্যমান।

উদাহরণ: *Petromyzon marinus*, *Entosphenus tridentatus*, *Geotria australis*.

Super Class 2. GNATHOSTOMATA (Gr. *gnathos*=jaw; *stoma*=mouth)

মুখে চোয়ালযযুক্ত মেরুদণ্ডীদের Gnathostomata বলা হয়। জীবিত মাছ (fish), উভচর (amphibia), সরীসৃপ (reptilia), পাখি (bird) ও স্তন্যপায়ী (mammals) এবং বিলুঙ্গ প্লাকোডার্ম (placoderms) প্রাণী Gnathostomata অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রাণীদেহে চোয়াল, আইশ, পালক, লোম, মুঘ পাখনা এবং বাহু উপপন্থিত। প্রায় 99% মেরুদণ্ডী প্রাণী এ দলভুক্ত এবং এদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 60,000। অধিশ্রেণি Gnathostomata কে নিম্নের 7টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

Class 1. CHONDRICHTHYES (কঙ্কিথিস) (Gr. *Chondros*=cartilage + *ichthyes* = fish)

কোমলাস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কালযুক্ত মাছদের Chondrichthyes শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এগুলো আদি প্রকৃতির মাছ যারা ডিভেনিয়ান যুগে আবির্ভূত হয়েছিলো। বিশ্বব্যাপি এদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 1200। এদের সকলেই সামুদ্রিক। সু-উন্নত সংবেদী অঙ্গ, শক্তিশালি চোয়াল ও সাঁতার পেশি এবং শিকারী স্বভাব এদেরকে সামুদ্রিক জীবসম্পদায়ে একটি নিরাপদ ও সুদৃঢ় অবস্থান করে দিয়েছে।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:

- ১। দেহ বৃহৎ, পৃষ্ঠীয়-অঙ্কীয় চ্যান্টা অথবা মাকু আকৃতির এবং দেহে হেটোরোসার্কাল (অসমভাবে দ্বিবিভক্ত) প্রকৃতির পুষ্টি পাখনা, যুগ্ম প্রকৃতির বক্ষ ও শ্রোণি পাখনা বিদ্যমান
 - ২। পুরুষ মাছে শ্রোণি পাখনা রূপান্তরিত হয়ে সঙ্গম অঙ্গ ক্লাসপার (clasper) গঠন করে।
 - ৩। অন্তঃকক্ষাল সম্পূর্ণভাবে কেমলাস্থি নির্মিত, মেরুদণ্ডে ক্ষয়িত (reduced) নটোকর্ড থাকে।
 - ৪। মুখছিদ্র অঙ্কীয়, বৃহৎ ও অর্ধচন্দ্রাকার, মুখে প্ল্যাকয়ডাল দাঁত বিদ্যমান।
 - ৫। — প্লেকাইড স্কেল (placoid scale) দাঁত আবক্ষ জগতৰা নগ।

- ৫। ঢুক প্লাকেলড আইন (placoid scale) দ্বারা আচ্ছত অবধি নয়।
- ৬। শুসন অঙ্গ ফুলকা; 5-7 জোড়া ফুলকাছিদ্র উন্মুক্ত, কানকো (operculum) থাকে না।
- ৭। পরিপাকতন্ত্রে J আকৃতির পাকস্থলি, সর্পিল কপাটিকা (spiral valves) সমৃদ্ধ অস্ত্র এবং চর্বি পূর্ণ যকৃত থাকে।
- ৮। বায়ু পটকা (air bladder) ও ফুসফুস (lung) থাকে না।
- ৯। একলিঙ্গ, অন্তঃনিষেক ঘটে, প্রত্যক্ষ পরিস্কুটন; ডিবজ (oviparous), ডিবজরায়ুজ (ovoviviparous), বা জরায়ুজ (viviparous.) ধারণী।



(ক) ক্লাসপারযুক্ত পুরুষ (খ) ক্লাসপারবিহীন স্ত্রী
হাঙরের শ্রেণিটক্র

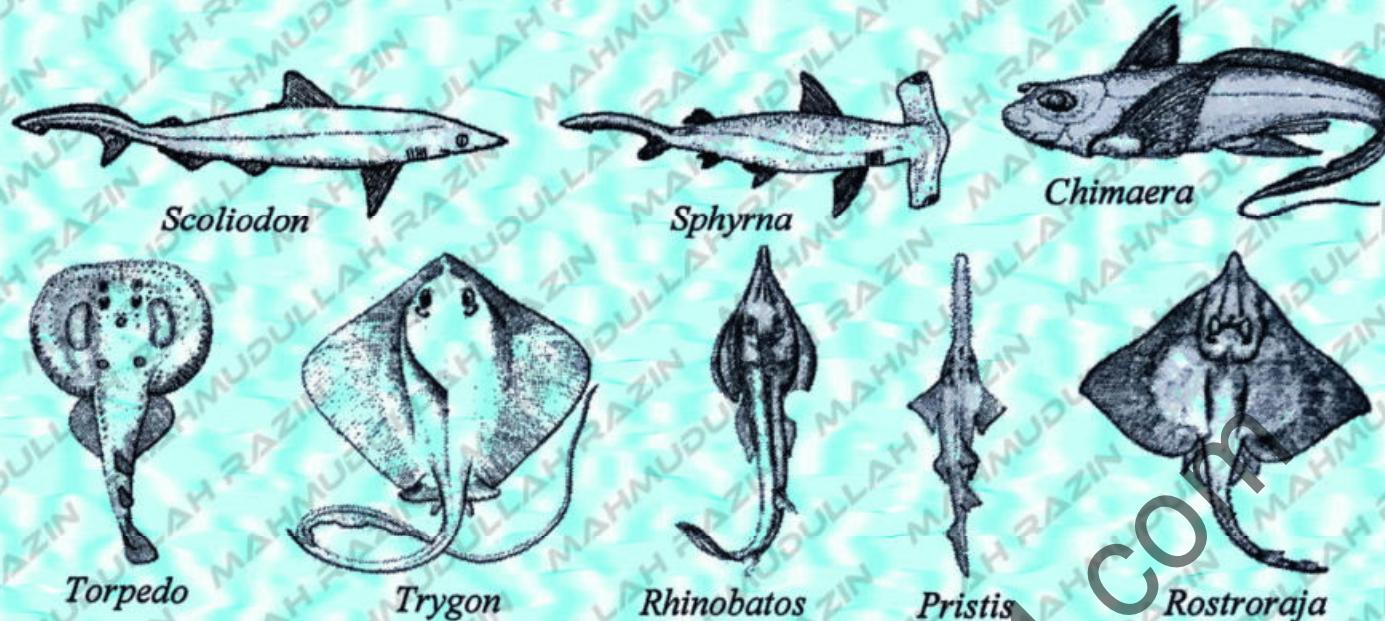


সর্পিল কপাটিকা



প্রাকরণেড আইশ

উদাহরণ: *Scoliodon laticaudus* (থৃষ্ণি হাঙর), *Sphyrna zygaena* (হাতুরি হাঙর), *Chimaera monstrosa* (ইন্দুর মাছ), *Torpedo torpedo* (ইলেকট্রিক রে), *Trygon annotata* (স্টিং রে) *Rhinobatos rhinobatos* (গিটার মাছ), *Pristis microdon* (করাত মাছ), *Rostroraja alba* (শ্বেতী স্কেটস) ইত্যাদি।



চিত্র ১.২১: কয়েকটি কোমলাহিয়ুক্ত মাছ

Class 2. ACTINOPTERYGII (অ্যাকটিনোপ্টেরিজি) (Gr. *actis* = ray + *pteryx* = fin)

Actinopterygii মেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি প্রাথম্য বিস্তারকারী শ্রেণি এবং এ শ্রেণিভুক্ত মাছকে রশ্মিময় পাখনা বিশিষ্ট মাছ (ray-finned fishes) বলে। বিশ্বব্যাপি এ শ্রেণিভুক্ত মাছের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 30,000 (Davis, Brian 2010) যা মোট জীবিত মাছ প্রজাতির প্রায় 96%। এরা মিঠাপানি ও সামুদ্রিক পরিবেশের সকল স্থানে অর্থাৎ গভীর সমুদ্র থেকে শুরু করে পাহাড়ি হৃদসহ সকল জলজ পরিবেশেই বিস্তৃত। এদের জীবিত প্রজাতিগুলো আকারে 10 মিলিমিটার (ফিলিপাইন গোবি-*Mugilogobius parvus*) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 4 মিটার লম্বা ও 1500 কিলোগ্রাম ওজন (সামুদ্রিক সানফিস- *Mola mola*) বিশিষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশের মিঠাপানিতে 12টি বর্গ ও 48টি গোত্রের 253 প্রজাতির মাছ শনাক্ত করা হয়েছে। (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য :

- ১। অন্তঃকক্ষাল এন্ডোকন্ড্রালজাত (endochondral origin- কোমলাহি থেকে অস্থির উৎপত্তি) অস্থি নির্মিত।
- ২। দেহে যুগ্ম প্রকৃতির বক্ষ ও শ্রোণি পাখনা এবং অযুগ্ম প্রকৃতির পৃষ্ঠ, পায়ু ও হোমোসার্কাল (সমভাবে দ্বিবিভক্ত) পুচ্ছ পাখনা বিদ্যমান।
- ৩। দেহের সকল পাখনা লম্বা তুকীয় রশ্মি (লেপিডোট্রাকিয়া) দ্বারা সমর্থিত।
- ৪। তুক মিউকাস সমৃক্ষ নয় অথবা তুকের ডার্মিস থেকে সৃষ্টি সাইক্লোয়েড (cycloid) বা চিনয়েড (ctenoid) বা গ্যানয়েড (ganoid) আইশ দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৫। অস্থিময় ফুলকা আর্চ দ্বারা সমর্থিত চার জোড়া ফুলকা নিয়ে শ্বসন অঙ্গ গঠিত। এগুলো মাথার প্রতিপার্শ্বে কানকো (operculum) দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৬। শ্বসনতন্ত্রে বায়ু পটকা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুসফুস থাকে।
- ৭। মস্তিক্রে সেরেবেলাম, অপটিক লোব ও সেরেব্রাম ছোট; করোটিক স্নায়ু 10 জোড়া।
- ৮। একলিঙ্গ প্রাণী; বহিঃংনিষেক ঘটে, পরিস্কৃতন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ।

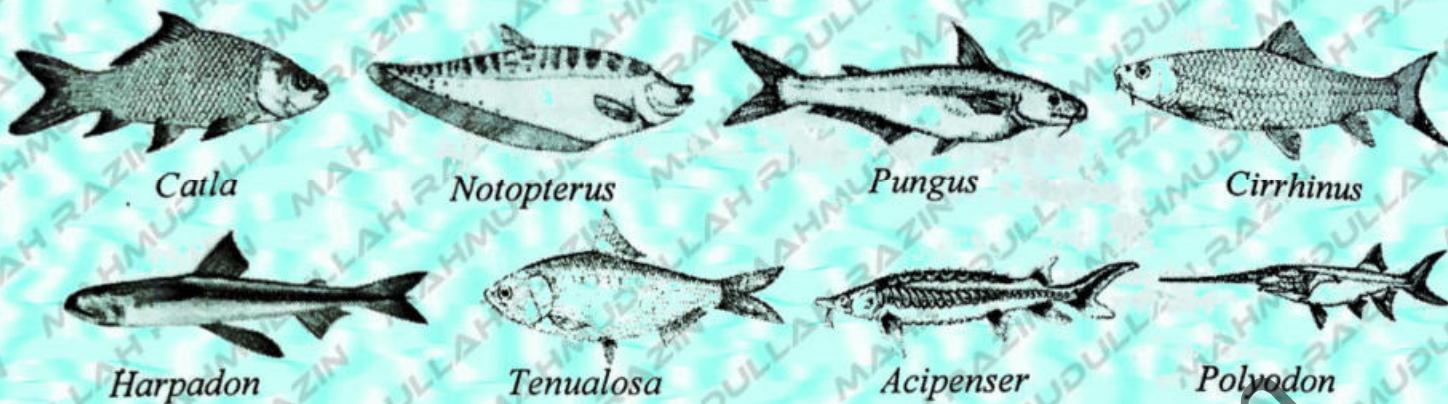


সাইক্লোয়েড, চিনয়েড ও গ্যানয়েড আইশ



তুকীয় রশ্মিসহ পাখনা

উদাহরণ: *Catla catla* (কাতলা), *Notopterus chitala* (চিতল), *Pangasius pangasius* (পাঙ্গাস), *Cirrhinus cirrhosus* (মৃগেল), *Harpodon nehereus* (বোবে ডাক বা লইটা), *Tenualosa ilisha* (ইলিশা), *Acipenser oxyrinchus* (স্টার্জন), *Polyodon spathula* (প্যাডল ফিস) ইত্যাদি।



চিত্র ১.২২: কয়েকটি রশ্মিময় পাখনা বিশিষ্ট মাছ

Class 3. SARCOPTERYGII (সারকোপ্টেরিজি) (Gr. *sarx*=flesh + *pteryx*= fin)

Sarcopterygii শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো অত্যন্ত আদি প্রকৃতির এবং এদের যুগ্ম পাখনাগুলো মাংসল খঙ্ক বিশিষ্ট বলে এদেরকে লোব ফিনড ফিস (lobe finned fishes) বলে। এশ্রেণিভুক্ত মাছ প্রজাতির অধিকাংশই বিলুপ্ত, কেবল ৬টি প্রজাতির লাংফিস (lungfishes) এবং ২টি প্রজাতির সিলাকান্থ মাছ (coelacanths fishes) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জীবিত আছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত ফুসফুস মাছগুলোতে আদিম প্রকৃতির ফুসফুস বিদ্যমান এবং এরা বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে শুসন ঘটায়। সিলাকান্থ মাছগুলো ডাইনোসরের যুগে সৃষ্টি হয়ে বর্তমান পর্যন্ত জীবিত আছে এবং এরা দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তৃত।

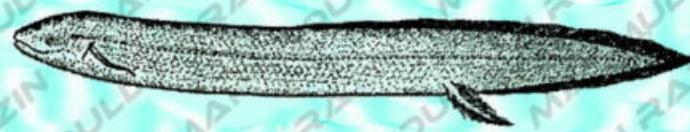
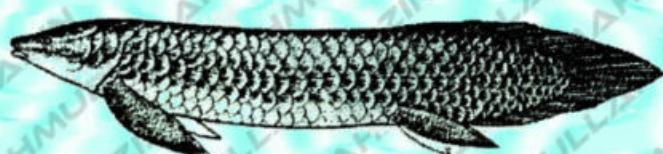
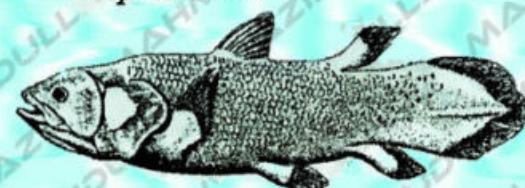
বৈশিষ্ট্য :

- ১। অন্তঃকক্ষাল এন্ডোক্রান্তালজাত অস্থি নির্মিত।
- ২। এদের দেহে মাংসল খঙ্ক বিশিষ্ট (lobed) যুগ্ম পাখনা বিদ্যমান যেগুলো একটি অস্থি দিয়ে দেহের সাথে যুক্ত থাকে।
- ৩। দেহত্তক ডেন্টিন সদৃশ্য বস্তু কসমিন (cosmine) গঠিত কসময়েড আইশ (cosmoid scales) দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৪। পুচ্ছ পাখনা ডিফাইসার্কাল (diphycercal) ধরনের অর্থাৎ সৃঁচালো লেজের প্রান্ত পর্যন্ত মেরেন্দণ বিস্তৃত থাকে।
- ৫। চোয়ালে প্রকৃত এনামেল আবৃত দাঁত বিদ্যমান।
- ৬। অস্থিময় ফুলকা আর্চ দ্বারা সমর্থিত ফুলকা কানকো দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৭। বায়ু পটকা রক্তজালক সমৃদ্ধ এবং শুসন ও ভাসার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ৮। একলিঙ্গ প্রাণী; বহিঃনিষেক বা অন্তঃনিষেক ঘটে।

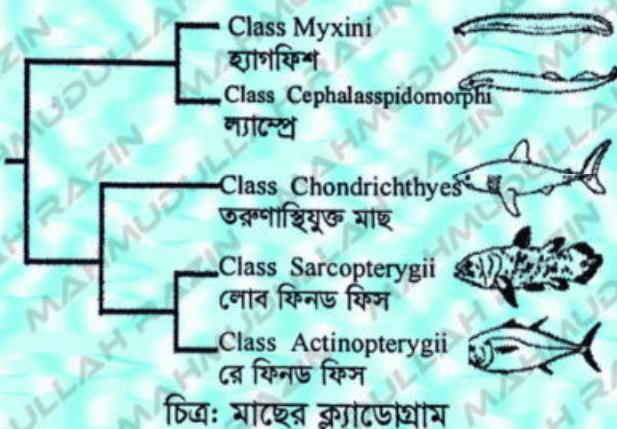


মাংসল খঙ্ক বিশিষ্ট পাখনা

উদাহরণ: *Protopterus aethiopicus* (আফ্রিকান লাংফিস), *Lepidosiren paradoxa* (আমেরিকান লাংফিস), *Neoceratodus forsteri* (অস্ট্রেলিয়ান লাংফিস), *Latimeria chalumnae* (পশ্চিম ভারত সাগরীয় সিলাকান্থ) ইত্যাদি।

*Protopterus**Lepidosiren**Neoceratodus**Latimeria*

চিত্র ১.২৩: কয়েকটি মাংসল খঙ্ক বিশিষ্ট মাছ



মাছ কি?

মাছ হলো দূর বা নিকট সম্পর্কিত কতগুলো শীতল রক্ত বিশিষ্ট জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা ফুলকার সাহায্যে শসন সম্পন্ন করে এবং পাখনার সাহায্যে চলাচল করে। এসব প্রাণী অতি প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় এবং নিম্নলিখিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত:

Myxini, Cephalaspidomorphi, Chondrichthyes, Actinopterygii ও **Sarcopterygii**.

অনেকে মাছের একবচনে *fish* এবং বহুবচনে *fishes* শব্দ ব্যবহার করেন আবার অনেকে মাছের একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে *fish* শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে একই প্রজাতির এক বা একাধিক সদস্য বুঝাতে *fish* এবং একাধিক প্রজাতির মাছ বুঝাতে *fishes* ব্যবহার করা হয়।

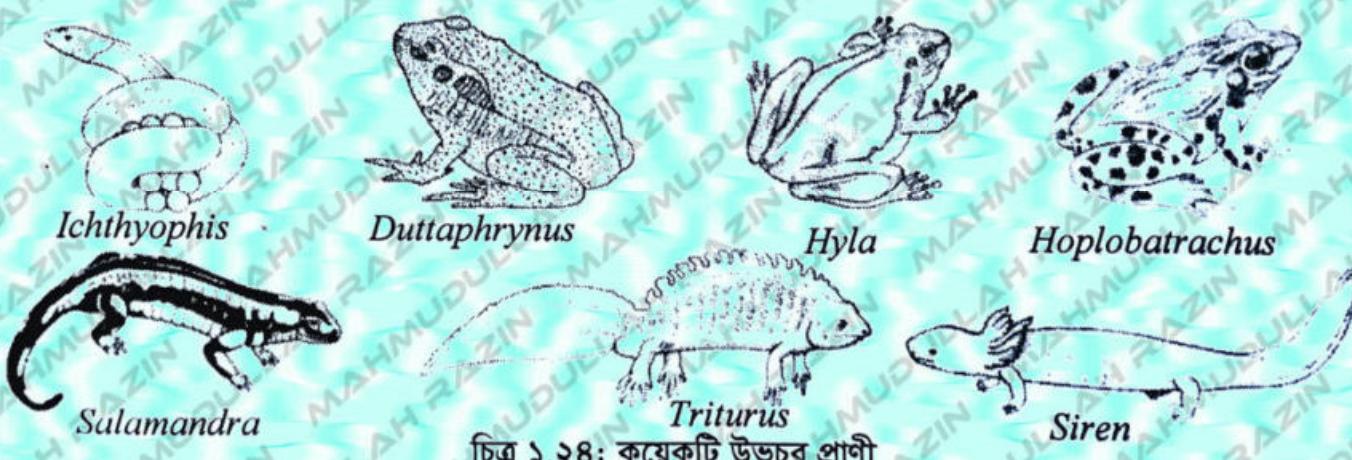
Class 4. AMPHIBIA (অ্যাফিবিয়া) (Gr. *amphi* = double + *bios* = life)

Amphibia শ্রেণির প্রাণীরা প্রথম স্থলচর চতুর্স্পন্দী মেরুদণ্ডী প্রাণী। এ শ্রেণির প্রাণীরা পুরোপুরি স্থলজ জীবনে অভিযোজিত হতে পারেনি বরং এরা জলজ এবং স্থলজ জীবনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে মাত্র। গ্রীক শব্দ *amphi* = দ্বৈত এবং *bios* = জীবন, হতে Amphibia শব্দটির উৎপত্তি যা এদের জলজ ও স্থলজ উভয় জীবনের নির্দেশ করে। এরা ডিভেনিয়ান যুগে উৎপত্তি লাভ করে কার্বনিফেরাস যুগে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু এদের অধিকাংশই এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপি Amphibia শ্রেণির জীবিত প্রজাতির সংখ্যা 7,171 (IUCN, 2014)। এদের মধ্যে 188 প্রজাতির পদবিহীন সিসিলিয়ান, 614 প্রজাতির পা ও লেজযুক্ত স্যালাম্যান্ডার এবং 6090 প্রজাতির ব্যাঙ। বাংলাদেশে 2টি বর্গ ও 8টি গোত্রের অধিনে মোট 49 প্রজাতির (47 টি ব্যাঙ ও 2টি সিসিলিয়ান) উভচর প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য

- ১। জলীয় অবস্থায় জলচর, কিন্তু পরিণত প্রাণী জলচর অথবা স্থলচর।
- ২। দেহ মস্তক, গ্রীবা, দেহকাণ ও লেজে বিভক্ত, তবে অনেকক্ষেত্রে গ্রীবা ও লেজ থাকে না।
- ৩। সাধারণত দুই জোড়া পদ বিদ্যমান; প্রতি পদে 4-5টি নখরবিহীন আঙুল থাকে; কিছু প্রাণীতে পদ থাকে না।
- ৪। দেহত্তক নরম, অর্দ্ধ ও ঘনিষ্ঠিযুক্ত; তুকে রঙিন পিগমেন্টযুক্ত কোষ বিদ্যমান।
- ৫। এক্স্ট্রোথার্মিক (ectothermic) প্রাণী অর্থাৎ দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তনশীল।
- ৬। হৃৎপিণ্ড তিনি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, এতে সাইনাস ভেনোসাস বিদ্যমান; রেনাল ও হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র উন্নত।
- ৭। একলিঙ্গ প্রাণী, পুরুষে সঙ্গম অঙ্গ অনুপস্থিত, জীবনচক্রে ট্যাডপোল (tadpole) লার্ভা দশা বিদ্যমান।

উদাহরণ: *Ichthyophis glutinosus* (সিলন সিসিলিয়ান), *Duttaphrynus melanostictus* (কুনোব্যাঙ), *Hyla chinensis* (গেছো ব্যাঙ), *Hoplobatrachus tigerinus* (সোনাব্যাঙ), *Salamandra salamandra* (সালাম্যান্ডার), *Triturus cristatus* (ক্রেস্টেট নিউট), *Siren lacertian* (সাইরেন) ইত্যাদি।



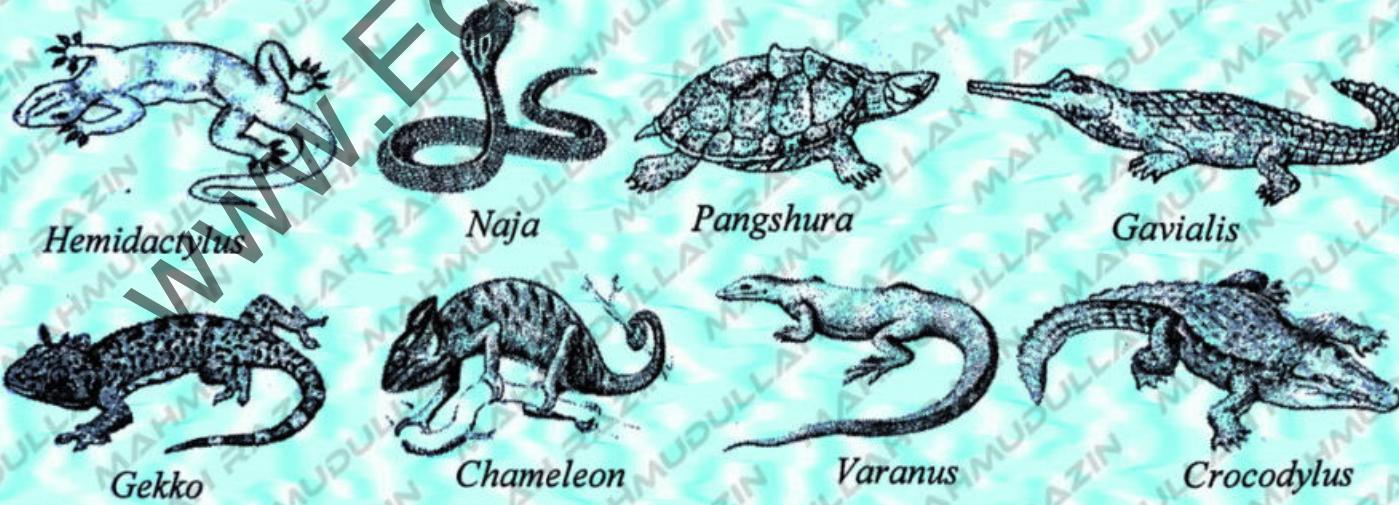
Class 5. REPTILIA (রেপটাইলিয়া) (Lt. *reptilis* = creeping)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে Reptilia শ্রেণির প্রাণীরাই প্রথম পূর্ণ বিকশিত স্থলচর চতুষ্পদী (tetrapod) প্রাণী। আধুনিক কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, টিকটিকি, গুইসাপ, টুয়াটোরা এবং এদের বিলুপ্ত বংশধর এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রায় 165 মিলিয়ন বছর পূর্বের মেসোজোয়িক যুগকে (Mesozoic era) 'সরীসৃপদের যুগ (Age of Reptiles)' বলা হয় কেননা সে সময় ডাইনোসর (Dinosaurs) সহ এ শ্রেণির প্রাণীদের জলে ও স্থলে ব্যাপক অভিযোজনিক বিচ্ছুরণ দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপি সরীসৃপদের শনাক্তকৃত জীবিত প্রজাতির সংখ্যা 10,038 (IUCN, 2014) যারা নাতীশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের বৈচিত্র্যময় বাসস্থান মরুভূমি, বন-জঙ্গল, মিঠা পানির জলাশয়, মোহনা ও সমুদ্রে বিস্তৃত আছে। বাংলাদেশে 3টি বর্গ ও 25টি গোত্রের অধিনে মোট 167 প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। এক্টোথার্মিক (ectothermic) স্থলচর প্রাণী, বুকে ভর দিয়ে চলে।
- ২। তৃক শুষ্ক ও গ্রহিত্বিহীন; তৃকের এপিডার্মিস থেকে কেরাটিনাস আইশ, ক্ষিউট, বর্ম, প্রেট ইত্যাদি বহিঃকক্ষাল গঠিত হয়।
- ৩। অধিকাংশের প্রতি পদে নখরযুক্ত আঙ্গুলসহ দুই জোড়া পদ থাকে যেগুলো দৌড়ানো, গাছে চড়া বা সাঁতারের জন্য অভিযোজিত।
- ৪। সাপ ও কিছু লিজার্ডের পদ থাকে না বা লুণ্ঠায় (vestigial)।
- ৫। মাথার করোটি একটি অক্সিপিটাল কন্ডাইল (occipital condyle) দ্বারা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে।
- ৬। হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট; তবে কুমিরদের হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
- ৭। একলিঙ্গ, পুরুষের পেশীময় সঙ্গম অঙ্গ (muscular copulatory organs) বিদ্যমান।
- ৮। নিষেক অভ্যন্তরীণ, স্ত্রী প্রাণী সর্বদা স্থলে ডিম পাড়ে; ডিম ক্যালসিয়ামযুক্ত শক্ত বা চামড়ার ন্যায় খোলসে আবৃত।
- ৯। জনীয় পরিস্ফুটনের সময় চারটি বহিজ্ঞানীয় পর্দা (extra-embryonic membranes) অ্যামনিয়ন, কোরিয়ন, কুসুম থলি ও অ্যালানটয়িস দেখা যায়।
- ১০। জীবনচক্রে কোন লার্ভা দশা নেই এবং অপ্রত্য লালন দেখা যায় না।

উদাহরণ: *Hemidactylus frenatus* (টিকটিকি), *Naja naja* (গোখড়া সাপ), *Pangshura tecta* (কচ্ছপ), *Gavialis gangeticus* (ঘড়িয়াল), *Gekko gecko* (তক্কক), *Chameleon vulgaris* (উড়স্ত টিকটিকি), *Varanus monitor* (গুই সাপ), *Crocodylus palustris* (স্বাদুপানির কুমির) ইত্যাদি।



চিত্র ১.২৫: কয়েকটি সরীসৃপ প্রাণী

Class 6. AVES (অ্যাভিস) (L. pl. *avis* = bird)

মেরুদণ্ডীদের মধ্যে Aves শ্রেণিভুক্ত পাখি অতি সুপরিচিত, সুরেলা, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক প্রাণী। বিশ্বব্যাপি প্রায় 10,500 প্রজাতির পাখি আছে (IUCN, 2014)। মেরুদণ্ডীদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে মাছের পরই পাখির অবস্থান। দেহে পালকের (feathers) উপস্থিতি পাখিদের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা এরা অন্যান্য মেরুদণ্ডী থেকে আলাদা। এদের অধিকাংশের দেহ উড়য়নের জন্য অভিযোজিত এবং একারণে এরা গাঠনিক ও কার্যকরি অনুপমতাসহ উড়য়ন যন্ত্র (flying machine) হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। পালক ব্যতিত পাখিদের সকল দৈহিক বৈশিষ্ট্যই মেসোজোয়িক যুগের সরীসৃপ আর্কোসরদের

(Archosauria) সাদৃশ্য দেখায়। এজন্য অনেকে পাখিদের ‘মহিমাধূত সরীসূ�’ বা glorified reptiles বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে 21টি বর্গের অধিনে মোট 706 প্রজাতির পাখি শনাক্ত করা হয়েছে (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। এন্ডোথার্মিক (endothermic) বা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী; মাত্র আকৃতির দেহে ‘S’ আকৃতির লম্বা গ্রীবা বিদ্যমান।
- ২। দেহ এপিডার্মিল পালক (epidermal feathers) দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৩। পদ দুই জোড়া, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত যা প্রধান উভয়ন অঙ্গ; পশ্চাংপদ হাঁটা, ডালে বসা বা সাঁতারের জন্য অভিযোজিত।
- ৪। উভয় চোয়াল কেরাটিনাইজড আবরণে আবৃত চতুর্ভুক্ত রূপান্তরিত; কোন দাঁত থাকে না।
- ৫। অস্থি নির্মিত কঙালে বায়ু গহ্বর থাকে; করোটি একটি অক্সিপিটাল কন্ডাইলের সাথে যুক্ত থাকে; স্টার্নাম নৌকার মতো কীল (keel) গঠন করে।
- ৬। পরিপাকতন্ত্রে থলিকাকার ত্রপ (crop) এবং পেশিময় গিজার্ড (gizzard) বিদ্যমান।
- ৭। ফুসফুসে বায়ুথলি (air sacs) বিদ্যমান; শ্বসনযন্ত্রে শব্দ সৃষ্টিকারী অঙ্গ বায়ু গহ্বরযুক্ত কঙাল বায়ুথলি সিরিঙ্কস (syrinx) থাকে।
- ৮। হৎপিণ সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সাইনাস ভেনোসাস অনুপস্থিত।
- ৯। একলিঙ্গ, স্ত্রীদের কেবল কার্যকরি বাম ডিম্বাশয় থাকে, লিম্ফেক অভ্যন্তরীণ; অ্যামনিওটিক ডিম বৃহৎ, কুসুম ও শক্ত খোলক যুক্ত।
- ১০। সদ্যোপ্রসূত বাচ্চা সক্রিয় ও সবল (precocial) অথবা নয় ও দুর্বল (altricial) প্রকৃতির।

উদাহরণ: *Copsychus saularis* (দোয়েল), *Galus galus* (বন মুরগি), *Struthio camelus* (উটপাখি) *Columba livia* (করুতর), *Pavo cristatus* (ময়ুর), *Ploceus philippinus* (বাবুই পাখি), *Alcedo atthis* (মাছরাঙা), *Pelecanus philippensis* (পেলিকেন) ইত্যাদি।



চিত্র ১.২৬: কয়েকটি পাখি

Class 7. MAMMALIA (ম্যামালিয়া) (Lt. *mammae* - breast)

বিবর্তনিক দিক থেকে Mammalia বা স্তন্যপায়ীরা সবচেয়ে আধুনিক প্রাণী। বিশ্বব্যাপী এদের শনাক্তকৃত জীবিত প্রজাতির সংখ্যা 5,513 (IUCN, 2014)। আকার, আকৃতি, গঠন ও কাজের দিক থেকে এদের ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এদের আকৃতি সর্বস্কন্দ কিটি হকনোজড় থাই বাদুর (1.5 g) থেকে সর্ববৃহৎ নীল তিমি (130 metric tons.) পর্যন্ত হতে পারে। এদের কিছু সদস্য বৃক্ষিমান, বৃহৎ মন্তিক্ষ বিশিষ্ট, আত্ম সচেতন এবং যত্ন ব্যবহারে সক্ষম। স্তন্যপায়ীরা অতি উন্নত স্নায়ুতন্ত্র এবং বহুবিদ অভিযোজন দ্বারা পৃথিবীর সকল বাসযোগ্য স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে 10টি বর্গ ও 35টি গোত্রের অধিনে মোট 138 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। এভোথার্মিক বা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী; দেহ এপিডার্মাল লোম দ্বারা আবৃত থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে লোম ক্ষয়িত।
- ২। তৃকে ঘর্মস্থি, তেলস্থি ও স্তনস্থি বিদ্যমান; পরিণত ঝী প্রাণীতে স্তনস্থি কার্যকরি থাকে।
- ৩। নিম্নচোয়াল মাত্র একটি ডেন্টারি হাড় (dentary bone) দ্বারা গঠিত; দুটি অঙ্গিপিটাল কভাইল দ্বারা করেটি মেরাংদেওর সাথে যুক্ত থাকে।
- ৪। নড়নক্ষম চোখের পাতা এবং পেশিময় বহিষ্কর্ণ বা পিনা বিদ্যমান; চোয়ালের সম্মুখে মাংসল ঠোঁট থাকে।
- ৫। দেহগহর মাংসল ডায়াফ্রাম (diaphragm) দ্বারা বক্ষ ও উদর গহরে বিভক্ত।
- ৬। রক্ত সংবহনত্ব উন্নত, দ্বি-ধারা প্রবাহ বিশিষ্ট, হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, উট ব্যক্তীত সকলের লোহিত রক্ত কণিকা নিউক্লিয়াস বিহীন।
- ৭। মন্তিক্ষের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার খুব বড় ও সুগঠিত; করেটিক স্নায় 12 জোড়া।
- ৮। নিষেক অভ্যন্তরীণ; প্রায় সকলেই জরায়ুজ অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব করে (viviparous); শাবকরা মাতৃদুর্ভ পান করে; অপত্য লালন দীর্ঘ।



তৃকীয় লোম



স্তনস্থি



ডেন্টারি হাড়



পেশিময় পিনা

উদাহরণ: *Delphinus capensis* (ডলফিন), *Pteropus giganteus* (বাদুড়), *Panthera tigris* (বাঘ), *Macropus giganteus* (ক্যাঙারু), *Ornithorhynchus anatinus* (হংস চুম্বু প্লাটিপাস), *Funambulus palmarium* (কাঠবিড়াণী), *Camelus dromedaries* (উট), *Macaca mulatta* (রেসাম বানর). ইত্যাদি।

*Delphinus**Pteropus**Panthera**Macropus**Ornithorhynchus**Funambulus**Camelus**Macaca*

চিত্র ১.২৭: কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী

□ স্তন্যপায়ীর শ্রেণিবিন্যাস

প্রজনন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে স্তন্যপায়ী প্রাণিদের নিম্নলিখিত তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়:

Sub class 1. Prototheria (Gr. *proto*= প্রথম + *ther* = স্তন্যপায়ী): এরা আদি প্রকৃতির ডিমপাঢ়া স্তন্যপায়ী এবং এদের মনোট্রিম (monotreme) বলা হয়। **উদাহরণ:** অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণ্ড হংস চুম্বু প্লাটিপাস (Duck-billed Platypus).

Sub class 2. Metatheria (Gr. *meta*= মধ্যম + *ther* = স্তন্যপায়ী): এরা অতি অপরিণত বাচ্চা প্রসব করা স্তন্যপায়ী এবং এদের মাসুপিয়াল (marsupials) বলা হয়। **উদাহরণ:** অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণ্ড ক্যাঙারু, অপোসোম।

Sub class 3. Eutheria (Gr. *eū*= প্রকৃত + *ther* = স্তন্যপায়ী): এরা বাচ্চা প্রসব করা প্রকৃত ধরণের স্তন্যপায়ী। **উদাহরণ:** মানুষ, বাঘ, তিমি, হাতি ইত্যাদি।

প্রাণিজগতে প্রধান পর্বসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

পর্বের নাম	অনন্য বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Porifera	১। দেহতলে অস্টিয়া নামক অসংখ্য ছিদ্র বিদ্যমান। ২। দেহাভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের নালিতন্ত্র বিদ্যমান। ৩। দেহ প্রাচীরে কোয়ানোসাইট বা কলার কোষ থাকে। ৪। দেহে স্পিকিউল ও স্পঞ্জিন তন্ত্র নিয়ে গঠিত কঙ্কাল বিদ্যমান।	<i>Scypha gelatinosum</i> <i>Spongilla fragilis</i>
Cnidaria	১। দ্বিতীয় প্রাণী, দেহ দুটি কোষীয় ত্ত্ব নিয়ে গঠিত। ২। দেহের এক্টোডার্মে নিডোভ্লাস্ট নামক কোষ বিদ্যমান। ৩। দেহাভ্যন্তরে সিলেন্টেরন নামক একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর বিদ্যমান। ৪। এদের অনেকে প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠন করে।	<i>Hydra vulgaris</i> <i>Aurelia aurita</i>
Platyhelminthes	১। দেহ পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় চ্যাটো, চোষক যুক্ত। ২। দেহ নরম কিউটিকুলার এপিডার্মিস দ্বারা আবৃত। ৩। সিলোমবিহীন প্রাণী, দেহগহ্বর প্যারেনকাইমা ও পেশি দ্বারা পূর্ণ। ৪। রেচন অঙ্গে শিখাকোষ বিদ্যমান।	<i>Fasciola hepatica</i> <i>Taenia solium</i>
Nematoda	১। দেহ কীট আকৃতির নলাকার এবং উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু। ২। দেহ নমণীয় অকোষী কিউটিকুল দ্বারা আবৃত। ৩। অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী, দেহগহ্বর জননাঙ্গ দ্বারা পূর্ণ। ৪। একলিঙ্গ প্রাণী, অধিকাংশের যৌন ত্বকাপত্তা দেখা যায়।	<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Wuchereria bancrofti</i>
Mollusca	১। দেহ নরম, অথঙ্গায়িত এবং ম্যান্টেল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ২। দেহের অঙ্কীয় দিকে পেশিযুক্ত পদ বিদ্যমান। ৩। পৌষ্টিকনালি সোজা বা প্যাচানো অথবা U আকৃতির, অধিকাংশের মুখবিবরে রেডুলা বিদ্যমান। ৪। রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই থাকে।	<i>Pila globosa</i> <i>Octopus vulgaris</i>
Annelida	১। দেহ আংটির ন্যায় একাধিক সমরূপ খঙ্গক নিয়ে গঠিত। ২। প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী, দেহ গহ্বর সিলোম তরল দ্বারা পূর্ণ। ৩। চলনঅঙ্গ সিটা অথবা প্যারাপোডিয়া অথবা অনুপস্থিত। ৪। দেহের প্রতি খঙ্গকে রেচন অঙ্গ নেক্রিডিয়া বিদ্যমান থাকে।	<i>Metaphire posthuma</i> <i>Hirudinaria granulosa</i>
Arthropoda	১। দেহ খঙ্গায়িত এবং সুনির্দিষ্ট অঞ্চলায়ন বিশিষ্ট। ২। প্রতি দেহখঙ্গকে একজোড়া সন্ধিযুক্ত পা বিদ্যমান। ৩। দেহ কাইটিন নির্মিত শক্ত বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত থাকে। ৪। দেহ গহ্বর রক্ত দ্বারা পূর্ণ থেকে হিমোসিল গঠন করে।	<i>Musca domestica</i> <i>Apis indica</i>
Echinodermata	১। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় বা পদ্ধতিরীয় প্রতিসম। ২। দেহ স্পাইন ও পেডিসিলারিয়ুক্ত অমসৃণ বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত। ৩। দেহাভ্যন্তরে বিশেষ অঙ্গ পানি সংবহন তন্ত্র বিদ্যমান। ৪। সকলেই সামুদ্রিক।	<i>Antedon bifida</i> <i>Astropecten irregularis</i>
Chordata	১। জীবনের যেকোন দশায় একটি স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড বিদ্যমান। ২। একটি পৃষ্ঠীয় ফাঁপা ও নলাকার ফ্লামুরজ্জু পরিপাক নালির পৃষ্ঠদিকে প্রসারিত থাকে। ৩। জীবন চক্রের যে কোন দশায় গলবিলীয় ফুলকা থলি বা রক্ত বিদ্যমান থাকে। ৪। জীবন চক্রের যে কোন দশায় একটি পায়ু পশ্চাত লেজ বিদ্যমান।	<i>Labeo rohita</i> <i>Columba livia</i> <i>Homo sapiens</i>

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

শ্রেণি	অনন্য বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Myxini	১। দেহ পিচ্ছল, দুর্বল প্রকৃতির; মুখে চারজোড়া কর্ণিকা থাকে। ২। নাসাথলি গলবিলে যুক্ত, ফুলকাছিদ্র ৫-15 জোড়া। ৩। মেরুদণ্ডে নটোকর্ড এবং তন্ত্রময় নিউরাল টিউব বিদ্যমান।	<i>Myxine glutinosa</i> <i>Eptatretus stoutii</i>
Cephalaspidomorphi	১। দেহ আইশবিহীন, সরু-বেলনাকার ও বাইন মাছ সদৃশ্য। ২। নাসাথলি গলবিলে উন্মুক্ত হয় না, ফুলকা ছিদ্র ৭ জোড়া। ৩। পরিণত প্রাণীতে মুখ চুঙ্গি থাকে; জীবনচক্রে অ্যামোসিট লার্ভ দশা বিদ্যমান।	<i>Petromyzon marinus</i> <i>Geotria australis.</i>
Chondrichthyes	১। দেহ বৃহৎ এবং হেটোরোসার্কাল প্রকৃতির পুচ্ছ পাখনাযুক্ত। ২। অঙ্গকক্ষাল সম্পূর্ণভাবে কোমলাছি নির্মিত। ৩। তৃক প্ল্যাকয়েড আইশ দ্বারা আবৃত অথবা নগ্ন। ৪। ৫-৭ জোড়া ফুলকা ছিদ্র উন্মুক্ত, কানকো থাকে না।	<i>Scoliodon laticaudus</i> <i>Sphyraena zygaena</i>
Actinopterygii	১। দেহ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ; পাখনা তৃকীয় রশ্মি দ্বারা সম্পৃষ্ঠি। ২। অঙ্গকক্ষাল অস্থি নির্মিত। ৩। তৃক নগ্ন অথবা সাইক্রয়েড বা টিনয়েড বা গ্যনয়েড আইশ দ্বারা আবৃত থাকে। ৪। চারজোড়া ফুলকা কানকো দ্বারা আবৃত থাকে।	<i>Catla catla</i> <i>Tenualosa ilisha</i>
Sarcopterygii	১। দেহ বৃহৎ; যুগ্ম পাখনা মাঝস্থল ধর্তক বিশিষ্ট। ২। অঙ্গকক্ষাল অস্থি নির্মিত। ৩। তৃক কসময়েড আইশ দ্বারা আবৃত থাকে। ৪। পুচ্ছ পাখনা ডিফাইসার্কাল ধরনের।	<i>Latimeria chalumnae</i> <i>Protopterus aethiopicus</i>
Amphibia	১। জলীয় অবস্থায় জলচর, পূর্ণাঙ্গ প্রাণী জলচর অথবা স্থলচর। ২। দেহত্তক নরম, আর্দ্র ও গ্রস্তযুক্ত। ৩। এক্ষেত্রাধিক, দেহ তাপমাত্রা পরিবেশের সাথে পরিবর্তনশীল। ৪। রেনাল ও হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র উন্নত।	<i>Duttaphrynus melanostictus</i> <i>Siren lacertian</i>
Reptilia	১। এক্ষেত্রাধিক স্থলচর প্রাণী, বুকে ভর দিয়ে চলে। ২। তৃক তন্ত্র ও গ্রস্তবিহীন; তৃকে এপিডার্মাল আইশ থাকে। ৩। অধিকাংশের হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। ৪। জলীয় পরিস্কৃতনে চারটি বহিজ্ঞানীয় পর্দা থাকে।	<i>Naja naja</i> <i>Gekko gecko</i>
Aves	১। এক্ষেত্রাধিক বা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট, মাঝু আকৃতির প্রাণী। ২। দেহ এপিডার্মাল পালক দ্বারা আবৃত থাকে। ৩। অঘপদ ডানায় রূপান্তরিত যা প্রধান উজ্জয়ন অঙ্গ। ৪। চোয়াল কেরাটিনাইজড আবরণে আবৃত হয়ে চক্ষু গঠন করে।	<i>Copsychus saularis</i> <i>Galus galus</i>
Mammalia	১। এক্ষেত্রাধিক প্রাণী; দেহ এপিডার্মাল লোম দ্বারা আবৃত থাকে। ২। স্তনঘষি বিদ্যমান যা পরিণত ঝী প্রাণীতে কার্যকরি থাকে। ৩। নিম্নচোয়াল মাত্র একটি ডেন্টারি হাড় দ্বারা গঠিত। ৪। দেহগহ্বর মাঝস্থল ডায়াফ্রাম দ্বারা বক্ষ ও উদর গহ্বরে বিভক্ত।	<i>Panthera tigris</i> <i>Macaca mulatta</i>

□ আর্থ্রোপোডরা কেন প্রকৃতিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যতা অর্জন করেছে?

Arthropod-রা প্রজাতিৰ সংখ্যায় বিস্তৃত বিস্তাবে বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাসেৰ ভিন্নতায় এবং পৰিবৰ্তিত পৰিবেশেৰ অভিযোজনিক ক্ষমতায় ব্যাপক বৈচিত্র্য অর্জন কৰেছে Hickman *et al* 2001 আর্থ্রোপোডদেৱ ব্যাপক বৈচিত্র্য অর্জনে কিছু গাঠনিক ও শারীৱবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যেৰ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেমন-

১। এদেৱ প্ৰায় সকলেৰ দেহে কিউটিকল নিৰ্মিত নমগীয় কিন্তু শক্ত ও হালকা ধৰনেৰ বহিঃকক্ষাল থাকে যা এদেৱকে যে কোন পৰিবৰ্তিত পৰিবেশে সুৱক্ষা প্ৰদান কৰে

২। এ পৰ্বেৱ প্ৰাণিদেৱ দেহে বাহ্যিক খণ্ডযন ও সক্ৰিয়ত পা বিদ্যমান যা অধিক দক্ষতাৰ সাথে এদেৱ খাদ্যগ্ৰহণ চলনে সহায়তা কৰে

৩। এদেৱ বিশেষ ধৰনেৰ শ্বসনতন্ত্ৰেৰ মাধ্যমে বায়ু সৱাসৱি কোৰে পৌছায় যা এদেৱ সক্ৰিয় জীবনে উচ্চ বিপাকীয় কাৰ্যাবলিৰ সহায়ক।

৪। এদেৱ দেহে অতি উন্নত সংবেদী অঙ্গ বিদ্যমান যেগুলোৱ সাহায্যে এৱা পৰিবেশীয় উদ্বোগনায় তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰতে পাৱে।

৫। এদেৱ জটিল আচৰণ ও বুদ্ধিমত্তা অন্যান্য অমেৱন্দণী অপেক্ষা উন্নত হওয়ায় পৰিবেশে এদেৱ টিকে থাকাকে সহজ কৰে

। এদেৱ অনেকেৱ জীবনচক্ৰে ৱৰ্ণনাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া খাদ্যগ্ৰহণ ব্যৱহাৰকে প্ৰভাৱিত কৰে এদেৱ আন্তঃপ্ৰজাতিক প্ৰতিযোগিতাকে হাস কৰে

□ অ্যানঅ্যামনিয়ট (নিম্নশ্ৰেণিৰ মেৱন্দণী) ও অ্যামনিয়ট (উচ্চশ্ৰেণিৰ মেৱন্দণী) গ্ৰুপ

জনে অ্যামনিয়ন (amnion) নামক বহিঃজলীয় পদাৰ্থ (extraembryonic membrane) উপস্থিতি-অনুপস্থিতিৰ উপৰ ভিত্তি কৰে মেৱন্দণী প্ৰাণিদেৱ দুটি গ্ৰুপে ভাগ কৰা হয়, যথা- অ্যানঅ্যামনিয়টস (anamniotes) ও অ্যামনিয়টস (amniotes)

জনে অ্যামনিয়ন পদাৰ্থবিহীন, পানিতে ডিম দেয়া ও বহিঃনিষেক ঘটালো মাছ ও উভচৰদেৱ অ্যানঅ্যামনিয়টস দলভুক্ত কৰা হয় এবং এদেৱ নিম্নশ্ৰেণিৰ মেৱন্দণী প্ৰাণী বলা হয়। এসব প্ৰাণী জৰীয় বিকাশেৰ সময় প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন পালি থেকে গ্ৰহণ কৰে এবং জনে সৃষ্টি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানিতে ত্যাগ কৰে বলে এদেৱ অ্যামনিয়ন পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন পড়ে না। জনে অ্যামনিয়ন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় না বলে এ দলভুক্ত প্ৰাণিদেৱ পানিতে ডিম পাঢ়তে হয়।

অপৰদিকে জনে অ্যামনিয়ন পদাৰ্থবৃক্ষ, স্থলে ডিম পাঢ়া ও অন্তঃনিষেক ঘটালো সৱীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদেৱ অ্যামনিয়টস দলভুক্ত কৰা হয় এবং উচ্চশ্ৰেণিৰ মেৱন্দণী প্ৰাণী বলা হয়। এসব প্ৰাণীতে জৰীয় বিকাশেৰ সময় অ্যামনিয়ন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় যাব মাধ্যমে শুসন গ্যাস বিনিয়য় ও পৱিবহনে সম্পন্ন হয়। জনে অ্যামনিয়ন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় বলে এ দলভুক্ত প্ৰাণিদেৱ পানিতে ডিম পাঢ়তে হয় না এবং স্থলজ জীবনে অভিযোজিত

□ কোন কোন বৈশিষ্ট্য দ্বাৰা সৱীসৃপৱা উভচৰ থেকে অধিক উন্নত প্ৰাণী?

উভচৰ ও সৱীসৃপ উভয়েই শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্ৰাণী, অৰ্থাৎ এদেৱ দেহ তাপমাত্ৰা পৰিবেশেৰ তাপমাত্ৰার সাথে পৰিবৰ্তনশীল তবুও কিছু বৈশিষ্ট্য সৱীসৃপদেৱকে উভচৰ অপেক্ষা উন্নত হিসেবে এবং স্থলজ শুক পৰিবেশে প্ৰতিষ্ঠিত কৰেছে যেমন

১। সৱীসৃপদেৱ ফুসফুস উভচৰদেৱ চেয়ে অনেক উন্নত।

২। সৱীসৃপদেৱ অমসৃণ, শুক ও আইশবৃক্ষ তৃক এদেৱ দেহকে পালি শূন্যতা এবং বাহ্যিক আঘাত হতে রক্ষা কৰে

৩। সৱীসৃপদেৱ অ্যামনিয়ন পদাৰ্থসহ বৃহদাকৃতিৰ ডিম এদেৱ অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চাৰ বিকাশকে শুকতাৰ হাত হতে রক্ষা কৰে।

৪। সৱীসৃপদেৱ চোয়ালদৰ্য অতি দক্ষতাসম্পন্ন যাতে এৱা খুব সহজেই শিকাব ধৰতে ও পিষ্ট কৰতে পাৱে

৫। সৱীসৃপদেৱ রক্ত সংবহনতন্ত্ৰ উভচৰদেৱ চেয়ে অনেক উন্নত ও অধিক দক্ষতা সম্পন্ন

৬। সরীসৃপদের দেহে পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা উভচরদের চেয়ে উন্নত প্রকৃতির।

৭। সরীসৃপদের স্নায়ুতন্ত্র উভচরদের স্নায়ুতন্ত্র অপেক্ষা জটিল ধরনের।

□ পাখিদের মহিমান্বিত সরীসৃপ বলা হয় কেন?

মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মধ্যে পাখি একটি বিশেষ দল যারা মেসোজোয়িক যুগে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। Thomas Huxley নামক একজন পাখিবিদ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ‘পাখিরা মহিমান্বিত সরীসৃপ’ (birds are glorified reptiles) বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পাখিরা সরীসৃপ জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে বিকশিত হয়েছে Archaeopteryx নামক একটি যোগসূত্রকারী জীবাশ্ম প্রাণীর সাথে পাখিদের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান, জগতাত্ত্বিক ও পুরাজীবঘটিত অধ্যয়নের মাধ্যমে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাখির যেসব বৈশিষ্ট্য এদের সরীসৃপ থেকে পরিমাণিত হওয়ার অর্থাৎ বিকশিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে সেগুলো হলো:

১। পাখিরা উচ্চ বিপাকীয় হার সমৃদ্ধ উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী, অন্যদিকে সরীসৃপরা নিম্ন বিপাকীয় হার সমৃদ্ধ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

২। উড়য়ন ক্ষমতা লাভের কারণে প্রাণিজগতের মধ্যে পাখিরা সবচেয়ে দক্ষতার সাথে দ্রুত চলতে পারে।

৩। পাখিদের দেহের পালক নিঃসন্দেহে একটি উন্নত অনুপম বৈশিষ্ট্য সেগুলো সরীসৃপের আইশের উত্তরসূরী।

৪। উন্নত স্তন্যপায়ীদের মতো পাখিদের রক্ত সংবহনতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হৃৎপিণ্ড এবং একটি সিস্টেমিক আর্চ বিদ্যমান। অন্যদিকে সরীসৃপদের রক্ত সংবহনতত্ত্বে অসম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হৃৎপিণ্ড এবং দুটি সিস্টেমিক আর্চ বিদ্যমান।

৫। রেনাল পোর্টাল সিস্টেম সরীসৃপে উন্নত, পাখিতে স্ক্রয়প্রাপ্ত এবং স্তন্যপায়ীতে অনুপস্থিত।

□ স্তন্যপায়ীরা কিভাবে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে উন্নত/আলাদা?

স্তন্যপায়ীদের কিছু অনুপম বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো এদেরকে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আলাদা করে এবং উন্নত প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। লোমাবৃত দেহ: অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর দেহ লোম বা ফার দ্বারা আবৃত থাকে যা এদের উষ্ণ রক্তে উচ্চ বিপাকীয় হারের নিয়ন্ত্রণে নিঃশ্চয়তা দেয়।

২। কার্যকরি স্তনঘাসি: স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের কার্যকরি স্তনঘাসি থাকে যা এদের বাচাদের পুষ্টিকর দুধের নিশ্চয়তা দেয়। অন্য কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এ বৈশিষ্ট্য থাকে না।

৩। এক অস্তি বিশিষ্ট নিম্ন চোয়াল: স্তন্যপায়ী প্রাণিদের নিম্নচোয়াল মাত্র একটি ডেন্টারি হাড় (dentary bone) দ্বারা গঠিত যা সরাসরি কর্ণোটির সাথে যুক্ত থাকে।

৪। দাঁতের এক প্রতিষ্ঠাপন: স্তন্যপায়ীদের ডিফারোডন্ট প্রকৃতির দাঁত থাকে অর্থাৎ বাচাদের মুখে বিদ্যমান দুধ দাঁত (milk teeth) পরিণত বয়সে ক্রমান্বয়ে স্থায়ী দাঁত (permanent teeth) দ্বারা মাত্র একবার প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

৫। কর্ণাস্তি: অন্তঃকর্ণে বিদ্যমান তিনটি ক্ষুদ্রাস্তি (মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) স্তন্যপায়ীদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। এসব কর্ণাস্তি দ্বারা শব্দ তরঙ্গ পরিবাহিত হয়।

৬। উষ্ণ রক্তীয় বিপাক: স্তন্যপায়ীদের দেহ উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট হওয়ায় এদের বিপাকের হার অন্যান্য মেরুদণ্ডী হতে অধিক।

৭। ডায়াফ্রাম: স্তন্যপায়ীদের দেহগহ্বরে মাংসল ডায়াফ্রাম পর্দার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে পাখি ও সরীসৃপদের চেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করে।

৮। চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড: প্রাণিজগতে কেবল পাখি ও স্তন্যপায়ীদের সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড রয়েছে যা এদের অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনরিক্ত রক্তের অমিশ্রণের নিশ্চয়তা দেয়। আর একারণেই এসব প্রাণীতে উচ্চ আঙ্গুর শারীরিক ও বিপাক ক্রিয়া দেখা যায়।

□ কোমলাহিযুক্ত মাছ ও অস্থিযুক্ত মাছের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কোমলাহিযুক্ত মাছ	অস্থিযুক্ত মাছ
১। বাসস্থান	সকলেই সামুদ্রিক।	সামুদ্রিক ও মিঠাপানি বাসী।
২। অঙ্গকঙ্কাল	কোমলাহি নির্মিত।	অস্থি নির্মিত।
৩। ফুলকাছিদি	ফুলকাছিদি উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।	ফুলকাছিদি অপারকুলাম দ্বারা ঢাকা থাকে।
৪। চোয়ালের সংযুক্তি	উর্ধ্ব চোয়াল মুক্তভাবে নড়াতে পারে।	উর্ধ্ব চোয়াল মুক্তভাবে নড়াতে পারে না।
৫। ডুকাবরণ	প্ল্যাকয়েড আইশ দ্বারা আবৃত থাকে।	সাইক্লয়েড বা টিনয়েড বা গ্যানয়েড বা কসময়েড আইশ দ্বারা আবৃত থাকে।
৬। পুচ্ছ পাখনা	অপ্রতিসাম্য হেটারোসার্কাল।	প্রতিসাম্য হোমোসার্কাল অথবা ডিফাইসার্কেল।
৭। শ্রোগি পাখনা	দেহ অক্ষের সাথে সমান্তরাল।	দেহ অক্ষের সাথে উলমিক।
৮। মুখছিদি	মন্তকের অঙ্গভাগে অবস্থিত, বৃহৎ ও অর্ধচন্দ্রাকার।	মন্তকের প্রান্তে অবস্থিত, আকার ও আকৃতি ভিন্ন ধরনের।
৯। বায়ু পটকা	অনুপস্থিত।	বিদ্যমান।
১০। ক্লোয়েকা ছিদ্র	বিদ্যমান।	অনুপস্থিত।
১১। রেজন বর্জ্য	ইউরিয়া।	অ্যামোনিয়া।
১২। উদাহরণ	থৃষ্টি হাঙ্গর (<i>Scoliodon laticaudus</i>), করাত মাছ (<i>Pristis pectinata</i>) ইত্যাদি	রংই- (<i>Labeo rohita</i>), ইলিশ (<i>Hilsa ilisha</i>) ইত্যাদি

সকল মেরুদণ্ডীই কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়

কর্ডটা পর্বের প্রাণীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) পৃষ্ঠীয় ফাঁপা ও নলাকার স্নায়ুরজ্জু, (২) পৃষ্ঠীয় দণ্ডকৃতির, স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড এবং (৩) গলবিলীয় ফুলকা রঞ্জের উপস্থিতি।

কর্ডটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে বিভক্ত করা হয়। যথা- (১) Urochordata, (২) Cephalochordata এবং (৩) Vertebrata. এদের মধ্যে Urochordata ও Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীদের Protochordata বা আদিম কর্ডটা বলা হয়। কারণ এদের দেহে সারাজীবন ধরে কর্ডটাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে এবং কখনোই এদের মেরুদণ্ড থাকে নয়। অন্যদিকে Vertebrata উপপর্বের প্রাণীদের কর্ডট মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল জলীয় দশায় থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থার এদের -

- ১। নটোকর্ড কোমলাহি বা অস্থি নির্মিত মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
- ২। পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জুর সম্মুখপ্রান্ত বিশেষায়িত হয়ে মস্তিক (brain) গঠন করে এবং বাকী অংশ সুষুম্বাকাণ্ডে (spinal cord) পরিণত হয়।
- ৩। মাছ এবং অ্যাক্ষিবিয়ান লার্ভাতে গলবিলীয় ফুলকারঞ্জ স্থায়ীভাবে থাকে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ স্থলচর প্রাণীতে এগুলো ইউস্টাসিয়ান নালি (eustachian tube), মধ্যকর্ণের গহ্বর (middle ear cavity), টনসিল (tonsil), প্যারাথাইরয়েড অগ্রিস (parathyroid gland) ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কর্ডটা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে সকলের মেরুদণ্ড থাকে না। কেবল Vertebrata উপপর্বের প্রাণীদের মেরুদণ্ড থাকে অর্থাৎ এরা মেরুদণ্ডী এবং কর্ডেট। অন্যদিকে Protochordata রা কর্ডেট কিন্তু মেরুদণ্ডী নয়। সুতরাং সকল মেরুদণ্ডীই কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়।

২.২ ঘাসফড়িং (Grashopper)

Arthropoda (Gr. *arthros*-joint+ *podos*-foot) পর্বের **Insecta** শ্রেণির **Orthoptera** বর্গের **Caelifera** উপবর্গের প্রাণিদের ঘাসফড়িং (grashopper) বলা হয়। পৃথিবীতে প্রায় 20,000 প্রজাতির ঘাসফড়িং রয়েছে। সকল ঘাসফড়িং এর দৈহিক গঠন প্রায় একই রকম। পতঙ্গদের সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় এবং সহজলভ্য হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ঘাসফড়িংকে নমুনা প্রাণী হিসেবে অধ্যয়ন করে থাকে। ঘাসফড়িং অধ্যয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যায়ের জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা পতঙ্গ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাবে।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom	:	Animalia
Phylum	:	Arthropoda
Class	:	Insecta
Subclass	:	Pterygota
Order	:	Orthoptera
Family	:	Acrididae
Genus	:	<i>Locusta</i>
Species:	:	<i>Locusta danica</i> Linnaeus, 1767

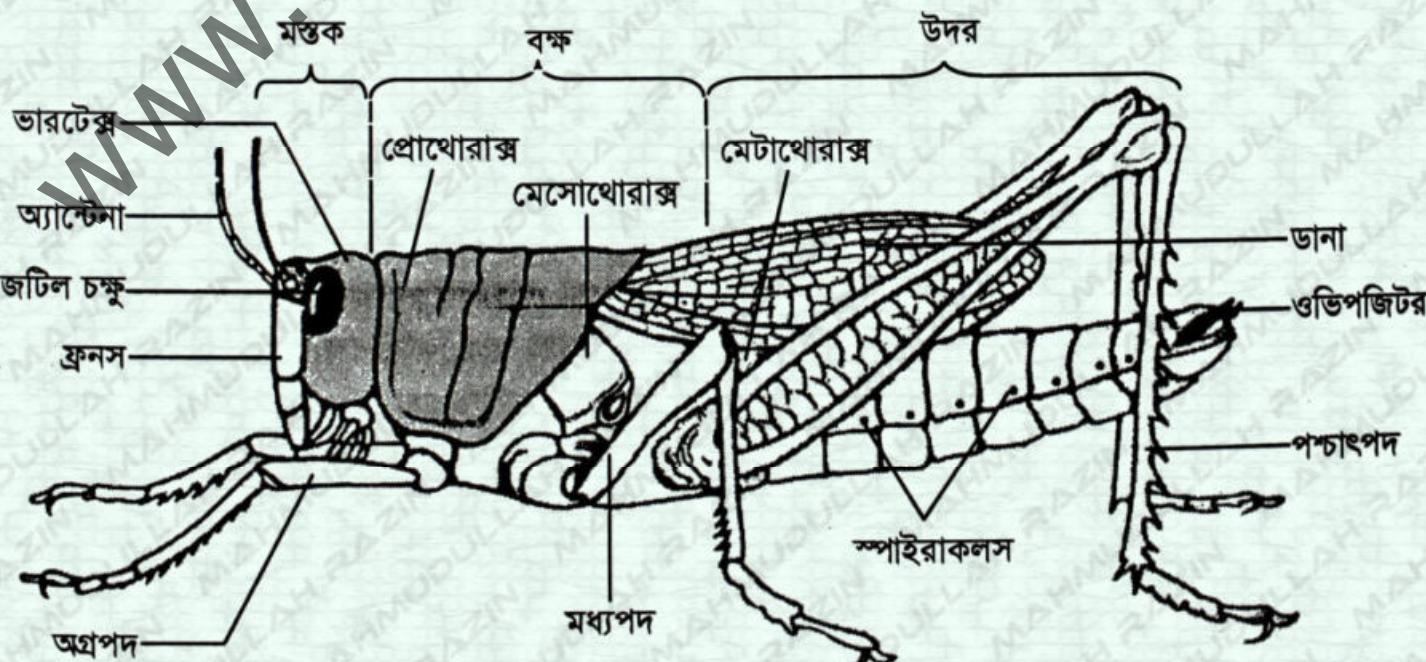
পৃথিবীর সর্বত্র ঘাসফড়িং পাওয়া যায়। সাধারণত মুক্ত তৃণভূমিতে এদের ব্যাপক দেখা যায়। এরা সাধারণত এককভাবে থাকে এবং পায়ের সাহায্যে লাফিয়ে চলে। তবে এরা উড়তে পারে। অনেক প্রজাতি আছে যারা দলবদ্ধ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন (migration) করে এবং এদেরকে পঙ্গপাল (locust) বলে। পঙ্গপাল অনেকদূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে এবং এরা ফসল ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাণী কয়েকটি ঘাসফড়িং প্রজাতি হলো: *Locusta danica*, *Locusta migratoria*, *Choroedocus robustus*, *Oedaleus abruptus*, *Orthacris elegans*.

প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় ঘাসফড়িং (grasshoppers), পঙ্গপাল (locusts) ও ঝিঝি পোকা (crickets) নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে অর্থোপটেরোলজি (Orthopterology) বলে।

ঘাসফড়িংয়ের বাহ্যিক গঠন (External features of grasshopper)

১। আকার ও আকৃতি (Shape and size): ঘাসফড়িংয়ের দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার, খঙ্গায়িত এবং দ্বিপাশীয় প্রতিসম। এরা তুলনামূলক বৃহদাকৃতির পতঙ্গ এবং লম্বায় ৮-৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২। বর্ণ (Colouration): এদের দেহের বর্ণ হরিদ্রাভাব সবুজ বা বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেহে বিভিন্ন বর্ণের গাঢ় দাগ থাকে। এদের অনেক প্রজাতির দেহের বর্ণ বাসস্থানের সাথে মিলে যায় (camouflage)।



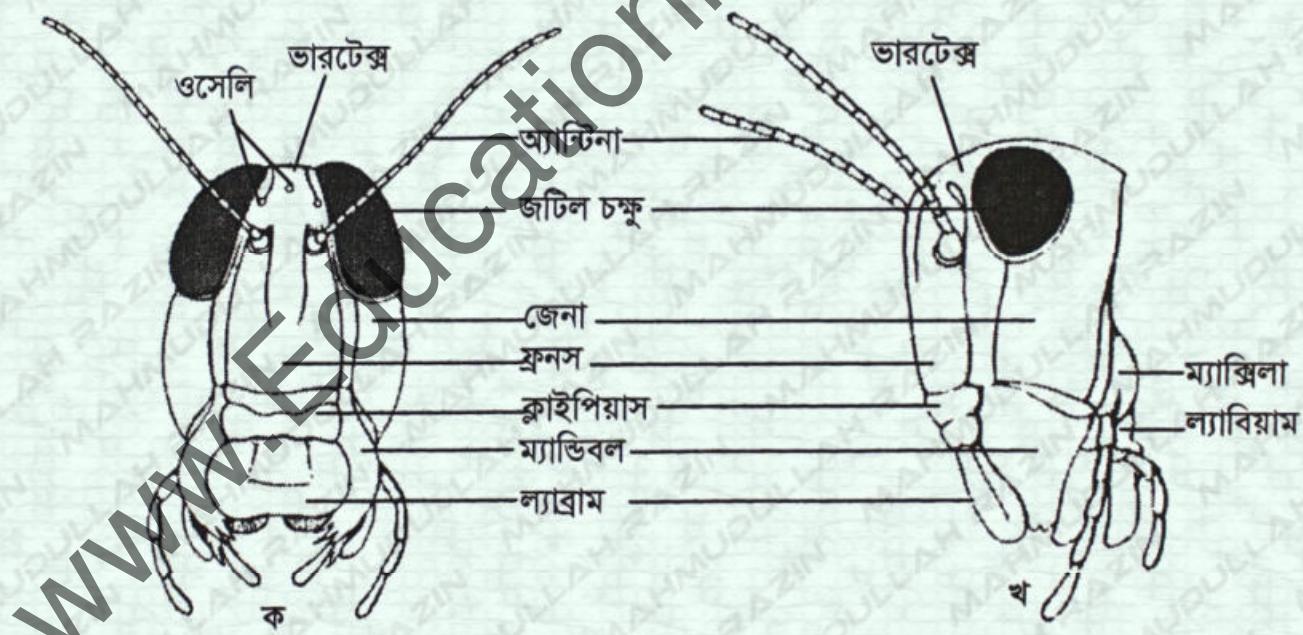
চিত্র ২.২.১ একটি ঘাসফড়িং (পার্শ্বদৃশ্য)

৩। বহিকক্ষাল (Exoskeleton): ঘাসফড়িংয়ের দেহ কাইটিন (chitin) নির্মিত কিউটিকল (cuticle) নামক বহিকক্ষাল দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতি দেহখণ্ডকে কিউটিকল পুরু ও শক্ত পাতের মতো গঠন সৃষ্টি করে। এদের স্লেরাইট (sclerites) বলে। দুটি স্লেরাইটের মধ্যবর্তী কিউটিকল পাতলা ও নরম থাকে। এদেরকে সুচার (sutures) বলে। প্রতি দেহখণ্ডকের পৃষ্ঠদেশীয় পাতকে টার্গাম বা টারগাইট (tergum or tergite) এবং অক্ষদেশীয় পাতকে স্টার্নাম বা স্টার্নাইট (sternum or sternite) বলে। এরা পার্শ্বদেশে পুরু বা প্লুরাইট (pleura or pleurite) পাত দ্বারা পরম্পর যুক্ত থাকে।

৪। দেহের বিভক্তি (Division of body): অন্যান্য পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংয়ের দেহ তিনটি অংশলে বিভক্ত, যথা-মস্তক, বক্ষ ও উদর।

(ক) মস্তক (Head)

ঘাসফড়িং এর মস্তক দেহের সম্মুখ প্রান্তে নিচের দিকে নির্দেশিত অবস্থায় থাকে। পতঙ্গের এ ধরনের মস্তককে হাইপোগ্নাথাস মস্তক (hypognathus head) বলে। আরশোলার মস্তকও একই প্রকৃতির। এটি একটি কাইটিনযুক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে এবং একটি সরু গ্রীবা দ্বারা বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। একে অখণ্ডযুক্ত মনে হলেও জ্ঞানীয় ছয়টি খণ্ডক মিলিত হয়ে মস্তক গঠিত হয়। ঘাসফড়িংয়ের মস্তকের পৃষ্ঠীয় অংশকে ভারটেক্স (vertex), সম্মুখ অংশকে ফ্রন্স (frons) এবং দুপাশের অংশকে জেনা (genae) বলে। ফ্রন্সের নিচে একটি প্লেটের ন্যায় ক্লাইপিয়াস (clypeus) থাকে। মস্তকের দুপাশে দুটি পুঞ্জাক্ষি বা যৌগিক চক্ষু (compound eyes) বিদ্যমান এবং এদের মাঝে তিনটি সরল চক্ষু বা ওসেলি (ocelli) বিদ্যমান থাকে। মস্তকের অক্ষীয়দিকে মুখোপাঙ্গ (mouth parts) এবং সম্মুখ-পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে পুঞ্জাক্ষির নিচে একজোড়া অ্যান্টেনা বা শঙ্খ বিদ্যমান থাকে।



চিত্র ২.২.২ ঘাসফড়িংয়ের মস্তক (ক) পৃষ্ঠদৃশ্য, (খ) পার্শ্বদৃশ্য

(১) পুঞ্জাক্ষি (Compound eyes): ঘাসফড়িংয়ের মস্তকের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে একজোড়া কালো, বৃহৎ, বৃক্ত আকৃতির স্থির জটিল চক্ষু বা পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান। এগুলো বোঁটাবিহীন। এদের উপরিভাগ স্বচ্ছ কিউটিকল বা কর্নিয়া (cornea) দ্বারা আবৃত থাকে। কিউটিকলের মধ্যে ষড়ভূজাকৃতির চিহ্ন দেখা যায় যেগুলো ওমাটিডিয়াম (omatidium) নামক দর্শন এককের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

কাজ: পুঞ্জাক্ষিতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

(২) অ্যান্টেনা (Antennae): ঘাসফড়িংয়ের অ্যান্টেনা লম্বা সূত্রকের মতো (filiform)। প্রতিটি অ্যান্টেনা গোড়ার বৃহৎ স্কেপ (scape), মধ্যভাগের ক্ষুদ্র পেডিসেল (pedicel) এবং প্রান্তের ফ্ল্যাজেলাম (flagellum) এ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। ফ্ল্যাজেলামটি লম্বা, সূত্রাকার এবং 20টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। অ্যান্টেনার গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র সংবদ্ধী লোম বিদ্যমান থাকে।

কাজ: অ্যান্টেনা ঘাসফড়িংয়ের ছাগ, স্পর্শ ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

(৩) ওসেলাস (Ocellus): ঘাসফড়িংয়ের পুঁজাক্ষিদ্বয়ের মাঝে তিনটি সরল চক্ষু বা ওসেলি (একবচন-ocellus বহুবচন-ocelli) থাকে। প্রতিটি ওসেলাস স্বচ্ছ কিউটিকল, চ্যাপ্টা কর্নিয়াজেন কোষ, 4-7 টি রেটিন্যুলার কোষ, র্যাবডোম, রঞ্জক আবরণ ও স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত। এদের স্বচ্ছ কিউটিকলের কিয়দংশ লেস হিসেবে কাজ করে।

কাজ: (i) ওসেলাসের সাহায্যে ঘাসফড়িং আলোর তীব্রতার পরিবর্তন অনুধাবন করে এবং (ii) এদের মাধ্যমে একক প্রতিবিষ্ট গঠিত হয় বলে অনেকে মনে করেন।

(৪) মুখোপাঙ্গ (Mouth parts): ঘাসফড়িংয়ের মুখছিদ্রকে ঘিরে অবস্থিত খাদ্যগ্রহণের সাথে জড়িত কিছু জটিল ধরনের উপাঙ্গকে মুখোপাঙ্গ বলে। ঘাসফড়িংয়ের মুখোপাঙ্গ খাদ্যগ্রহণের সাথে অভিযোজিত এবং এগুলো কামড়ানো ও চর্বণ (biting and chewing type) প্রকৃতির।

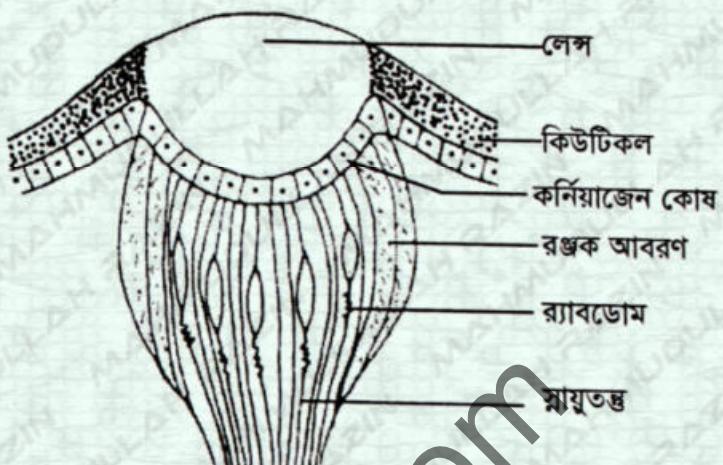
কাজ: মুখোপাঙ্গ খাদ্য বাছাই, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য চর্বণ ও খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের সাথে জড়িত।

(৫) বক্ষ (Thorax)

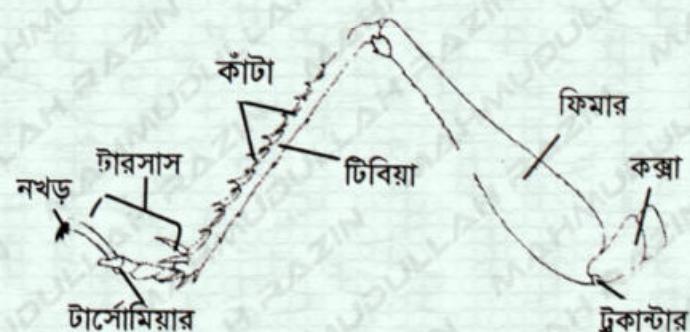
মন্তকের পেছনে দেহের মধ্যাংশ গঠনকারী অংশ হলো বক্ষ। পৃষ্ঠাগত ঘাসফড়িংয়ের বক্ষ তিন খণ্ডে বিভক্ত, যথা- প্রোথোরাক্স বা অগ্রবক্ষ (prothorax), মেসোথোরাক্স বা মধ্যবক্ষ (mesothorax) এবং মেটাথোরাক্স বা পশ্চাত্বক্ষ (metathorax)। বক্ষের প্রতি খণ্ডে একজোড়া করে সংক্রিযুক্ত পা (joined leg) থাকে। মেসোথোরাক্স ও মেটাথোরাক্স একজোড়া করে ডানা বহন করে। ঘাসফড়িংয়ের বক্ষীয় বহিঃকঙ্কালের টার্গাসমূহের সাধারণ নাম নোটাম (notum)। এদের অগ্র, মধ্য ও পশ্চাত্বক্ষের টার্গাদের যথাক্রমে প্রোনোটাম (pronotum), মেসনোটাম (mesonotum) ও মেটানোটাম (metanotum) বলে। বক্ষের প্রতিটি খণ্ডের বহিঃকঙ্কাল মোট 11টি স্কেরাইটের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে পৃষ্ঠীয় টার্গামটি প্রিস্কুটাম (prescutum), স্কুটাম (scutum), স্কুটেলাম (scutellum) এবং পোস্টস্কুটেলাম (postscutellum) নামক চারটি স্কেরাইট নিয়ে গঠিত। প্রতিপাশের প্লিউরনটি ইপিস্টার্নাম (episternum), ইপিমেরন (epimeron) এবং প্যারাপ্টেরন (parapteron) নামক তিনটি স্কেরাইট নিয়ে গঠিত। খণ্ডের অক্ষভাগের স্টার্নামটি একটিমাত্র স্কেরাইট নিয়ে গঠিত। ঘাসফড়িংয়ের প্রোথোরাক্সের প্রোনোটামটি বৃহৎ এবং দুপার্শে প্রসারিত থাকে। এর চারটি স্কেরাইট আন্তঃখাঁজ দ্বারা পৃথক থাকে। এর স্টার্নাম একটি কাটি বহন করে।

পা (Legs): প্রতিটি বক্ষীয় খণ্ডের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট ছয়টি সংক্রিযুক্ত চলন অঙ্গ পা বিদ্যমান থাকে [পতঙ্গদের দেহে ছয়টি পা থাকার কারণে এদের হেক্সাপোডা (Hexapoda) বলা হয়]। প্রতিটি পা পাঁচটি খণ্ডে নিয়ে গঠিত এবং সকল খণ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঁটা থাকে। গোড়ার দিক হতে প্রান্তের দিকে খণ্ডগুলো হলো- কঁক্সা (coxa), ট্রাকান্টার (trochanter), ফিমার (femur), টিবিয়া (tibia) এবং টারসাস (tasus)।

কঁক্সা বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। ট্রাকান্টার ক্ষুদ্র এবং ফিমারের সাথে একত্রিত থাকে। ফিমার ও টিবিয়া লম্বা ও কঁটাযুক্ত। টারসাস তিন খণ্ড বিশিষ্ট, প্রতিটি খণ্ডে টার্সোমিয়ার (tarsomere) বলে। প্রথম টার্সোমিয়ারের অক্ষীয় দিকে প্লান্টুলা (plantula) নামক তিনটি নরম আসঞ্চন প্যাড থাকে। তৃতীয় টার্সোমিয়ারের প্রান্তে দুটি বাঁকানো নখড় থাকে। নখড় দুটির মাঝে পালভিলাস (pulvillus) নামক একটি আসঞ্চন প্যাড থাকে।



চিত্র ২.২.৩ ঘাসফড়িংয়ের একটি ওসেলাস



চিত্র ২.২.৪ ঘাসফড়িং-এর পা

ঘাসফড়িংয়ের সকল পায়ের গঠন একরকম নয়। এদের বক্ষের শেষ খণ্ডকের বা মেটাথোরাক্সের পা দুটির ফিমার অংশ বিশেষভাবে লম্বা ও মাংসল হয় যা লাফিয়ে চলার উপযোগী। এ ধরনের পাকে স্যালটাটোরিয়াল পা (Saltatorial legs) বলা হয়।

ডানা (Wing): ঘাসফড়িংয়ের মধ্যবক্ষ ও পশ্চাত্বক্ষের সাথে একজোড়া করে মোট দুইজোড়া ডানা বিদ্যমান। মধ্যবক্ষের ডানা বা অগ্রডানা দুটি সরু এবং চামড়ার ন্যায়। এটি সমভাবে বর্ণময় বা দাগাবিত থাকে। এদের ট্যাগমিনা (tegmina) বলে। এরা উড়য়নে অংশগ্রহণ করে না তবে পশ্চাত ডানা ও উদরকে ঢেকে রাখে। পশ্চাত ডানা প্রশস্ত ও পর্দার মতো এবং উড়য়নে অংশগ্রহণ করে। উভয় ডানার কিউটিকলে ট্রাকিয়া, রক্ত সাইনাস ও স্নায়ু প্রসারিত থাকে। ডানার কিউটিকল রক্ত সাইনাস বরাবর পুরু হয়ে শিরা (vein) গঠন করে।



অগ্র ডানা বা ট্যাগমিনা



পশ্চাত ডানা শিরা

চিত্র ২.২.৫ ঘাসফড়িং-এর ডানা

(গ) উদর (Abdomen)

ঘাসফড়িংয়ের উদর লম্বা এবং পশ্চাত্বদিকে ক্রমশ সরু। এটি ১১ খণ্ডক নিয়ে গঠিত। প্রতিটি খণ্ডকের পৃষ্ঠদিকে টার্গাম এবং অক্ষদিকে স্টোর্নাম থাকে কিন্তু পার্শ্বে প্লিউরন অনুপস্থিত। প্রথম উদরীয় খণ্ডকের স্টোর্নাম বক্ষের সাথে একীভূত থাকে এবং টার্গামের উভয় দিকে একটি করে ডিম্বাকৃতির টিম্পানিক পর্দা (tympanic membrane) থাকে যা শ্রবণ অঙ্গকে (tympanum) ঢেকে রাখে। প্রথম হতে অষ্টম উদর খণ্ডকের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট ৪ জোড়া শ্বাসরক্ত বা স্পাইরাকল (spiracles) থাকে। ঘাসফড়িংয়ের শেষ উদরীয় খণ্ডকটি প্রজননের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়। পুরুষে এটি গোলাকার কিন্তু স্ত্রীতে সৃঁচালো। উভয়ক্ষেত্রে নবম ও দশম খণ্ডকের টার্গা আংশিকভাবে একীভূত থাকে। পুরুষের একাদশ খণ্ডকের টার্গামটি পায়ুর উপরে সুপ্রা অ্যানাল প্লেট (supra anal plate) গঠন করে। এদের দশম খণ্ডকের পেছনের দিকে দুটি অ্যানাল সারসি (anal circi) থাকে। এদের নবম খণ্ডকের স্টোর্নাম প্রলম্বিত হয়ে সাবজেনিটাল প্লেট গঠন করে যা উক্ত খণ্ডকের শেষে বিদ্যমান জনন ছিদ্রকে (genetal apperatus) ঢেকে রাখে। স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টোর্নাম প্রলম্বিত ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ ওভিপজিটর (ovipositor) গঠন করে।



চিত্র ২.২.৬ ঘাসফড়িংয়ের পুরুষের উদর (ক) পৃষ্ঠদৃশ্য ও (খ) অক্ষদৃশ্য) এবং স্ত্রীর উদর (গ) পৃষ্ঠদৃশ্য ও (ঘ) অক্ষদৃশ্য

ঘাসফড়িংয়ের মুখোপাস (Mouthparts of grasshopper)

ঘাসফড়িংয়ের মুখোপাস কামড়ানো ও চৰণ ধরনের এবং যেসব অংশ নিয়ে গঠিত সেগুলো হলো: (১) একটি ল্যাব্রাম, (২) দুটি ম্যান্ডিবল, (৩) দুটি ম্যাক্সিলা, (৪) একটি ল্যাবিয়াম এবং (৫) একটি হাইপোফ্যারিংস্ক্রি। নিম্নে এদের বর্ণনা করা হলো-

১। **ল্যাব্রাম (Labrum):** এটি মুখছিদ্রের উপরের দিকে অবস্থিত প্রায় গোলাকার, চওড়া, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও চ্যাপ্টাকৃতির উপাস। এটি পেশি দ্বারা মন্তকের ক্লাইপিয়াসের সাথে যুক্ত থাকে।

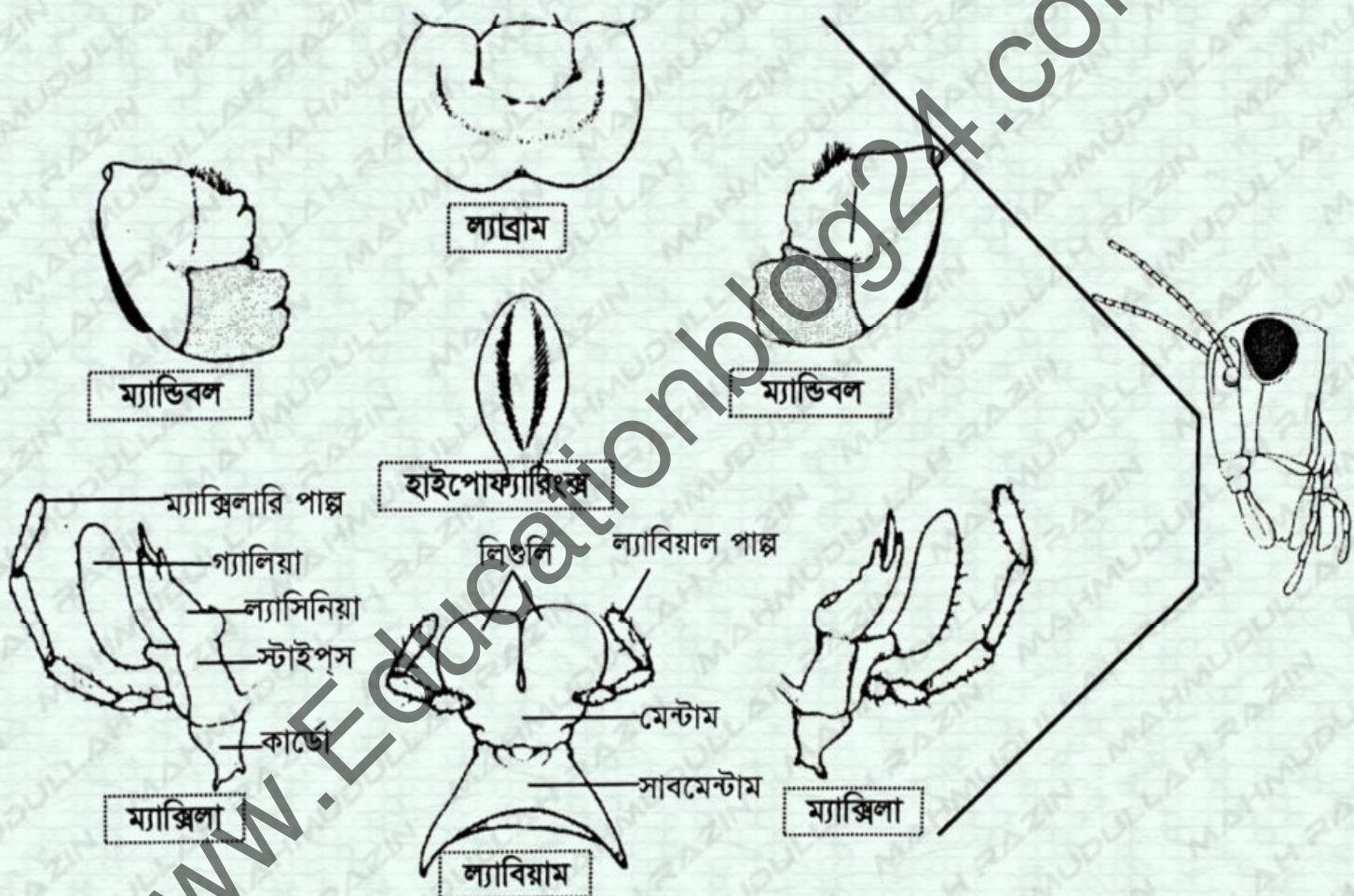
কাঙ্গ: (i) এটি ম্যান্ডিবলস্ক্রিকে ঢেকে রাখে; (ii) এটি উর্ধ্ব ওষ্ঠ গঠন করে যা খাদ্যবস্তু ধরায় এবং মুখের দিকে ঠেলে দিতে সহায়তা করে।

২। ম্যান্ডিবল (Mandible): ল্যাব্রামের নিচে মুখছিদ্রের দুপাশে দুটি ম্যান্ডিবল বিদ্যমান। প্রতিটি ম্যান্ডিবল শক্ত, মজবুত ও ত্রিকোণাকার উপাঙ্গ। এদের ভেতরের প্রান্তে করাতের দাঁতের মতো শক্ত ও কালো বর্ণের কতগুলো দাঁত থাকে। প্রতিটি ম্যান্ডিবল অ্যাডাষ্টর ও অ্যাবডাষ্টর পেশি দ্বারা মন্তকের সাথে সংযুক্ত থাকে।

কাজ: এরা খাদ্যবস্তু কর্তন, পেষণ ও চর্বণে সাহায্য করে।

৩। ম্যাক্সিলা (Maxilla): ম্যান্ডিবলের পেছনে এবং বাইরের দিকে দুটি ম্যাক্সিলা বিদ্যমান। প্রতিটি ম্যাক্সিলাতে পাঁচটি অংশ থাকে যথা, কার্ডো (cardo), স্টাইপস (stipes), ল্যাসিনিয়া (lacinia), গ্যালিয়া (galea) ও ৫ খণ্ড বিশিষ্ট ম্যাক্সিলারি পাল্প (maxillary palp)। ল্যাসিনিয়া ও গ্যালিয়ার প্রান্তসীমায় এবং ম্যাক্সিলারি পাল্পের গায়ে সৃষ্টি সংবেদী রোম থাকে।

কাজ: (i) এরা খাদ্য ধরতে ও খাদ্যকে মুখে প্রবেশ করতে সহায়তা করে; (ii) এরা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে; (iii) এরা আন্টেনা ও পা পরিষ্কার করে।



চিত্র ২.২.৭ ঘাসফড়িংয়ের মুখোপাঙ্গ

৪। ল্যাবিয়াম (Labium): ঘাসফড়িংয়ের মুখছিদ্রের অক্ষীয় দিকে একটি বৃহদাকার, সন্ধিযুক্ত, জটিল উপাঙ্গ বিদ্যমান। একে ল্যাবিয়াম বলে। এটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং সাবমেন্টাম (submentum) ও মেন্টাম (mentum) নামক দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। মেন্টামের দুপার্শে দুটি ৩ খণ্ড বিশিষ্ট ল্যাবিয়াল পাল্প (labial palp) এবং অগভাগে একটি লিঙ্গুলা (ligula) থাকে। প্রতিটি লিঙ্গুলার ভেতরের দিকে অতিক্রম গ্লোসা (glossa) ও বাইরের দিকে প্যারাগ্লোসা (paraglossa) বিদ্যমান।

কাজ: (i) এটি মুখের নিম্ন ওষ্ঠ গঠন করে; (ii) এটি খাদ্যকে মুখে প্রবেশ করতে সাহায্য করে; (iii) ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদী অঙ্গসমূহে এবং খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে।

৫। হাইপোফ্যারিংক্স বা লিঙ্গুলা (Hypopharynx or Lingua): ঘাসফড়িংয়ের মুখবিবরের মেঝেতে অবস্থিত একটি অসম আকৃতির, স্কুদ্র, লম্বাটে ও মাংশল উপাঙ্গকে হাইপোফ্যারিংক্স বলে। এর গোড়ায় লালাগ্রাহি উন্মুক্ত থাকে।

কাজ: (i) এটি মুখবিবরে খাদ্যকে নাড়াচাড়া করে; (ii) এর মাধ্যমে লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System)

যে তন্ত্র দ্বারা ঘাসফড়িং খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, খাদ্যসার শোষণ ও অপাচ্য অংশ দেহ হতে নিষ্কাশন করে তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। ঘাসফড়িংয়ের খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত। ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকতন্ত্র প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা- পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রহণ।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal)

যে নালি ঘাসফড়িংয়ের মুখছিদ্র হতে শুরু করে দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থেকে পায়ু ছিদ্রে শেষ হয় তাকে পৌষ্টিকনালি বলে। এটি মুখছিদ্র, গলবিল, গ্রাসনালি, ক্রপ, গিজার্ড, মেসেন্টেরন, রেকটাম ও পায়ুছিদ্র নিয়ে গঠিত। তবে একে নিম্নলিখিত তিনটি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়-

- ১। স্টোমোডিয়াম বা অগ্নঅন্তর,
- ২। মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্তর এবং
- ৩। প্রোটোডিয়াম বা পশ্চাংঅন্তর

১। স্টোমোডিয়াম বা অগ্নঅন্তর (Stomodium or foregut):
পৌষ্টিকনালির মুখছিদ্র হতে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে স্টোমোডিয়াম বা অগ্নঅন্তর বলা হয়। এ অংশ এন্টোডার্ম থেকে গঠিত হয় এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকুল নির্মিত শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এটি নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত -

(ক) মুখছিদ্র (Mouth): ঘাসফড়িংয়ের মুখছিদ্রটি মুখোপাঙ্গ দ্বারা পরিবৃত্ত প্রিওরাল গহ্বর বা সিবেরিয়াম (cibarium) নামক প্রকোঠের গোড়ায় অবস্থিত। এ প্রকোঠটি মূলত মুখোপাঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

কাজ: সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্রের মাধ্যমে গলবিলে পৌছায়।

(খ) গলবিল (Pharynx): মুখছিদ্র গলবিলে উন্মুক্ত হয়। গলবিল পেশিবহুল সরু ও খাটো ললের মতো অংশ।

কাজ: এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

(গ) গ্রাসনালি (Oesophagus): গলবিলের পশ্চাতে অবস্থিত সোজা, সরু ও মলাকার নালি হলো গ্রাসনালি। এটি গ্রীবার মধ্য দিয়ে প্রস্তরিত হয়ে উদর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

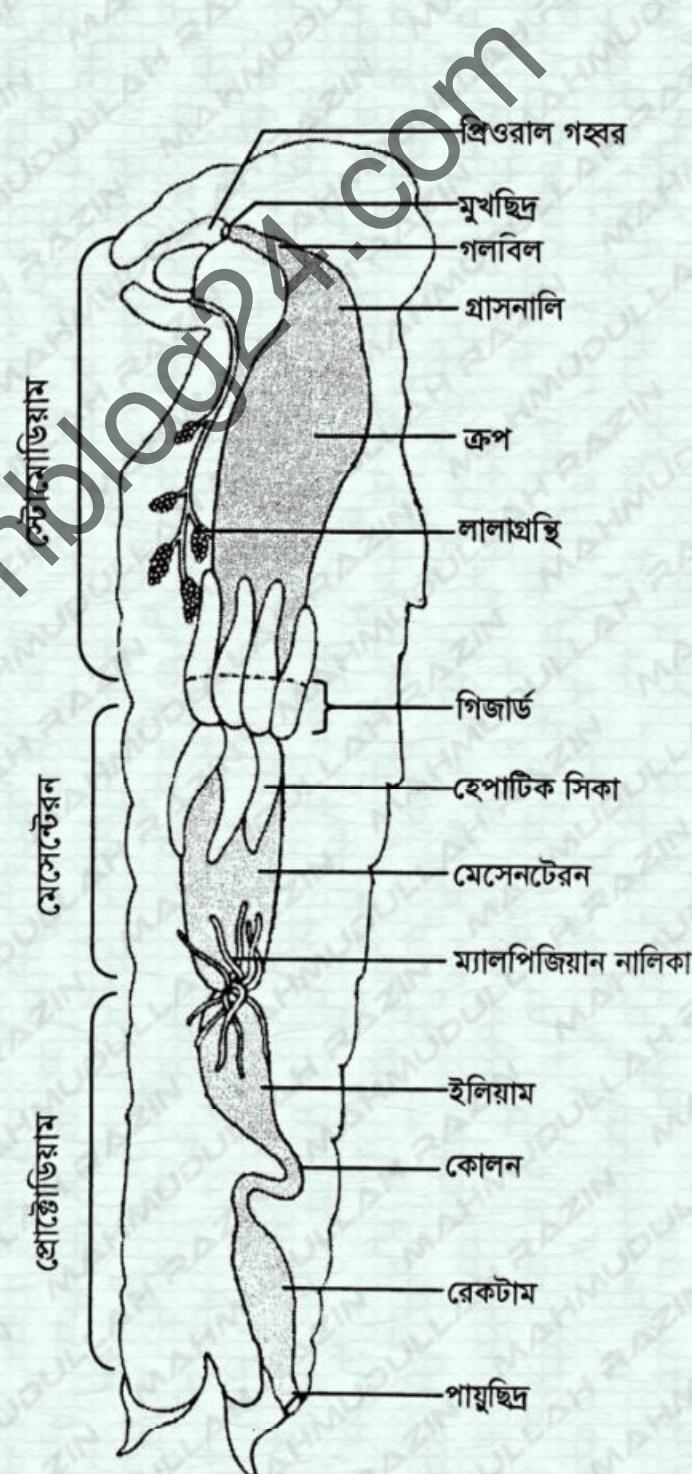
কাজ: এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু ক্রপে পৌছায়।

(ঘ) ক্রপ (Crop): গ্রাসনালি পশ্চাত্দিকে ক্রমশ স্ফীত হয়ে উদরের মাঝামাঝি স্থানে একটি কনিকেল আকৃতির থলে গঠন করে। একে ক্রপ বলে। এর প্রাচীর পাতলা কিন্তু পেশিবহুল।

কাজ: ক্রপে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং খাদ্যের সাথে লালা মিশ্রিত হয়।

(ঙ) গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus): ক্রপ একটি ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে গিজার্ডে উন্মুক্ত হয়।

গিজার্ড পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট কনিক্যাল আকৃতির গঠন বিশেষ। এর প্রাচীরে পুরু বৃত্তাকার পেশি থাকায় ভেতরের গহ্বর বা লুমেন সংকীর্ণ হয়ে যায়। গিজার্ড দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। এর সম্মুখের অংশকে আর্মারিয়াম (armarium) এবং পশ্চাতের অংশকে স্টোমোডিয়াল কপাটিকা (stomodial valve) বলে। আর্মারিয়ামের প্রাচীর অনুদৈর্ঘ্যভাবে ভাঁজ খেয়ে ছয়টি



চিত্ৰ ২.২.৮ ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকনালি

পাতসদৃশ্য কাইটিন নির্মিত দাঁত গঠন করে। এসব দাঁতের পেছনে প্যাড সদৃশ্য পাত থাকে যেগুলোতে পশ্চাত দিকে নির্দেশিত সূক্ষ্ম ব্রিসল বা রোম বিদ্যমান থাকে। অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজের ফলে সৃষ্টি হয়ে গভীর খাদ্যেও অসংখ্য ব্রিসল থাকে। গিজার্ডের পশ্চাত অংশ ক্রমশ সরু হয়ে স্টোমোডিয়াল কপাটিকার মাধ্যমে মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্ত্রে উন্মুক্ত হয়।

কাজ: গিজার্ডের দাঁত খাদ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং ব্রিসল ছাঁকনির কাজ করে। কপাটিকা খাদ্যের বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

২। মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্ত্র (Mesenteron or midgut): গিজার্ড কার্ডিয়াক কপাটিকার মাধ্যমে একটি প্রশস্ত, সমব্যাসী ও পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট নালিতে উন্মুক্ত হয়। একে মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্ত্র বলে। গিজার্ড এবং মেসেন্টেরনের সংযুক্তির স্থানকে কার্ডিয়া (cardia) বলে। এ স্থান হতে 12টি আঙুলের মতো প্রবর্ধন বের হয়, এদের হেপাটিক সিকা (hepatic caeca) বা গ্যাস্ট্রিক সিকা (gastric caeca) বা মেসেন্টেরিক সিকা (mesenteric caeca) বলে। মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীর কলামনার এভোডার্মাল কোষ দ্বারা গঠিত এবং এটি ভাঁজ খেয়ে অসংখ্য ভিলাটি গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে সূক্ষ্ম চুলের মতো হলুদাভাব-সবুজ বর্ণের কতগুলো ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules) থাকে যেগুলো মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

কাজ : মেসেন্টেরনের লুমেনে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে বিদ্যমান ভিলাটি খাদ্যসার শোষণ করে।



চিত্র-২.২.৯ ঘাসফড়িয়ের (ক) স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরন অংশের লম্বচেছদ এবং (খ) গিজার্ডের প্রস্তুচেছদ

৩। প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাতঅন্ত্র (Proctodium or hindgut): পৌষ্টিকত্ত্বের মেসেন্টেরনের পরবর্তী অংশকে প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাতঅন্ত্র বলে। এটি এক্ষেত্রে উত্তৃত এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দ্বারা আবৃত থাকে। মূলত ম্যালপিজিয়ান নালিকাগুলো মেসেন্টেরন ও প্রোক্টোডিয়ামের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। প্রোক্টোডিয়াম চারটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা-

(ক) ইলিয়াম (Ileum): প্রোক্টোডিয়ামের মেসেন্টেরন সংলগ্ন প্রশস্ত নলাকার অংশটি হলো ইলিয়াম। এর অন্তঃপ্রাচীরে রোমযুক্ত অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ থাকে। পরিপাককৃত খাদ্যসার ইলিয়ামের প্রাচীর দ্বারা শোষিত হয়।

(খ) কোলন (Colon): ইলিয়ামের পরবর্তী সরু ও নলাকৃতির অংশ হলো কোলন। অবশিষ্ট খাদ্যসার পানিসহ এখানে শোষিত হয়।

(গ) রেকটাম (Rectum): কোলনের পরবর্তী স্ফীত ও পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট অংশকে রেকটাম বা মলাশয় বলে। এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ অংশ। এর প্রাচীরে ছয়টি পুরু ও অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ থাকে। এদের রেকটাল গ্রাহি বলে। এগুলো মল থেকে অতিরিক্ত পানি শোষণের উপযোগী। রেকটামে মল সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং এটি মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজলবণ ও অ্যামিনো অ্যাসিড শোষণ করে।

(৮) পায়চিন্দ্র (Anus): মলাশয়ের শেষপ্রান্তে পায়চিন্দ্র বিদ্যমান। এটি ঘাসফড়িংয়ের দশম দেহখণ্ডকের অঙ্কভাগে উন্মুক্ত হয়। পায়চিন্দ্রের মাধ্যমে মল দেহের বাইরে নিষ্কাশন হয়।

পৌষ্টিকগুলি (Digestive gland)

ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকগুলি বলতে একজোড়া লালগুলিকেই (Salivary gland) বুঝায়। মুখোপাস হাইপোফ্যারিংস্কে এর গোড়া থেকে উৎপন্নি লাভ করে একজোড়া লালগুলি গ্রাসনালির দুপাশ দিয়ে ক্রপ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। লালগুলি থেকে নিঃসৃত লালারস (Saliva) খাদ্য গলাধংকরণ ও চর্বনে সাহায্য করে। এছাড়া কিছু শর্করা খাদ্য পরিপাকে এটি অংশগ্রহণ করে। পৌষ্টিকনালির সাথে সংযুক্ত মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান কিছু নিঃস্বাবী কোষ আছে যেগুলো খাদ্য পরিপাকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ করে।

ঘাসফড়িংয়ের খাদ্য, খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ পদ্ধতি

১। খাদ্য (Food): ঘাস এদের প্রধান খাদ্য, তবে ঘাসের অভাবে এরা অন্যান্য উদ্ভিদের পাতাও ভক্ষণ করে। অ্যান্টেনা ও ম্যাক্সিলারি পাল্পে বিদ্যমান সংবেদী রোমের সাহায্যে এরা খাদ্যের উপস্থিতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে।

২। খাদ্যগ্রহণ (Feeding): ঘাসফড়িয়ের মুখোপাস চৰ্বণ বা ম্যান্ডিবুলার (chewing or mandibular) প্রকৃতি। এদের মুখোপাস ঘাস জাতীয় খাদ্যগ্রহণ করার জন্য অভিযোজিত। অগ্রপদ, ল্যাঙ্গুম ও ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তুকে ধরে ম্যান্ডিবলের সামনে আনে। ম্যান্ডিবলে বিদ্যমান দাঁত দ্বারা শক্ত খাদ্যবস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। বিচূর্ণকৃত খাদ্যকণা প্রিওরাল গহ্বরে পৌছায় এবং সেখান থেকে গলবিল ও গ্রাসনালির মাধ্যমে ক্রপে পৌছায়।

৩। খাদ্য পরিপাক (Digestion): খাদ্য প্রিওরাল প্রক্রিয়া পৌছানোর পরই লালার সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যেগুলো বিভিন্ন ধরনের শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। লালারস মিশ্রিত খাদ্য ক্রপে পৌছানোর পর খাদ্যের পরবর্তী পরিপাক সম্পন্ন হয়।

(ক) ক্রপে পরিপাক: প্রকৃতপক্ষে ক্রপেই খাদ্য পরিপাকের সূচনা ঘটে এবং অধিকাংশ খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয়। মেসেন্টেরন থেকে আন্ত্রিকরস গিজার্ডের মাধ্যমে উল্টাদিকে প্রবাহিত হয়ে ক্রপে পৌছায়। লালারসের অ্যামাইলেজ এবং আন্ত্রিকরসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম ইনভারটেজ, ম্যালটেজ ও ল্যাস্টেজ এর প্রভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্যের অধিকাংশই গ্রুকোজে পরিণত হয়। আন্ত্রিকরসের প্রোটওলাইটিক এনজাইম ট্রিপসিন, প্রোটিয়েজ, ও পেপটাইডেজ-এর প্রভাবে প্রোটিন খাদ্য আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে আমাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। আন্ত্রিকরসের লাইপোলাইটিক এনজাইম চর্বিকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

(খ) গিজার্ডে পরিপাক: গিজার্ডে খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না। তবে এটি খাদ্যকে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করে। প্রায় পরিপাককৃত খাদ্য গিজার্ডে প্রবেশ করলে এর দাঁত দ্বারা পিষ্ট হয়ে খাদ্যবস্তু অতি সূক্ষ্ম কণা সমৃদ্ধ পেস্টে (paste) পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে বিদ্যমান ব্রিসল বা সূক্ষ্ম রোম দ্বারা পরিস্তুত হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে। গিজার্ডের স্টোমোডিয়াম কপাটিকা খাদ্যকণার পশ্চাত্মুখী প্রবাহ রোধ করে।

(গ) মেসেন্টেরনে পরিপাক: পেস্টের মতো খাদ্য মেসেন্টেরনে পৌছানোর পর হেপাটিক সিকা ও মেসেন্টেরন প্রাচীরের নিঃস্বাবী কোষ নিঃসৃত আন্ত্রিক রসে বিদ্যমান অ্যামাইলোটিক, প্রোটওলাইটিক ও লাইপোলাইটিক বিভিন্ন এনজাইম খাদ্যের অপরিপাক অংশের সাথে ক্রিয়া করে পরিপাক সম্পন্ন করে।

৪। খাদ্যসার শোষণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন (Absorption and Egestion): মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার প্রাচীরে বিদ্যমান শোষণকারী কোষের মাধ্যমে প্রায় সকল খাদ্যসার পরিশোষিত হয়। গ্রুকোজের অধিকাংশই হেপাটিক সিকাতে পরিশোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ অংশ মল হিসেবে রেকটামে সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং এর প্রাচীর মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজলবণ ও অ্যামিনো অ্যাসিড শোষণ করে। পরিশেষে পায়পথে মল দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

পরীক্ষণ-১: ঘাসফড়ি/আরশোলার মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

একটি কাঁচি, দুটি চিমটা, ডিসেকটিং ট্রে, ক্লোরোফর্ম, কিলিং জার, স্লাইড, হিসারিন, ড্রয়িং পেনসিল, ব্যবহারিক খাতা।
কার্যপদ্ধতি

প্রথমে একটি কিলিং জারে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে ঘাসফড়ি/আরশোলাকে নিষ্ঠেজ বা অঙ্গান করে নিতে হবে। এরপর ঘাসফড়ি/আরশোলার অঙ্গীয় বা বুকের দিকটা উপরের দিকে এবং পৃষ্ঠীয় দিকটা হাতের তালুর দিকে রেখে উহাকে বাম হাতের তর্জনী এবং বৃক্ষাঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরতে হবে যাতে মুখোপাঙ্গগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর একটা নমনীয় ও সূক্ষ্ম চিমটা (forceps) দিয়ে হালকাভাবে টেনে এক এক করে মুখোপাঙ্গগুলো তুলে আনতে হবে। প্রথমে ল্যাবিয়াম, এরপর ডান ও বাম ম্যাক্সিলা, পরবর্তীতে ম্যানিবলদ্বয়, তারপর হাইপোফ্যারিংস্কে টেনে উঠাতে হবে এবং সবশেষে সাবধানে ছোট কাঁচি দিয়ে ল্যাব্রাম কেটে উঠাতে হবে। মুখ উপাঙ্গগুলোকে একটি হিসারিনযুক্ত স্লাইডের উপর সাজিয়ে রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: ঘাসফড়ি/আরশোলার মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারিক খাতায় এর চিত্র একে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।



চিত্র ২.২.১০ আরশোলার মুখোপাঙ্গ

পরীক্ষণ-২: ঘাসফড়ি/আরশোলা ব্যবচেদ করে এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

দুটি কাঁচি, দুটি চিমটা, দুটি হাতলযুক্ত নিডল বা সুই একটি ব্রাশ, একটি ব্রেড, কয়েকটি আলপিন, ড্রয়িং পেনসিল, ডিসেকটিং ট্রে, ক্লোরোফর্ম, কিলিং জার, স্লাইড, হিসারিন।

কার্যপদ্ধতি

ব্যবচেদ পদ্ধতি

- প্রথমে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে ঘাসফড়ি/আরশোলাকে নিষ্ঠেজ বা অঙ্গান করে নিতে হবে।
- এরপর প্রাণীটির পাখা এবং পাণ্ডলো কেটে ফেলতে হবে।
- তারপর ঘাসফড়ি/আরশোলাটিকে বাম হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে ধারালো কাঁচির সাহায্যে বক্ষ ও উদরের পার্শ্ব বরাবর কাটতে হবে যাতে টারগা ও স্টার্না পৃথক হয়ে যায়।

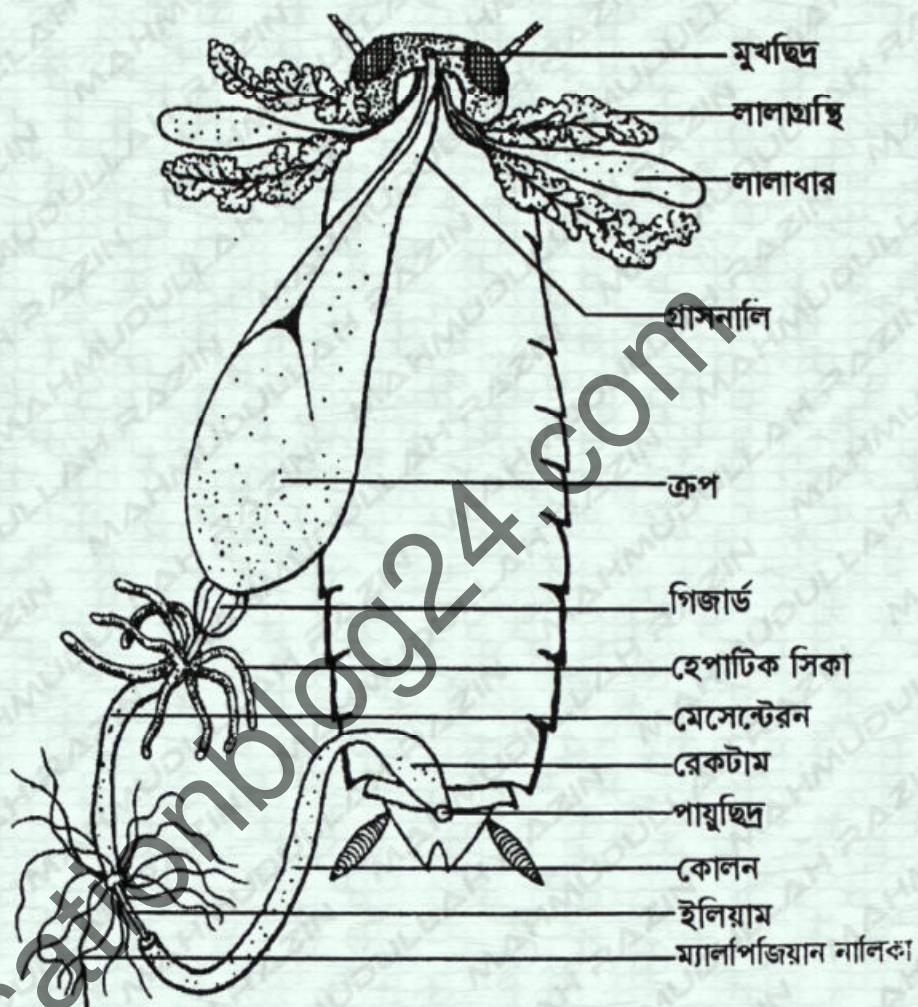
৪। এবার ঘাসফড়িং/আরশোলাটির পৃষ্ঠভাগ উপরে রেখে পিন দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে মোমের সাথে আটকাতে হবে।

৫। এরপর ট্রেতে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে যাতে ঘাসফড়িং/আরশোলাটি সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

৬। এবার একটি নমনীয় ও সূক্ষ্ম ফরসেপ ও নিউলের সাহায্যে পৃষ্ঠীয় দিক থেকে টারগামগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলতে হবে। এতে দেহগহ্বর বা হিমোসিল উনুক্ত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রসহ অন্যান্য তন্ত্র দৃশ্যমান হবে।

৭। এবার ফরসেপের সাহায্যে পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গাদি যেমন- চর্বি, ট্রাকিয়া, প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি অপসারণ করে পৌষ্টিকনালির পাঁচগুলো ধীরে ধীরে ছাঢ়িয়ে নিতে হবে।

৮। পরিশেষে পৌষ্টিকনালিটির মধ্যভাগে ফরসেপ দিয়ে ধরে দেহের বামদিকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে পিন দিয়ে ট্রেতে এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে সহজেই পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করা যায়।



চিত্র ২.২.১১ আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র

পর্যবেক্ষণ: ঘাসফড়িং/আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারিক খাতায় এর চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

রক্ত সংবহনতন্ত্র

প্রাণিদেহে দুধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যথা- মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র।

মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র (Open type circulatory system): যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত হ্রৎযন্ত্র থেকে বিভিন্ন ছিদ্র (অস্টিয়া) অথবা নালিকার মাধ্যমে বের হয়ে দেহ গহ্বর বা সাইনাসে মুক্ত হয় এবং পুনরায় ছিদ্র (অস্টিয়া) অথবা নালিকার মাধ্যমে হ্রৎযন্ত্রে ফিরে আসে তাকে মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। আর্থ্রোপোডা (ঘাসফড়িং, আরশোলা, চিংড়ি, মশা, মাছি ইত্যাদি) ও মোলাকা (শামুক, বিনুক, অঞ্চলিক ইত্যাদি) পর্বের সকল প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত ধরনের।

বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র (Closed type circulatory system): যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত হ্রৎযন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট নালিকা পথে বের হয়ে সমগ্র দেহে কৈশিক জালিকা সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট নালিকার মাধ্যমে হ্রৎযন্ত্রে ফিরে আসে তাকে বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। অ্যানেলিডা (কেঁচো, জোক ইত্যাদি) ও কর্ডাটা (মানুষ, গিনিপিগ, মাছ, পাখি, সরীসৃপ, ব্যাঙ ইত্যাদি) পর্বের সকল প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ ধরনের।

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত বা ল্যাকুনার প্রকৃতির। এদের রক্তনালিগুলো কৈশিকজালিকা গঠন না করে দেহের বিভিন্ন ফাঁকা ছান বা ল্যাকুনাতে মুক্ত হয়। এজন্য এদের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে মুক্ত বা ল্যাকুনার ধরনের সংবহনতন্ত্র (open or lacunar type circulatory system) বলে।

বন্ধ সংবহনতত্ত্ব ও মুক্ত সংবহনতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য

বন্ধ সংবহনতত্ত্ব	মুক্ত সংবহনতত্ত্ব
১। যে রক্ত সংবহনতত্ত্বে রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকার মধ্যে অবস্থান করে তাকে বন্ধ সংবহনতত্ত্ব বলে।	১। যে রক্ত সংবহনতত্ত্বে রক্ত হৃৎযন্ত্র, রক্তবাহিকা ও বিভিন্ন সাইনাস অবস্থান করে তাকে মুক্ত সংবহনতত্ত্ব বলে।
২। হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনি ও কৈশিকজালিকা সমন্বয়ে বন্ধ রক্ত সংবহনতত্ত্ব গঠিত।	২। হৃৎযন্ত্র, সংক্ষিপ্ত রক্তনালি ও সাইনাস নিয়ে মুক্ত রক্ত সংবহনতত্ত্ব গঠিত।
৩। এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে না। দেহগহ্বর প্রকৃত সিলোম।	৩। এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে। এজন্য একে হিমোসিল বলে।
৪। রক্ত কোষ-কলার সরাসরি সংস্পর্শে আসে না। কলারসের মাধ্যমে পুষ্টি পদার্থ ও শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে।	৪। রক্ত সরাসরি কোষ কলার সংস্পর্শে এসে পুষ্টি পদার্থ ও শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটায়।
৫। অ্যানেলিডাসহ কর্ডাটা পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।	৫। আর্থ্রোপোডা ও মোলাকা পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতত্ত্ব হিমোসিল, রক্ত ও হৃৎযন্ত্র নিয়ে গঠিত। নিম্নে এদের বিবরণ দেয়া হলো-

১। হিমোসিল (Haemocoel)

ঘাসফড়িংসহ সকল সঙ্কিপদী (arthropods) প্রাণীর দেহগহ্বরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-(i) এটি মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে না, (ii) এটি রক্তপূর্ণ এবং (iii) এটি সংবহনতত্ত্বের অংশ হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের রক্তপূর্ণ দেহগহ্বরকে হিমোসিল (haemocoel; Gr. *haema*=blood + *coel*=cavity) বলে। জীবীয় পেরিভিসেরাল সিলোম পরিবর্তিত হয়ে হিমোসিল গঠন করে। এটি কতগুলো অনিয়ন্ত ফাঁকা স্থান বা ল্যাকুনা বা সাইনাস (lacuna or sinus) নিয়ে গঠিত। ঘাসফড়িংয়ের দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাত্ত পয়স্ত হিমোসিল বিস্তৃত থাকে এবং সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়। দুটি পেশিময় সচিদ্ব আনুভূমিক পর্দা দ্বারা হিমোসিলটি তিনটি বৃহৎ সাইনাসে বিভক্ত থাকে। পর্দা দুটি হলো- হৃৎযন্ত্রের অক্ষীয় দিকে অবস্থিত পৃষ্ঠীয় পর্দা (dorsal diaphragm) এবং স্নায়ুরজ্জুর উপরের দিকে বিস্তৃত অক্ষীয় পর্দা (ventral diaphragm)। সাইনাস তিনটি হলো-

(ক) পেরিকার্ডিয়াল বা ডর্সাল সাইনাস (Pericardial or dorsal sinus): এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার উপরে দেহের পৃষ্ঠাদিকে অবস্থিত। এর মধ্যে হৃৎযন্ত্র অবস্থান করে।

(খ) পেরিভিসেরাল সাইনাস (Perivisceral sinus): এটি পৃষ্ঠীয় ও অক্ষীয় পর্দার মাঝে অবস্থিত। এতে পৌষ্টিকতত্ত্ব, রেচনতত্ত্ব ও জননতত্ত্ব অবস্থান করে।

(গ) পেরিনিউরাল বা স্টার্মাল সাইনাস (Perineural or sternal sinus): এটি অক্ষীয় পর্দার নিচে দেহের অক্ষীয় দিকে অবস্থান করে। এটিতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

হিমোসিলের কাজ: □ হিমোসিল দেহের সকল অন্তঃঅঙ্গকে ধারণ করে; □ এটি রক্ত ও লসিকা ধারণ করে; □ এর মাধ্যমে খাদ্যসার ও বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত হয়।

২। রক্ত বা হিমোলিফ (Blood or Haemolymph)

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত বর্ণহীন। রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরের লসিকার (lymph) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িংয়ের রক্তকে হিমোলিফ (haemolymph) বলে। হিমোলিফ প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমন-

(ক) রক্তরস (Plasma): এটি বর্ণহীন তরল। এর 70%ই পানি। এতে বিভিন্ন ধরনের খনিজলবণ, খাদ্যসার ও রেচন বর্জ্য দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

(খ) রক্তকণিকা (Haemocytes): ঘাসফড়িংয়ের রক্তরসে হিমোসাইট নামক বর্ণহীন শ্বেতকণিকা থাকে। এদের প্রতি ঘন মিমি রক্তে 15-60 হাজার হিমোসাইট থাকে। ঘাসফড়িংয়ের রক্তে কোনো শ্বসন রঞ্জক থাকে না। হিমোসাইট তিন ধরনের হয়, যথাপ্রোহিমোসাইট (23%), ট্রানজিশনাল হিমোসাইট (68%) এবং বৃহৎ হিমোসাইট (9%)।



চিত্র ২.২.১২ ঘাসফড়িংয়ের বিভিন্ন ধরনের রক্ত কণিকা (ক) প্রোহিমোসাইট (খ) প্লাজমাটোসাইট (গ) গ্রানুলোসাইট (ঘ) ক্ষেরিওল কোষ

Arnold (1972) এর মতে ঘাসফড়িংয়ের রক্তসে প্রোহিমোসাইট, প্লাজমাটোসাইট, থানুলোসাইট এবং স্ফেরিওল কোষ নামক চার ধরনের হিমোসাইট থাকে। ঘাসফড়িংয়ের রক্তকণিকায় কোনো খসন রঞ্জক থাকে না।

হিমোলিফের রাসায়নিক উপাদান:

ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিফের প্লাজমায় প্রায় সকল ধরনের জৈব ও অজৈব উপাদান যেমন- মুক্ত আয়ন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, জৈব অ্যাসিড, এস্টার, ফসফেট, ইউরিক অ্যাসিড, রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। পতঙ্গের হিমোলিফের প্লাজমা স্তন্যপায়ীদের রক্তের প্লাজমার হতে অনেক উপাদানেই আলাদা। ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিফের প্লাজমায় বিশেষ যেসব রাসায়নিক উপাদান থাকে সেগুলো হলো: উচ্চ মাত্রায় অ্যামিনো নাইট্রোজেন, নিম্ন অনুপাতের সোডিয়াম-পটাসিয়াম, উচ্চ মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম, উচ্চ মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড, রক্ত চিনি ট্রিহ্যালোজ এবং রক্ত লিপিড ডাইগ্লিসারাইড।

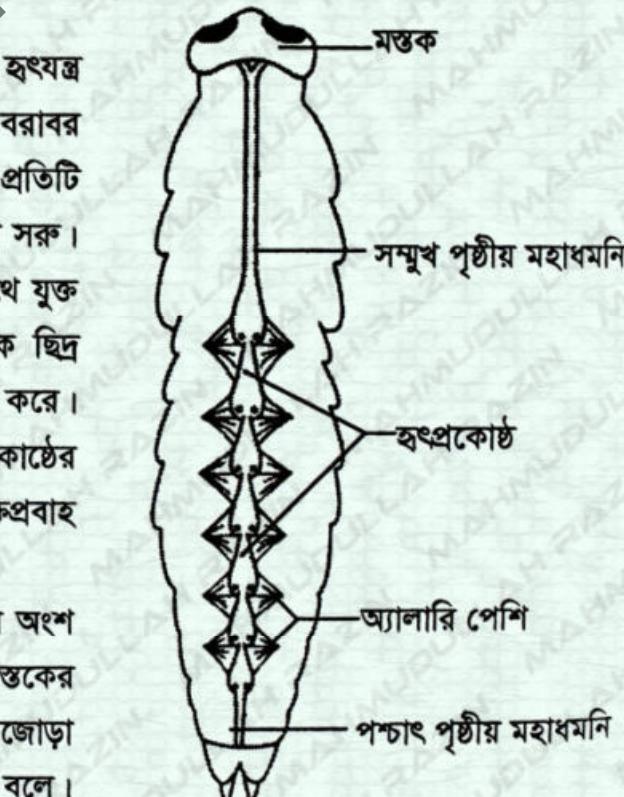
হিমোলিফের কাজ:

- এটি খাদ্যসার, রেচন পদার্থ, হরমোন ও খনিজলবণ পরিবহন করে।
- এটি সামান্য পরিমাণ CO_2 বহন করে।
- এর হিমোসাইটগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ভক্ষণ করে।
- রক্তের পানি কোষের অভিস্রবনিক ভারসাম্য রক্ষা করে।
- হিমোসাইটস রক্ত জমাট বাধা ও দেহের ক্ষত নিরাময়ে অংশগ্রহণ করে।

৩। হৃৎযন্ত্র (Heart)

ঘাসফড়িংয়ের হিমোসিলের পৃষ্ঠদেশে টার্গামের নিচে 7 প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎযন্ত্র অবস্থিত। এর প্রাচীর পেশিবছুল। এটি দেহের মধ্য-পৃষ্ঠারেখা বরাবর পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে মন্তক হতে পায় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। হৃৎযন্ত্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ফানেল সদৃশ্য। এদের পশ্চাত অংশ চওড়া এবং সম্মুখ অংশ ক্রমশ সরু। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এর সরু অংশ দ্বারা অগ্রবর্তী প্রকোষ্ঠের চওড়া অংশের সাথে যুক্ত থাকে। সংযুক্ত স্থানের উভয় পার্শ্বে একটি করে অস্টিয়া (ostia) নামক ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্র দিয়ে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের সরু প্রান্তের শীর্ষে একটি ছিদ্র থাকে। হৃৎযন্ত্রে সকল প্রকোষ্ঠের ছিদ্রসমূহ অন্তর্বাহী কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় হৃৎযন্ত্রে একমূখ্য রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত হয়।

হৃৎযন্ত্রের প্রথম প্রকোষ্ঠটির সম্মুখভাগ ক্রমশ সরু হয়ে একটি নলাকার অংশ গঠন করে। একে পৃষ্ঠীয় মহাধমনি (dorsal aorta) বলে। এটি মন্তকের সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পার্শ্বভাগে একজোড়া ত্রিভূজাকৃতির পেশি যুক্ত থাকে। এদের অ্যালারি পেশি (alary muscle) বলে। এদের মাধ্যমে হৃৎযন্ত্র দেহপ্রাচীরের সাথে যুক্ত থাকে।



চিত্র ২.২.১৩ ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া

ঘাসফড়িংয়ের হৃৎযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সক্ষেত্রে প্রসারণ ক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ সক্ষেত্র-প্রসারণ প্রক্রিয়া দেহের পশ্চাত্প্রান্ত হতে শুরু হয় এবং সম্মুখ প্রান্তে শেষ হয়। ঘাসফড়িংয়ের হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে 100 থেকে 110 বার। ঘাসফড়িংয়ের দেহে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতভাবে সংঘটিত হয়-

- (১) অ্যালারি পেশিসমূহের সক্ষেত্রে ফলে রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস হতে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে।
- (২) এসময় হৃৎযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলোর প্রসারণের ফলে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস হতে হৃৎযন্ত্রের গহরে প্রবেশ করে।

(৩) হৃৎস্ত্রের সকল প্রকোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হলে এর শেষ প্রকোষ্ঠ হতে একটি ধারাবাহিক সঙ্কোচনী টেউ সামনের প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে ধাবিত হয়।

(৪) ফলে রক্ত পৃষ্ঠীয় মহাধমনির মাধ্যমে মন্তকের সাইনাসে প্রবেশ করে।

(৫) এরপর রক্ত পশ্চাত্মুখী হয়ে পেরিভিসেরাল সাইনাস ও শেষে পেরিনিউরাল সাইনাসে প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়।

(৬) অ্যালারি পেশির কার্যকারিতায় রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে এবং চত্বরে পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

বক্ষ আন্তঃপ্রকোষ্ঠ ছিদ্র



উন্মুক্ত আন্তঃপ্রকোষ্ঠ ছিদ্র

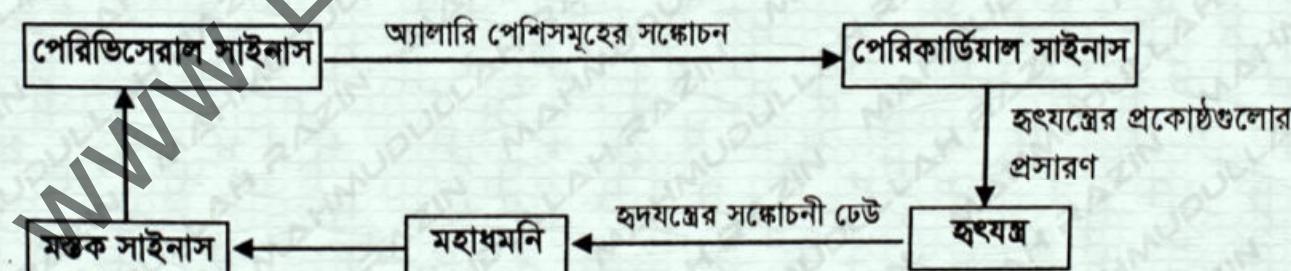


চিত্র ২.২.১৪ (ক) হৃৎস্ত্রের প্রসারণ ও (খ) হৃৎস্ত্রের সঙ্কোচন

ঘাসফড়িংয়ের সমগ্র দেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।



চিত্র ২.২.১৪ ঘাসফড়িংয়ের দেহাভ্যন্তরে রক্তপ্রবাহ



চিত্র ২.২.১৫ ঘাসফড়িংয়ের রক্তপ্রবাহের গতিপথ

সিলোম ও হিমোসিলের মধ্যে পার্থক্য

সিলোম

- মেসোডার্ম উত্তৃত পেরিটোনিয়াম আবরণ দ্বারা পরিবৃত্ত দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালীর মধ্যবর্তী সিলোমিক তন্ত্রপূর্ণ গহ্বরকে সিলোম বলে।
- সিলোম দেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গে প্রসারিত হয় না।
- সিলোম রক্ত সংবহনত্ত্বের অংশ গঠন করে না।

হিমোসিল

- মেসোডার্ম উত্তৃত পেরিটোনিয়াম আবরণ দ্বারা পরিবৃত্ত দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালীর মধ্যবর্তী রক্তপূর্ণ সিলোমকে হিমোসিল বলে।
- হিমোসিল দেহের সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়।
- হিমোসিল রক্ত সংবহনত্ত্বের অংশ গঠন করে।

৪। সিলোমে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না।	৪। হিমোসিলে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
৫। অ্যানেলিডা ও কর্ডিটা পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।	৫। আর্ট্রোপোডা ও মোলাক্ষা পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)

যে তত্ত্ব প্রাণিদেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময় প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সে তত্ত্বকে শ্বসনতন্ত্র বলে। ঘাসফড়িংয়ের রক্তে কোনো শ্বসন রঞ্জক না থাকায় এদের রক্ত দ্বারা কোনো শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় না। ট্রাকিয়া নামক এক ধরনের সূক্ষ্ম শ্বসন নালিকা এবং এদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন সরাসরি ঘাসফড়িংয়ের দেহকোষে প্রবেশ করে এবং দেহকোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড একই পথে দেহ হতে নির্গত হয়।

ঘাসফড়িংয়ের শ্বসন কার্য সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া এবং এদের শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্রকে ট্রাকিয়ালতন্ত্র (tracheal system) বলে। ঘাসফড়িংয়ের ট্রাকিয়ালতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

- (১) স্পাইরাকল বা শ্বাসরক্ত (Spiracle): 10 জোড়া,
- (২) ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি (Tracheae): অসংখ্য,
- (৩) বায়ু থলি (Air sacs): অসংখ্য,
- (৪) ট্রাকিওল কোষ বা প্রাণীয় কোষ (Tracheole cell): অসংখ্য
- (৫) ট্রাকিওল (Tracheole): অসংখ্য।

নিম্নে এদের বর্ণনা করা হলো-

১। স্পাইরাকল বা শ্বাসরক্ত (Spiracle)

এগুলো ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্নত ছিদ্রপথ। ঘাসফড়িংয়ের দেহের উভয় পার্শ্বে মোট 10 জোড়া স্পাইরাকল সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত। এদের মধ্যে 2 জোড়া বক্ষীয় অঞ্চলে এবং 8 জোড়া উদর অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিটি স্পাইরাকল ডিম্বাকার ছিদ্র বিশেষ। এগুলো পেরিট্রিম (peritreme) নামক কাইটিন নির্মিত বেড় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। স্পাইরাকলগুলোর মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত পরিস্রাবণ্যস্ত্র থাকায় ধূলোবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। বক্ষ অঞ্চলের স্পাইরাকলগুলো সরাসরি ট্রাকিয়ায় যুক্ত হয়। কিন্তু উদরের স্পাইরাকলগুলো ট্রাকিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি অ্যাট্রিয়াল প্রকোষ্ঠে (atrial chamber) যুক্ত হয়। পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকার সাহায্যে স্পাইরাকলগুলো খোলা বা বন্ধ করা হয়।

কাজ: স্পাইরাকল দিয়ে দেহে বায়ু প্রবেশ করে। এরা ধূলোবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদির প্রবেশ রোধ করে।

২। ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি (Tracheae)

প্রতিটি স্পাইরাকল দেহের ভেতরের দিকে স্থিতিস্থাপক কিউটিকল নির্মিত নালির সাথে যুক্ত থাকে। এদের ট্রাকিয়া বলে। ট্রাকিয়াগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেহাভ্যন্তরে জালিকাকারে বিস্তৃত থাকে। ট্রাকিয়াগুলো তৃকের অঙ্গঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদের কিউটিকল নির্মিত অঙ্গঃপ্রাচীরকে ইন্টিমা (intima) বলে। ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরস্থ গহ্বর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এ গহ্বরে কিছুটা পর পর ইন্টিমা পুরু হয়ে আংটির মতো বলয় গঠন করে। এদের টিনিডিয়া (taenidia) বলে। টিনিডিয়া থাকার কারণে ট্রাকিয়া কখনও চুপসে যায় না। ঘাসফড়িংয়ের দেহে ট্রাকিয়াগুলো জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও এদের মধ্যে প্রধান কতগুলো নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপস্থিতভাবে সজ্জিত থাকে। এদের ট্রাকিয়াল কাও (trachial trunk) বলে। মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাও থাকে যারা দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়। যেমন-

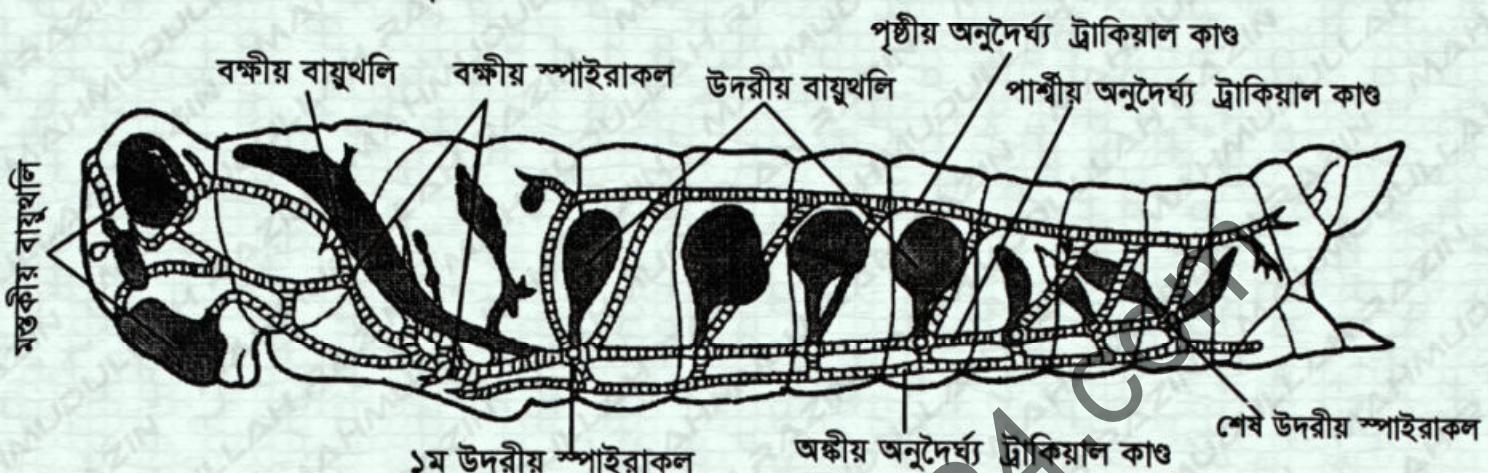
- একজোড়া পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাও (lateral longitudinal tracheal trunk)
- একজোড়া পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাও (dorsal longitudinal tracheal trunk) এবং
- একজোড়া অক্ষীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাও (ventral longitudinal tracheal trunk)।



চিত্র ২.২.১৬ ঘাসফড়িংয়ের একটি স্পাইরাকল

দেহের প্রতিপার্শ্বে বিদ্যমান পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাও থেকে পৃষ্ঠীয় ও অক্ষীয় দিকে কতগুলো অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাও সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অক্ষীয় ট্রাকিয়াল কাওকে সংযুক্ত করে।

কাজ : ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসন গ্যাস পরিবহন করে।



৩। ট্রাকিওল কোষ (Tracheole cell)

চিত্র ২.২.১৭ ঘাসফড়িংয়ের শ্বসনতন্ত্র

ট্রাকিয়াগুলো অতি সূক্ষ্ম শাখায় বিভক্ত হয়ে সবশেষে একটি বহুভজাকৃতির কোষে পরিসমাপ্তি ঘটায়। এসব কোষকে ট্রাকিওল কোষ বা প্রাণীয় কোষ বলে। অন্যান্য প্রাণিকোষের ন্যায় এসব কোষও প্লাজমারিলি, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গগুলি নিয়ে গঠিত।

কাজ : ট্রাকিওল কোষ থেকে ট্রাকিওল সৃষ্টি করে।

৪। বায়ুথলি (Air sac):

ঘাসফড়িং এর শ্বসনতন্ত্রের বিশেষত্ব হলো এদের কতগুলো ট্রাকিয়া প্রসারিত হয়ে পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট বৃহদাকৃতির বায়ুথলি গঠন করে। এগুলো সমগ্র দেহে অবস্থান করে।

কাজ: বায়ু থলিগুলো অতিরিক্ত বায়ু ধরে রাখে। শ্বসনের সময় উদরের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এরা ট্রাকিয়ালতন্ত্রে বায়ু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। ট্রাকিওল (Tracheole)

ট্রাকিওল কোষ থেকে কতগুলো সূক্ষ্ম, সরু ও প্রায় ১ মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট নালি বের হয়ে দেহকোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এসব নালিকে ট্রাকিওল বলে। এদের প্রাচীর ইন্টিমা ও টিনিডিয়া বিহীন। ট্রাকিওলগুলোর দেহকোষ সংলগ্ন অংশ শাখাবিত্ত এবং এদের প্রান্তভাগ বন্ধ থলির মতো। এ থলিসমূহ ট্রাকিওল রস (tracheol sap) নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। ট্রাকিওল রসপূর্ণ ট্রাকিওলের প্রান্তগুলোকে প্রাণীয় থলি (end sac) বলে।

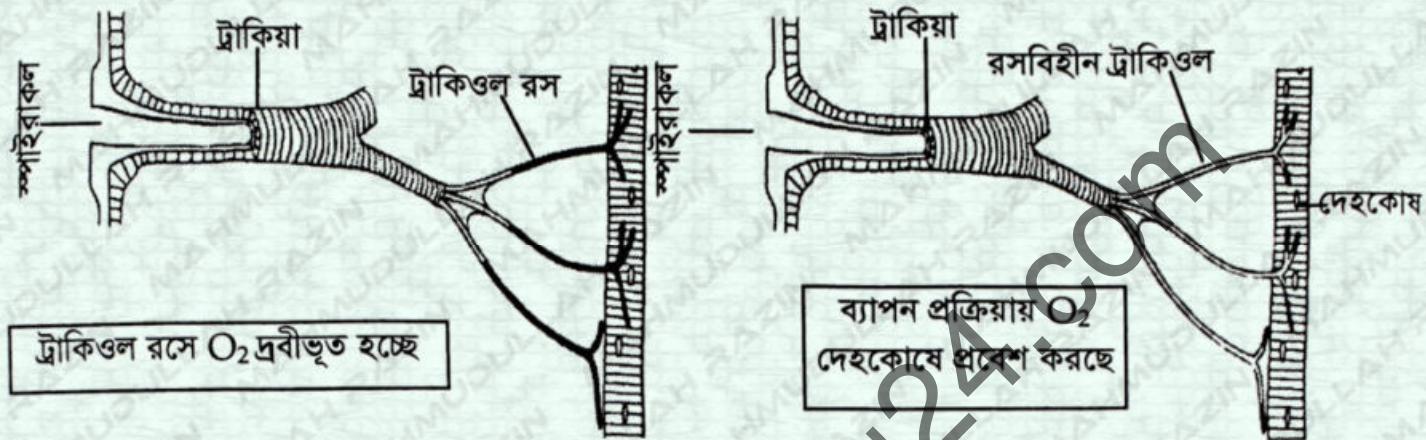
কাজ : শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) বিনিয়য়ে ট্রাকিওল রস প্রধান ভূমিকা পালন করে।

শ্বাস কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের রক্তে কোনো শ্বসনরঞ্জক না থাকায় ট্রাকিয়ালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসে। এদের শ্বাসগ্রহণ (প্রশ্বাস) ও শ্বাসত্যাগ (নিঃশ্বাস) উভয় প্রক্রিয়াই স্পাইরাকল বা শ্বাসরক্তের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এদের প্রথম বক্ষীয় ও প্রথম উদরীয় স্পাইরাকল সর্বদা উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু অন্যান্য সকল স্পাইরাকল শ্বাসগ্রহণের সময় খোলে এবং শ্বাসত্যাগের সময় বন্ধ হয়ে যায়।

(ক) শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration): শ্বাসগ্রহণ একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। বক্ষীয় ও উদরীয় পেশির প্রসারণের ফলে দেহখণ্ডগুলোর প্রসারণ ঘটে এবং সাথে সাথে ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরের আয়তন বৃক্ষি পায়। এসময় শ্বাসরক্ত দিয়ে O_2 সমৃদ্ধ বায়ু দ্রুত ট্রাকিয়াতে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিওলের প্রাণীয় থলিতে বিদ্যমান ট্রাকিওল রসে O_2 বিমুক্ত করে। ট্রাকিওল রস থেকে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহকোষে পৌছায়।

(খ) শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration): শ্বাসত্যাগ একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। দেহকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্টি CO_2 ব্যাপন পদ্ধতিতে ট্রাকিওল রসে আসে এবং সেখানে থেকে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। বক্ষীয় ও উদরীয় পেশির শিথিল বা শুথনের ফলে দেহখণ্ডকগুলোর সঙ্কোচন ঘটে এবং সাথে সাথে ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরের আয়তন হ্রাস পায়। এসময় ট্রাকিয়া থেকে CO_2 সমৃদ্ধ বায়ু শ্বাসরক্ত দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যায়। নিঃশ্বাসের সময় খুব অল্প পরিমাণ CO_2 দেহ হতে নিষ্কাস্ত হয়। কোমে উৎপন্ন অধিকাংশ CO_2 ই রক্তের প্লাজমা দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ব্যাপন পদ্ধতিতে দেহতল দ্বারা নিষ্কাস্ত হয়।



চিত্র ২.২.১৮ ঘাসফড়িংয়ের শ্বাস কৌশল
ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রাকিয়া	ট্রাকিওল
১। অবস্থান	স্পাইরাকল থেকে সৃষ্টি হয়ে সমগ্র দেহে জালিকার মতো বিস্তৃত থাকে।	ট্রাকিয়াল কোষ থেকে সৃষ্টি হয়ে সরাসরি দেহকোষের সংস্পর্শে আসে।
২। আকার	ট্রাকিয়া বৃহদাকার, ব্যাস প্রায় 2.5 মাইক্রোমিটার।	ট্রাকিওল ক্ষুদ্রাকার, ব্যাস 1 মাইক্রোমিটার-এর চেয়ে কম।
৩। প্রাচীর	ট্রাকিয়ার প্রাচীর পুরু, ইন্টিমা ও টিনিডিয়া থাকায় বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায় না।	ট্রাকিওলের প্রাচীর পাতলা, ইন্টিমা ও টিনিডিয়া বিহীন হওয়ায় তরলশূন্য অবস্থায় চুপসে যায়।
৪। উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি	ট্রাকিয়া স্পাইরাকল থেকে সৃষ্টি হয়ে ট্রাকিওল কোষে পরিসমাপ্তি ঘটে।	ট্রাকিওলগুলো ট্রাকিওল কোষ থেকে সৃষ্টি হয়ে দেহকোষের সংস্পর্শে পরিসমাপ্তি ঘটে।
৫। কাজ	ট্রাকিয়া স্পাইরাকল থেকে ট্রাকিওল কোষ পর্যন্ত O_2 ও CO_2 পরিবহন করে।	ট্রাকিওলগুলো ট্রাকিওল কোষ থেকে দেহকোষ পর্যন্ত O_2 ও CO_2 পরিবহন করে।

রেচনতন্ত্র (Excretory System)

যে প্রক্রিয়ায় আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্টি নাইট্রোজেনফটিত বর্জ্য দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) বলে। যেসব অঙ্গ দ্বারা রেচন কার্য সম্পাদিত হয় তাদের রেচন অঙ্গ বলে। অন্যান্য পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংয়ের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো ম্যালপিজিয়ান নালিকা। তবে ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ এস্টি, নেফ্রোসাইট এবং কিউটিকল অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

প্রধান রেচন অঙ্গ

ঘাসফড়িংয়ের প্রধান রেচন অঙ্গের নাম ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)। আবিক্ষারক ইতালিয়ান বিজ্ঞানী **Marcello Malpighi** (1628-1694)-এর নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে। ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকনালির মেসেন্টেরন ও প্রোটোডিয়ামের সংযোগস্থলে সৃষ্টি সূতার মতো হলুদ বর্ণের প্রায় 100 টি ম্যালপিজিয়ান নালিকা অবস্থান করে। ঘাসফড়িংয়ের ম্যালপিজিয়ান নালিকা নেফ্রিডিয়াল ধরনের (nephridial type) অর্থাৎ প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকার একপ্রান্ত স্টিকিনালির সাথে যুক্ত এবং অন্যপ্রান্ত হিমোসিলে মুক্ত ভাসমান অবস্থায় থাকে।

নালিকার ভাসমান প্রান্তটি বন্ধ প্রকৃতির এবং সংযুক্ত প্রান্তটি খোলা থাকে। প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রায় 25 মিলিমিটার লম্বা এবং প্রায় এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত ফাঁপা, নলিকার ও শাখাবিহীন অঙ্গ। নালিকার অভ্যন্তরের ফাঁপা গহ্বরকে লুমেন (lumen) বলে। লুমেনের অঙ্গরাত্র গ্রাহণ এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। এসব কোষের এক পার্শ্বে অসংখ্য সিলিয়া থাকে যেগুলো নালিকার লুমেনে ত্রাশ বর্ডার (brass border) গঠন করে। নালিকার বহিপ্রাটোর যোজক কলা ও অনুদৈর্ঘ্য পেশিতস্ত নির্মিত ভিত্তি পর্দা দিয়ে গঠিত।

ম্যালপিজিয়ান নালিকার কাজ:

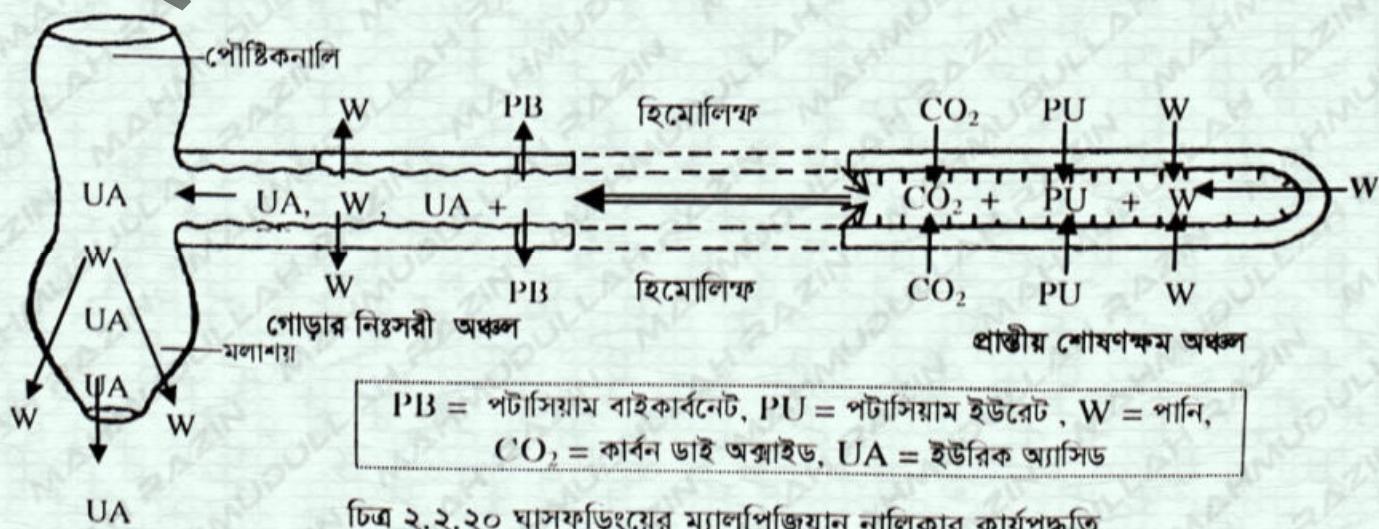
- এসব নালিকা হিমোসিলের হিমোলিফ হতে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে অঙ্গে প্রেরণ করে।
- এরা দেহের অসমোরেগুলেশনে ভূমিকা পালন করে।



চিত্র ২.২.১৯ ঘাসফড়িংয়ের (ক) ম্যালপিজিয়ান নালিকা, (খ) ম্যালপিজিয়ান নালিকার প্রস্তুত্যেদ

কার্য পদ্ধতি/রেচন পদ্ধতি

রেচন কাজের জন্য প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ার ও প্রান্তীয় অংশ ভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত। এদের গোড়ার অংশ নিঃসরণ বা ক্ষরণের অন্য এবং প্রান্তীয় অংশ শোষণের জন্য অভিযোজিত। এ নালিকার বন্ধ প্রান্তীয় অংশ দ্বারা হিমোসিলের হিমোলিফ থেকে পটাসিয়াম ইউরেট, পানি ও CO_2 শোষিত হয়। নালিকার অভ্যন্তরে এগুলো পরিবর্তিত হয়ে পটাসিয়াম বাই কার্বনেট ও ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। নালিকার গোড়ার অংশ দ্বারা পটাসিয়াম বাই কার্বনেট ও কিছু পানি পুনঃশোষিত হয়ে হিমোলিফে ফিরে আসে। রেচন বর্জ্যকূপে ইউরিক অ্যাসিড পানির সাথে পৌষ্টিকনালিল গহ্বরে প্রবেশ করে। পশ্চাত অঙ্গের মলাশয়ে অধিকাংশ পানি পুনঃশোষিত হয় এবং প্রায় শক্ত ইউরিক অ্যাসিড মলের সাথে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ঘাসফড়িংয়ের রেচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো-



চিত্র ২.২.২০ ঘাসফড়িংয়ের ম্যালপিজিয়ান নালিকার কার্যপদ্ধতি

অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ

১। ইউরেট কোষ (Urate cells): ঘাসফড়িংয়ের হিমোসিলে অসংখ্য চর্বিকোষ থাকে। এসব চর্বিকোষের মধ্যে কিছু সংখ্যক কোষ হিমোসিল থেকে রেচনবর্জ্য গ্রহণ করে এবং ইউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে আজীবন কোষাভ্যন্তরে জমা রাখে। রেচনবর্জ্য বহনকারী এসব চর্বিকোষকে ইউরেট কোষ বা ইউরোসাইটস বলে।

২। ইউরিকোজ গ্রন্থি (Uricose glands): পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের মাশরক্ত গ্রন্থির সাথে বিদ্যমান এক ধরনের সরু ও সদা গ্রন্থি থাকে যারা হিমোসিল থেকে রেচনবর্জ্য সংগ্রহ করে ইউরিক অ্যাসিডে নিজ দেহে জমা রাখে। এসব গ্রন্থিকে ইউরিকোজ গ্রন্থি বলে। সঙ্গমের সময় এসব গ্রন্থির সঞ্চিত রেচনবর্জ্য শুকাণুর সাথে বাইরে নিষ্কিণ্ড হয়।

৩। নেফ্রোসাইট (Nephrocytes) : এগুলো পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃৎযন্ত্রের সাথে অথবা চর্বির সাথে অবস্থিত সারিবদ্ধ বিশেষ ধরনের কোষ যারা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে এবং রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

৪। কিউটিকল (Cuticle) : দেহের কিউটিকল নির্মিত বহিরাবরণ সৃষ্টির সময় কিছু রেচন বর্জ্য এতে জমা হয় এবং মোল্টিং বা খোলস ত্যাগের সময় পরিত্যাক্ত হয়।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান বডির মধ্যে পার্থক্য

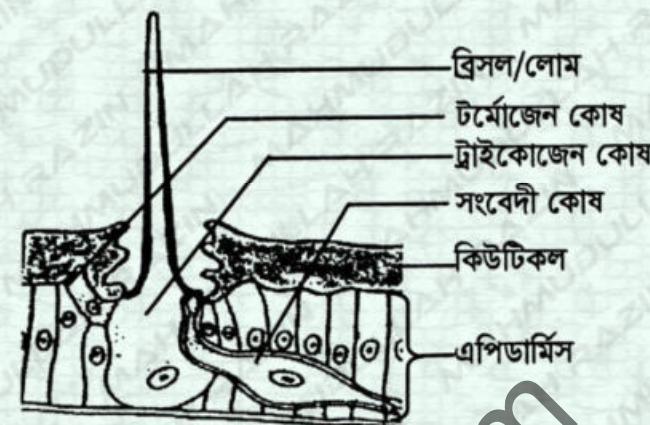
পার্থক্যের বিষয়	ম্যালপিজিয়ান নালিকা	ম্যালপিজিয়ান বডি
১। প্রকৃতি	ঘাসফড়িংসহ সকল পতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গ।	মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গের অংশ।
২। অবস্থান	প্রাণীর অন্ত্রের প্রাচীরে গুচ্ছকারে অবস্থান করে।	প্রাণীর বৃক্কের নেফ্রনে এককভাবে অবস্থান করে।
৩। সংখ্যা	অল্প, প্রতি ঘাসফড়িংয়ে প্রায় ১০০টি।	অধিক, মানুষের দুই বৃক্কে প্রায় ২০ লক্ষ।
৪। গঠন	সূক্ষ্ম সূতার মতো, নলাকার; এপিথেলিয়াম আবরণ ও ভিত্তি পর্দা নিয়ে গঠিত।	গোলাকার; কাপের মতো বোম্যানস ক্যাপসুল এবং কৈশিকজালিকার পিণ্ড হোমেরুলাস নিয়ে গঠিত।
৫। সংযুক্তি	এর একপ্রাত হিমোসিলে মুক্ত থাকে, অন্যপ্রাত অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে।	এর একপ্রাত নেফ্রনের প্রক্রিমাল প্যাচানো নালিকার সাথে এবং অন্যপ্রাত রক্তনালিকার সাথে যুক্ত থাকে।
৬। কার্যপদ্ধতি	হিমোসিলে বিদ্যমান হিমোলিফ থেকে রেচনবর্জ্য সংগ্রহ করে পৌষ্টিকনালিতে প্রেরণ করে।	রক্ত থেকে সূক্ষ্ম ছাঁকনের মাধ্যমে রেচনবর্জ্যসহ অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে নেফ্রন নালিকায় প্রেরণ করে।

ঘাসফড়িংয়ের সংবেদী অঙ্গ (Sensory organs of Grasshopper)

প্রাণিদেহের যেসব অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপনা যেমন-স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ, তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা ইত্যাদি গৃহীত হয়ে স্বায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে সেসব অঙ্গকে সংবেদী অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। ঘাসফড়িংয়ের নিম্নলিখিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায়-

- ১। ফটোরিসেন্টর বা আলোকসংবেদী অঙ্গ (Photoreceptors): মন্তকে অবস্থিত পুঞ্জাক্ষি ও ওসেলোস।
- ২। থিগমোরিসেন্টর বা স্পর্শ সংবেদী অঙ্গ (Thigmoreceptors): দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান ত্রিসিল ও রোম।
- ৩। অলফ্যাটোরিসেন্টর বা গন্ধ সংবেদী অঙ্গ (Olfactoreceptors): অ্যান্টেনায় বিদ্যমান রোম।
- ৪। গ্যাস্টাটোরিসেন্টর বা স্বাদ সংবেদী অঙ্গ (Gastatoreceptors): ম্যাঙ্গিলারি পাল্প ও স্যাবিয়ামে বিদ্যমান রোম।
- ৫। থার্মোরিসেন্টর বা তাপ সংবেদী অঙ্গ (Thermoreceptors): পায়ের ১ম তিনটি টার্সাসের গোড়ায় বিদ্যমান প্লাস্টিলি প্যাড এবং অ্যান্টেনার কিছু রোম।
- ৬। কর্ডোটোনাল রিসেন্টর বা শ্রবণ সংবেদী অঙ্গ (Chordotonal receptors): পায় সারকিতে বিদ্যমান রোম।

ফটোরিসেন্টর বা আলোকসংবেদী অঙ্গ ছাড়া উপরোক্ত সকল সংবেদী অঙ্গই তুকের এপিডার্মিসে অবস্থিত এবং এরা সকলেই এপিডার্মিসের কতগুলো রূপান্তরিত কোষ 'সেনসিলি' (বহুচন-sensillae, একচন-sensilla) দ্বারা গঠিত। একটি সেনসিলাতে একটি সংবেদী কোষ (sensory cell), একটি ট্রাইকোজেন কোষ (trichogen cell) এবং কয়েকটি টর্মোজেন কোষ (tormogen cell) থাকে। স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধ সংবেদী অঙ্গে সেনসিলা এককভাবে থাকে কিন্তু শব্দ ও তাপ সংবেদী অঙ্গে চিত্র ২.২.২১ ঘাসফড়িংয়ের একটি সেনসিলা সেনসিলা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।



চিত্র ২.২.২১ ঘাসফড়িংয়ের একটি সেনসিলা

ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষি

মন্তকের দুপার্শে অবস্থিত দুটি বৃক্কাকার গঠন নিয়ে ঘাসফড়িংয়ের আলোকসংবেদী অঙ্গ গঠিত। এদের পুঞ্জাক্ষি বা জটিল চক্ষু (compound eyes) বলে। ঘাসফড়িং এর প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি প্রায় 2000 ষড়ভূজাকৃতির দর্শন একক বা সরল চোখ নিয়ে গঠিত। এদের প্রতিটিকে ওমাটিডিয়াম (একচন-ommatidium, বহুচন-ommatidia) বলে। পুঞ্জাক্ষিতে বিদ্যমান প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের।

ঘাসফড়িং এর একটি আদর্শ ওমাটিডিয়াম

একটি ওমাটিডিয়াম 10টি অংশ নিয়ে গঠিত। নিম্নে ওমাটিডিয়ামের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো-

১। কর্নিয়া (Cornea): ওমাটিডিয়ামের সর্ব বাহিরের স্বচ্ছ, কিউটিকল নির্মিত, দ্বি-উত্তল ও ষড়ভূজাকৃতির অকোষীয় আবরণীকে কর্নিয়া বলে। এর মাধ্যমে আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে।

২। কর্নিয়াজেন কোষ (Corneagen cells): কর্নিয়ার নিচে পাশাপাশি অবস্থিত একজোড়া চ্যাপ্টা আকৃতির কোষকে কর্নিয়াজেন কোষ বলে। এসব কোষ নিঃসৃত রস থেকে কর্নিয়া গঠিত হয়।

৩। ক্রিস্টালাইন কোন কোষ (Crystalline cone cells): কর্নিয়াজেন কোষের নিচে চারটি লম্বাকৃতির কোষ বিদ্যমান। এদের ক্রিস্টালাইন কোন কোষ বলে। এসব কোষ নিঃসৃত রস দ্বারা ক্রিস্টালাইন কোন গঠিত হয়।

৪। ক্রিস্টালাইন কোন (Crystalline cone): ক্রিস্টালাইন কোন কোষসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বচ্ছ, প্রতিসরণশীল, মোচাকৃতির অংশকে ক্রিস্টালাইন কোন বলে। এর মাধ্যমে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়।

৫। আইরিশ আবরণ (Iris sheath): কর্নিয়াজেন কোষ এবং ক্রিস্টালাইন কোন কোষগুলো একটি কালো বর্ণের আবরণী দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। একে আইরিশ আবরণ বলে। মৃদু ও তীব্র আলোয় এ আবরণ যথাক্রমে সঙ্কোচিত ও প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠনকে প্রভাবিত করে।

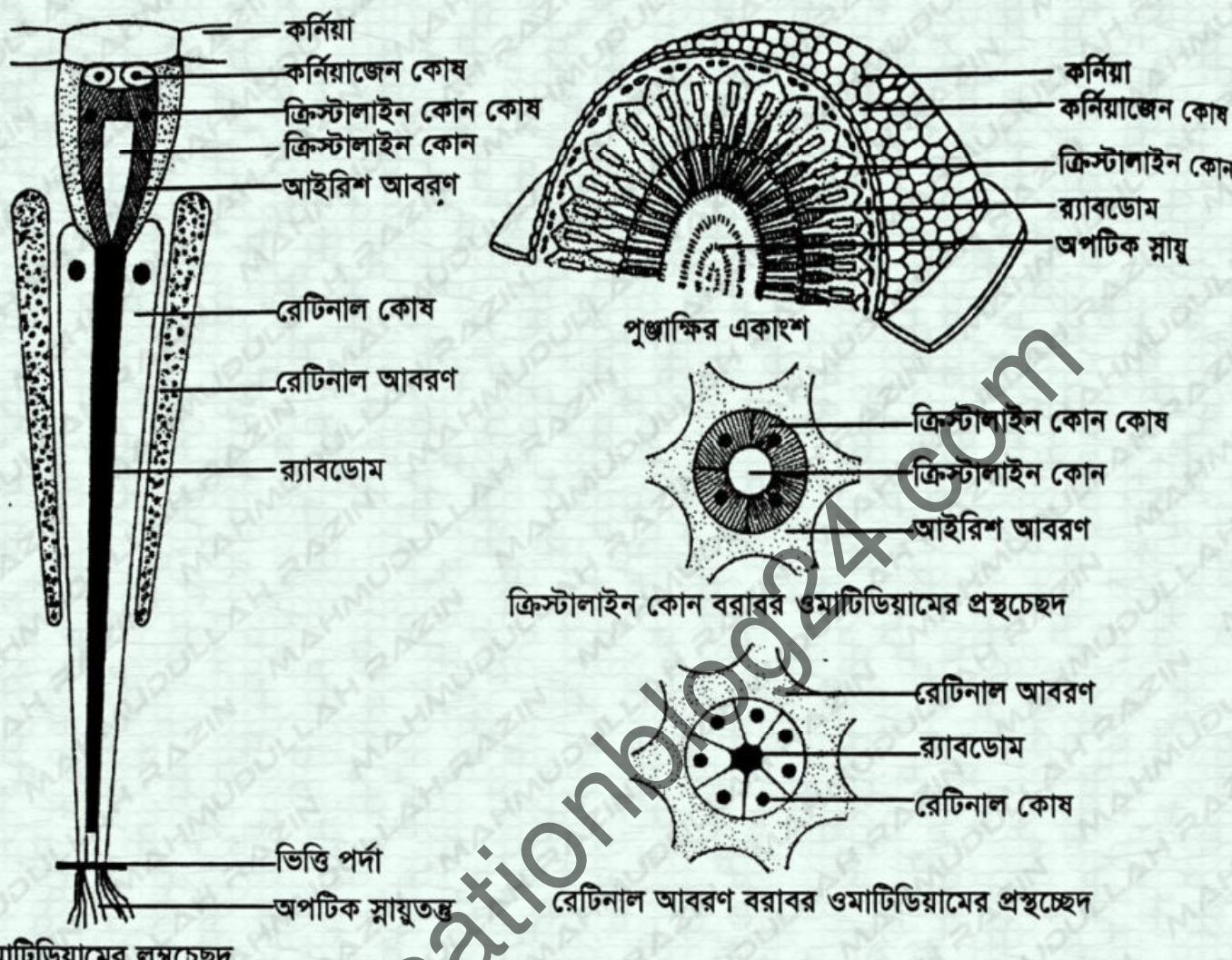
৬। রেটিনাল কোষ (Retinal cells): ক্রিস্টালাইন কোন কোষগুলোর নিচে 7/8 টি কোষ বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকে। এদের রেটিনাল কোষ বলে। একোষগুলো অত্যাধিক লম্বা। এসব কোষ নিঃসৃত রস র্যাবডোম গঠন করে।

৭। র্যাবডোম (Rhabdome): রেটিনাল কোষ দ্বারা পরিবৃত্ত দণ্ডাকৃতির, স্বচ্ছ ও লম্বা গঠনকে র্যাবডোম বলে। এটি মূলত রেটিনাল কোষসমূহের কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসেবে অবস্থান করে। র্যাবডোমে বস্তর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

৮। রেটিনাল আবরণ (Retinal sheath): রেটিনাল কোষগুলোকে পরিবেষ্টন করে একটি কালো বর্ণের আবরণ থাকে, একে রেটিনাল আবরণ বলে। আলোর তীব্রতা অনুযায়ী এটি সঙ্কোচিত-প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।

৯। ভিত্তি পর্দা (Basement membrane): ওমাটিডিয়ামের নিম্নপ্রান্ত একটি পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে, একে ভিত্তি পর্দা বলে। সকল ওমাটিডিয়া ভিত্তি পর্দার উপর অবস্থান করে।

১০। স্নায়ুতন্ত্র (Nerve fibre): প্রতিটি রেটিনাল কোষ থেকে স্নায়ুতন্ত্র বের হয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত থাকে। এরা ওমাটিডিয়ামে সৃষ্টি প্রতিবিম্বকে মন্তিক্ষে প্রেরণ করে।



চিত্র ২.২.২৭ ঘাসফড়িংয়ের পুঞ্জাক্ষি ও ওমাটিডিয়াম

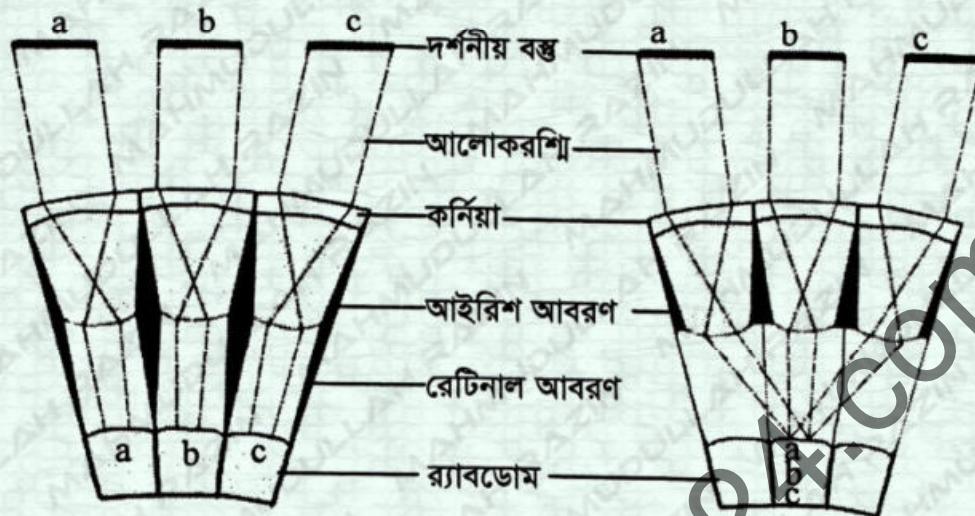
দর্শন কৌশল-১ : তীব্র বা উজ্জ্বল আলোয়

তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িংয়ের চোখে কোনো দর্শনীয় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে অ্যাপজিশন বা মোজাইক প্রতিবিম্ব (aposition or mosaic image) বলে। তীব্র আলোতে আইরিশ আবরণী ও রেটিনুলার আবরণী অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোন কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আগত কেবল উলমিক আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টালাইন কোন হয়ে র্যাবডোমে প্রবেশ করে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তর্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া ভেদ করলেও আইরিশ ও রেটিনাল অবিচ্ছিন্ন আবরণী কর্তৃক শোষিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সূস্পষ্ট (a, b, c পৃথক র্যাবডোমে) প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। তীব্র বা উজ্জ্বল আলোয় এ ধরনের দর্শন কৌশলকে অ্যাপজিশন দর্শন (aposition vision) বলে।

দর্শন কৌশল-২: মৃদু বা স্তম্ভিত আলোয়

মৃদু বা স্তম্ভিত আলোতে ঘাসফড়িংয়ের চোখে কোনো দর্শনীয় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (supper position image) বলে। মৃদু বা স্তম্ভিত আলোতে রেটিনাল আবরণ ও আইরিশ আবরণ সঙ্কেচিত হয়ে যথাক্রমে ভিত্তি পদ্মা ও কর্নিয়ার দিকে অপসারিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের অধিকাংশ অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আগত উলমিক রশ্মিগুলো নির্দিষ্ট ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মধ্যে দিয়ে সরাসরি র্যাবডোমে পৌছায়। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তর্যক রশ্মিগুলো পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং অন্য র্যাবডোমে পৌছায়। ফলে কোনো একটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর একাধিক বিন্দু থেকে আগত আলোকরশ্মি পতিত হয়ে একটি র্যাবডোমে

পৌছায় এবং সম্পূর্ণ বস্তুটির একটি অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা (a, b, c একই র্যাবডোমে) প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। স্থিমিত আলোয় এ ধরনের দর্শন কৌশলকে সুপারপজিশন দর্শন (super position vision) বলে।



উজ্জ্বল আলোয় দর্শন কৌশল

স্থিমিত আলোয় দর্শন কৌশল

চিত্র ২.২.২৩ ঘাসফড়িংয়ের দর্শন কৌশল

সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব ও অ্যাপজিশন প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব	অ্যাপজিশন প্রতিবিম্ব
১। আলোর অবস্থা	মৃদু বা স্থিমিত আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	টৈত্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
২। রঞ্জক আবরণী	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী সংকোচিত হয়।	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী প্রসারিত হয়।
৩। আলোকরশ্মি	ত্বরিক ও উলিদিক উভয় আলোকরশ্মি ও মাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	কেবল উলিদিক আলোকরশ্মি ও মাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৪। প্রতিবিম্বের ধরন	বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

প্রজনন ও রূপান্তর (Reproduction and Metamorphosis)

প্রজনন (Reproduction)

ঘাসফড়িং একলিঙ্গ প্রাণী। এদের সুস্পষ্ট যৌন বিরূপতা দেখা যায় অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংকে বাহ্যিকভাবে আলাদা করা যায়।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১। আকার	পুরুষ ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট।	স্ত্রী ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
২। উদর	পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদর সরু।	স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর কিছুটা প্রশস্ত।
৩। জননছিদ্র	পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৯ম খণ্ডাংশে পুঁজনন ছিদ্র বিদ্যমান।	স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৮ম ও ৯ম খণ্ডাংশে মিলে জননছিদ্র গঠন করে।
৪। নবম খণ্ডকের স্টার্নাম	পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত হয়ে সাবজেনিটাল প্লেট গঠন করে যা উক্ত খণ্ডকের শেষে বিদ্যমান জনন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।	স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ ওভিপজিটর (ovipositor) গঠন করে।

প্রজননতন্ত্র (Reproductive organ)

ঘাসফড়িং যৌন প্রজননের মাধ্যমে বৎশবৃক্ষি করে। এদের পুঁ ও স্ত্রী জননতন্ত্র আলাদা দেহে অবস্থান করে। নিম্নে ঘাসফড়িংয়ের স্ত্রী ও পুঁ জননতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

স্ত্রীজননতন্ত্র (Female reproductive organ): ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনিনালি, শুক্রধানী বা স্পার্মাথিকা ও সহায়ক গ্রাহক নিয়ে ঘাসফড়িংয়ের স্ত্রীজননতন্ত্র গঠিত।

১। **ডিম্বাশয় (Ovary):** একজোড়া ডিম্বাশয় একটি মিডিয়ান লিগামেন্ট (median ligament) দ্বারা উদর গহ্বরের পৃষ্ঠ প্রাচীরে যুক্ত থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় ৬-৮টি একক অণুডিম্বাশয় বা ওভারিওল (ovarioles) সমন্বয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়ে ডিম্বাশু সৃষ্টি হয় এবং সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

২। **ডিম্বনালি (Oviduct):** প্রতিটি ডিম্বাশয়ের অণুডিম্বাশয়গুলো গোড়ার অংশ দ্বারা একত্রে মিলিত হয়ে একটি ডিম্বনালি গঠন করে।

৩। **যোনি (Vagina):** দুপাশের দুটি ডিম্বনালি মিলিত হয়ে দেহের ৭ম উদরীয় খঙকে একটি পেশিবছল যোনি গঠন করে। এটি একটি স্ত্রী জননছিদ্রের মাধ্যমে ওভিপজিটর দ্বারা দেহের বাইরে যুক্ত হয়।

৪। **শুক্রধানী (Spermatheca):** যোনির নিচের দিকে একটি কুণ্ডলিকৃত শুক্রধানী যুক্ত থাকে। এতে সঙ্গমে গৃহীত শুক্রাশু সাময়িকভাবে জমা থাকে।

৫। **সহায়ক গ্রাহক (Accessory gland):** প্রতিটি ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একটি সহায়ক গ্রাহক বা কোলেটেরিয়াল গ্রাহক (collateral gland) থাকে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে উন্মুক্ত হয়। এ গ্রাহক থেকে নিঃসৃত আঠালো তরল ডিমকে গুচ্ছাবদ্ধ রাখে।

পুঁজননতন্ত্র (Male reproductive organ): শুক্রাশয়, শুক্রনালি, ক্ষেপন নালি, সহায়ক গ্রাহক ও শুক্রথলি নিয়ে ঘাসফড়িংয়ের পুঁজননতন্ত্র গঠিত।

১। **শুক্রাশয় (Testis):** একজোড়া শুক্রাশয় যুগ্মভাবে একটি মিডিয়ান লিগামেন্ট (median ligament) দ্বারা তয় থেকে ৫ম দেহ খঙকের উদর গহ্বরের পৃষ্ঠ প্রাচীরে যুক্ত থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় অসংখ্য ফলিকুল গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। ফলিকুলে শুক্রাশু সৃষ্টি হয়।

২। **শুক্রনালি (Vas deferens):** প্রতিটি শুক্রাশয়ের অক্ষীয় দিকে হতে একটি লম্বা ও পাঁচানো নালি যুক্ত থাকে। একে শুক্রনালি বলে।

৩। **ক্ষেপন নালি (Ejaculatory duct):** দুপাশের দুটি শুক্রনালি দেহের নবম উদরীয় খঙকে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ ক্ষেপন নালি গঠন করে। এটি পুঁ সঙ্গম অঙ্গ লিঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে যুক্ত হয়।

৪। **সহায়ক গ্রাহক (Accessory gland):** লম্বা নালিগুচ্ছ সমন্বিত একজোড়া সহায়ক গ্রাহক ক্ষেপন নালিতে উন্মুক্ত হয়। এসব গ্রাহক থেকে ক্ষরিত তরলে শুক্রাশু নিমজ্জিত থাকে এবং পুষ্টি গ্রহণ করে।

৫। **শুক্রথলি (Seminal vesicle):** সহায়ক গ্রাহক সাথে একটি দীর্ঘ পাঁচানো নালিকা বা শুক্রথলি ক্ষেপন নালিতে উন্মুক্ত হয়। এতে শুক্রাশু সম্মিলিত থাকে এবং প্রজননের সময় ক্ষেপন নালিতে প্রবেশ করে।



চিত্র ২.২.২৪ ঘাসফড়িংয়ের স্ত্রীজননতন্ত্র



চিত্র ২.২.২৫ ঘাসফড়িংয়ের পুঁজননতন্ত্র

যৌন মিলন বা সঙ্গম (Copulation): গ্রীষ্মের শেষ দিকে ঘাসফড়িংয়ের যৌন মিলন বা সঙ্গম সম্পন্ন হয়। এসময় একটি পুরুষ ঘাসফড়িং একটি স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের পিঠের উপর উঠে স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরে এবং তার শিশু স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে শুক্রাদার থেকে শুক্রাণু স্পার্মাটোফোরন্কপে স্থানান্তর করে। ডিম পাড়ার পূর্বে কয়েকবার যৌন মিলন সংঘটিত হয়ে থাকে।

নিষেক (Fertilization): যৌন মিলনে প্রাণী শুক্রাণু স্ত্রীর শুক্রধারণীতে জমা থাকে এবং এগুলো দ্বারা ডিমগুগুলো নিষিক্ত হয়। ঘাসফড়িংয়ের ডিমগুগুলো ৩-৫ মিলিমিটার লম্বা হয়। ডিমগুগুলো মেটালেসিথাল ধরনের অর্ধাং কুসুম কেন্দ্রে থাকে। পরিণত ডিম ডিম্বনালি দিয়ে বের হয়ে আসার সময় নরম ভাইটেলিন পর্দা (vitelline membrane) ও নমনীয় খোলস কোরিয়ন (chorion) দ্বারা আবৃত হয়। শুক্রধারণীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুক্রাণু ডিমে বিদ্যমান মাইক্রোপাইল (micropyle) ছিঁড়ি দিয়ে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসটি ডিমের নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে।

ডিম পাড়া (Oviposition): যৌন মিলনের কিছুক্ষণ পরেই এদের ডিম পাড়া শুরু হয় এবং বেশ কয়েকদিন এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। স্ত্রী ঘাসফড়িং তার ওভিপজিটর দ্বারা মাটিতে একটি ছোট টানেল বা গর্ত করে। এ গর্তে এরা গুচ্ছাকারে প্রায় 20টি ডিম পাড়ে এবং একটি স্ত্রী ঘাসফড়িং দশটি গুচ্ছে প্রায় 200টি ডিম পাড়ে।

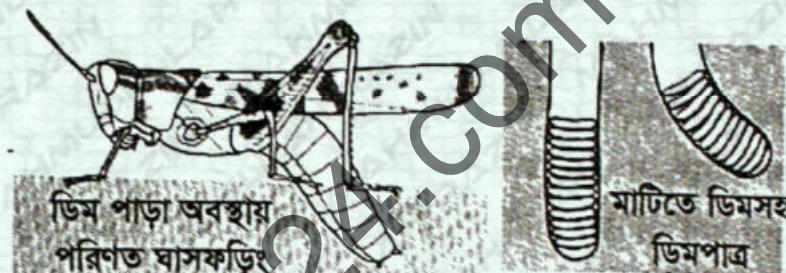
দেহ নিঃসৃত এক ধরনের আঠালো পদার্থ দ্বারা গঠিত একটি ডিম-পাত্রে (egg-pod) ডিমগুগুলো সংক্ষিপ্ত থাকে। ঘাসফড়িং শরৎকাল পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যৌন মিলন ও ডিম পাড়ার কিছুদিন পর পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং মারা যায়।

জনীয় পরিস্কৃতন (Embryonic development): নিষিক্ত ডিমের ভেতর জনের পরিস্কৃতন ঘটে। অনুকূল পরিবেশে প্রায় তিনি সপ্তাহব্যাপী জনের পরিস্কৃতন ঘটে। এরপর শীতের আগমনে কম তাপমাত্রার প্রতিকূল পরিবেশে জনের বৃদ্ধি রহিত হয়। এ অবস্থাকে ডায়াপোজ (dipause) বলে। পুরো শীতকাল এরা ডায়াপোজ অবস্থায় অতিক্রম করে। ডায়াপোজ ঘাসফড়িংয়ের বিশেষ এক ধরনের অভিযোগন যার ফলে এদের শিশুগুগুলো প্রতিকূল পরিবেশের প্রচল শীত ও ঝাড়াভাবের হাত হতে রক্ষা পায়।
বসন্তের শুরুতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পরিস্কৃতনের অনুকূল পরিবেশে এদের বাকী জনীয় পরিস্কৃতন সম্পন্ন হয় এবং ডিম থেকে শিশু ঘাসফড়িং বের হয়ে আসে। নবজাতক ঘাসফড়িংকে নিফ (nymph) বলে। নিফ দেখতে অনেকটা পরিণত ঘাসফড়িংয়ের মতোই তবে এরা আকারে ছোট, ডানা বিহীন, মন্তক দেহের তুলনায় বড় এবং অসম্পূর্ণ প্রজনননত্র সম্মুদ্ধ।

ক্লিপাস্টর (Metamorphosis)

কোনো প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশা ও পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাকলে প্রাথমিক দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছাতে যেসব দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে ক্লিপাস্টর বলে। পতঙ্গ, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি প্রাণীতে ক্লিপাস্টর দেখা যায়। ক্লিপাস্টর দুপ্রকার-

সম্পূর্ণ ক্লিপাস্টর (Complete metamorphosis): শিশু প্রাণী যখন দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয় এবং এদের বিকাশের সময় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ ক্লিপাস্টর বলে। এক্ষেত্রে শিশু প্রাণীকে লার্ভা (Larva) বলে। মৌমাছি, প্রজাপতিতে সম্পূর্ণ ক্লিপাস্টর দেখা যায়।



চিত্র ২.২.২৬ ঘাসফড়িংয়ের ডিম পাড়া



চিত্র ২.২.২৭ ঘাসফড়িংয়ের অসম্পূর্ণ ক্লিপাস্টর

অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis): শিশু প্রাণী যখন দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখায় এবং এদের বিকাশের সময় খুব সীমিত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এক্ষেত্রে শিশু প্রাণীকে নিষ্ফ (Nymph) বলে। আরশোলা ও ঘাসফড়িংয়ে অসম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায়।

ঘাসফড়িংয়ের নিষ্ফ সবুজ উভিদ থেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধিকালীন সময়ে এদের দেহের কাইটিন নির্মিত অনমণীয় খোলসাটি বারবার পরিত্যাক্ত হয়। এ ধরনের খোলস ত্যাগকে নির্মোচন বা মোল্টিং (moultling) বলে। এসময় এদের ডানা গজায় এবং প্রজননতন্ত্র বিকশিত হয়। নিষ্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গে পরিণত হতে ঘাসফড়িংয়ের প্রায় 2 মাস সময় লাগে এবং মোট পাঁচ বার নির্মোচন ঘটে। দুটি নির্মোচনের মধ্যবর্তী দশাকে ইনস্টার (instar) বলে। ঘাসফড়িংয়ের নিষ্ফ হতে পূর্ণাঙ্গ দশায় পরিণত হতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। ঘাসফড়িংয়ের রূপান্তরের সময় নিষ্ফের যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলো হলো:

- দেহের আকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; □ দেহ ক্রমশ সবুজ বর্ণ ধারণ করে; □ ডানা গজায় এবং □ জননাঙ্গ পরিপন্থ হয়।

রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িংয়ের দেহে চার ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রহি বিদ্যমান। এগুলো হলো- ইন্টারসেরিব্রাল গ্রাহিকোষ (intercerebral gland cells), প্রোথোরাসিক গ্রহি (prothoracic glands), কর্পোরা অ্যালাটা (corpora allata) এবং কর্পোরা কার্ডিয়াকা (corpora cardiaca)। এদের মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রহি ক্ষরিত হরমোন প্রাণীর রূপান্তরে মুখ্য ভূমিকা রাখে। রূপান্তরের শুরুতে মন্তিক্ষের ইন্টারসেরিব্রাল গ্রাহিকোষ থেকে প্রোথোরাকেটোফিক হরমোন (prothocotrophic hormone) ক্ষরিত হয়ে প্রোথোরাসিক গ্রহিকে একডাইসন হরমোন (ecdysone hormone) ক্ষরণে উদ্বৃত্তিত করে। একডাইসন হরমোন ক্ষরিত হলে প্রাণীর নির্মোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ হরমোন দেহের কোষ-কলাকে বৃদ্ধির জন্য উদ্বৃত্তিত করে। একই সময়ে কর্পোরা অ্যালাটা গ্রহি থেকে জুভেনাইল হরমোন (juvenile hormone) ক্ষরিত হয় যা দেহের অশ্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিহত করে। প্রকৃতপক্ষে জুভেনাইল হরমোনের প্রভাবে ঘাসফড়িংয়ের নিষ্ফ দশা দীর্ঘ হয়। এক সময় কর্পোরা অ্যালাটার কার্যক্রম রহিত হয় এবং একডাইসন হরমোনের প্রভাবে প্রাণীর দ্রুত নির্মোচন ঘটে এবং রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়।

নিষ্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িংয়ের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিষ্ফ	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং
১। আকার	তুলনামূলক ছোট।	তুলনামূলক বড়।
২। ডানা	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৩। দেহ বর্ণ	ফ্যাকাশে বাদামী।	সবুজ।
৪। জননাঙ্গ	অপরিণত থাকে।	পরিণত থাকে।
৫। মোল্টিং	ঘটে।	ঘটে না।

□ প্রকৃতিতে দুধরনের ঘাসফড়িং দেখা যায়- লম্বা শুঙ্গযুক্ত (অ্যাটেনা) ঘাসফড়িং ও খাটো শুঙ্গযুক্ত ঘাসফড়িং।

□ ঘাসফড়িং দিনের বেলায় সক্রিয়, যদিও এদের অনেকে রাতে খাবার গ্রহণ করে। অধিকাংশ প্রজাতির ঘাসফড়িং একাকি বাস করে। কিছু অভিপ্রয়ানি ঘাসফড়িংয়ের লক্ষ লক্ষ সদস্য একত্রে ঝাঁক বাধে। সাধারণত একক ঘাসফড়িং মানুষের ফসলের তেমন কোনো ক্ষতি করে না যদিও এরা প্রতিদিন এদের দেহের ওজনের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ঘাস-পাতা ভক্ষণ করে। কিন্তু এরা যখন ঝাঁক বাধে বা সোয়ার্ম গঠন করে তখন মাঠের পর মাঠের ফসল ধ্বংস করে।

□ আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের মানুষের নিকট ঘাসফড়িং একটি প্রিয় খাবার এবং প্রোটিনের অন্যতম উৎস।

□ ঘাসফড়িংয়ের কিছু প্রজাতি আছে যারা তাদের পশ্চাত্পদেকে ডানার সাথে ঘষিয়ে বিশেষ ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে।

□ ঘাসফড়িং ধরার সময় এরা ‘টোবাকো জুস (tobacco juice)’ নামের বাদামী বর্ণের এক ধরনের রস নিষ্কেপ করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এ রস দ্বারা এরা পিপড়া ও অন্যান্য শক্তির আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করে।

অনুশীলনী

বহুবিবরচনি পত্র (নমুনা)

১. প্রাণিগতে ঘাসফড়িং কোন পর্বের অন্তর্গত?

ক. Annelida

খ. Mollusca

গ. Arthropoda

ঘ. Cnidaria

তেলাপোকার মুখছিদিকে বিরে অবস্থিত খাদ্যগ্রহণের সাথে জড়িত কিছু জটিল ধরনের গঠনকে মুখোপাঙ্গ বলে। এগুলো তেলাপোকার খাদ্যগ্রহণের সাথে অভিযোজিত। উদ্বীপকের আলোকে ৪-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

২. কোনটি ঘাসফড়িংয়ের মুখোপাঙ্গের অংশ নয়?

ক. ল্যাট্রাম

খ. ল্যাবিয়াম

গ. অ্যাটেনা

ঘ. ম্যাডিবল

৩. ঘাসফড়িংয়ের মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীর কোন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত?

ক. এপিথেলিয়াম কোষ

গ. হেপাটিক কোষ

খ. কলামনার এভোডার্মাল কোষ

ঘ. কিউটিকুলার কোষ

৪. ঘাসফড়িংয়ের মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীর কোন পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে?

ক. কিউটিকল

খ. পেরিট্রফিক

গ. এভোডার্মিস

ঘ. কলামনার

ডানের চির্বি লক্ষ কর এবং এর আলোকে ৫-৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

৫. চির্বির A চিহ্নিত অংশের নাম কি?

ক. ম্যালপিজিয়ান নালিকা

গ. রেনাল ফাইবার

খ. হেপাটিক সিকা

ঘ. মেসেন্টেরিক সিকা

৬. এগুলো পৌষ্টিকনালীর কোন অংশের সাথে যুক্ত?

ক. মেসেন্টেরনের প্রথম অংশে

খ. মেসেন্টেরনের শেষ অংশে

গ. মেসেন্টেরন ও প্রোটোডিয়ামের সংযোগস্থলে

ঘ. কোলনের প্রথম অংশে

৭. ঘাসফড়িংয়ের রক্তপূর্ণ দেহগুরুকে কি বলে?

ক. সিলোম

খ. হিমোসিল

গ. সাইটোসিল

ঘ. সিউডোসিল

৮. ঘাসফড়িংয়ের রক্ত কণিকার নাম কি?

ক. এরিথ্রোসাইট

খ. লিউকোসাইট

গ. হিমোসাইট

ঘ. থ্রোসাইট

৯. কোনটি ঘাসফড়িংয়ের রক্তের কাজ নয়?

ক. খাদ্যসার পরিবহন

খ. জীবাণু ধৰ্মস

গ. শ্বসন গ্যাস পরিবহন

ঘ. কোষের অভিস্রবণ

১০. কোনটি ঘাসফড়িংয়ের শ্বসনতন্ত্রের অংশ নয়-

ক. Spiracle

খ. Tracheae

গ. Alary muscle

ঘ. Tracheole

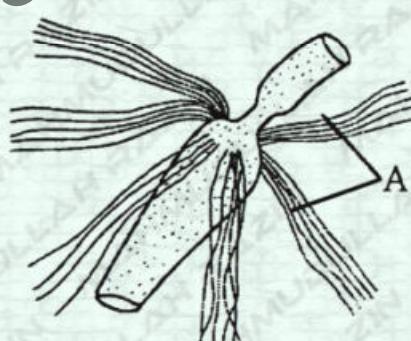
১১. কোনটি ঘাসফড়িংয়ের পুঁজননতন্ত্রের অংশ নয়-

ক. শুক্রধানী

খ. শুক্রাশয়

গ. শুক্রনালি

ঘ. শুক্রথলি



সূজনশীল পত্র (নমুনা)

১. জীববিজ্ঞানের শিক্ষক ক্লাসে পাঠ্যসূচিভূক্ত একটি পতঙ্গের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পড়াতে গিয়ে বললেন যে, এদের রেচনঅঙ্গটি অনেকগুলো সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা গঠিত। দর্শন অঙ্গটি আলোর ভিন্নতার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

(ক) ইউরেট কোষ কী?

(খ) একডাইসন হরমোন বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্বীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের প্রথম উক্তিটির গঠন বিন্যাস উল্লেখ কর।

(ঘ) উদ্বীপক অনুযায়ী শিক্ষকের দ্বিতীয় উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

অধ্যায় ৩

মানব শারীরতত্ত্ব: পরিপাক ও শোষণ

প্রাকৃতিক উৎসজাত যেসব কঠিন বা তরল বস্তু আহার বা পান করলে দেহের ক্ষয়পূরণ, ধূক্ষসাধন, কর্মশক্তি সৃষ্টি, তাপ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃক্ষি প্রভৃতি কার্যাবলি সুস্থুভাবে সম্পন্ন হয় তাদের খাদ্য বলে। খাদ্য মানবদেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে এবং স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ অসুস্থ রাখে। খাদ্যের অভাবে যেমন পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ দেখা দেয় তেমনি অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ শরীরে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে মানুষের পরিপাকতত্ত্বে খাদ্য পরিপাক এবং দেহের স্থূলতা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।



প্রধান শব্দাবলি (Key words): পরিপাক, শোষণ, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিন, সিকাম, আক্রিক রস, খাদ্যসার শোষণ, জৈব রসায়নাগার, স্থূলতা।

পিলিয়ড সংখ্যা ১১। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)-

- মুখগহনের খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
- পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংগঠিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
- যকৃতের সংক্ষয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বহিক্ষেত্র গ্রহণে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- খাদ্যত্ব পরিপাকে ক্ষুদ্রাত্মের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ক্ষুদ্রাত্মের মুমেন হতে রক্তনালিকা ও ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৃহদাত্মের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যবহারিক: পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।
- স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.১ খাদ্য পরিপাক ও শোষণ

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও কঠিন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ ও আক্রিকরণের উপযোগী উপাদানে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বা হজম (digestion) বলে। মানুষ সর্বভূক্ত প্রাণী। এদের খাদ্য তালিকায় আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি- এ ছয় ধরনের খাদ্যই অন্তর্ভুক্ত। তবে ভিটামিন, পানি ও খনিজ লবণ কোষ কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হয় বলে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল বিধায় এগুলোকে পরিপাকের প্রয়োজন হয়। মানুষ অধিকাংশ খাদ্যকে সিদ্ধ অবস্থায় খেয়ে থাকে। কারণ মানুষের পরিপাকতত্ত্ব কাঁচা খাদ্য হজমের উপযোগী নয়।

খাদ্যের প্রাত্যক্ষিক চাহিদা

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিম্নলিখিত হারে দৈনিক খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক:

খাদ্যের নাম	পরিমাণ	শারীরবৃত্তীয় কাজ
১। শর্করা	450-600 গ্রাম	কোষের বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন করা।
২। আমিষ	100-150 গ্রাম	দেহের বৃক্ষি ও ক্ষয়পূরণ, হরমোন ও এনজাইম উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করা।

৩। স্নেহ	45-50 গ্রাম	কোষ আবরণীর প্রবেশ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা। কোষ আবরণীর গাঠনিক উপাদান সৃষ্টি করা। দেহের ভবিষ্যত ব্যবহার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করা।
৪। ভিটামিন	5600 মিল্গ্রাম	দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতায় সহায়তা করা।
৫। খনিজলবণ	10 গ্রাম	দাঁত, অঙ্গ, কলা, রক্ত, পেশি ও স্নায়ুকোষের গাঠনিক উপাদান তৈরি করা; কোষ-কলা পুনরুৎপাদন করা।
৬। পানি	3000 মি.লি.	বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক অণুর সার্বজনীন দ্রাবক; দেহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

একজন সূচ্য মানুষের দেহে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হতে 24 থেকে 72 ঘন্টা সময় লাগে। খাদ্য পরিপাকের শারীরতত্ত্ব বিভিন্ন মানুষ ধরন এবং খাদ্যের আকার ও ধরনের উপর নির্ভর করে।

মানুষের বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্য পরিপাক নিম্নলিখিত ছয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

- ১। খাদ্য ও তরল পদার্থের সংগ্রালন,
- ২। দেহ নিঃস্ত বিভিন্ন পদার্থের সাথে খাদ্যের মিশ্রণ,
- ৩। জটিল প্রোটিন, লিপিড ও শর্করা খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ,
- ৪। বিভিন্ন তরল বিশেষ করে পানির পুনঃশোষণ,
- ৫। মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন- ভিটামিন K এবং বায়োটিন উৎপাদন এবং
- ৬। বর্জ্য পদার্থের বহিক্ষার।

ভাত, রংটি, আলু, চিনি প্রভৃতি শর্করা খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন শর্করা বিশ্লেষী (amylolytic) এনজাইম দ্বারা জটিল শর্করা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল গ্লুকোজ অণু গঠন করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সজি, ফল প্রভৃতি আমিষ খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন আমিষ বিশ্লেষী (proteolytic) এনজাইম দ্বারা জটিল আমিষ আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু গঠন করে। ভোজ্যতেল, ধী, মাখন, প্রাণীজ চর্বি প্রভৃতি স্নেহজ খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন স্নেহজ বিশ্লেষী (lypolitic) এনজাইম দ্বারা জটিল স্নেহজ খাদ্য আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল অণু গঠন করে।

মানব পরিপাকতত্ত্ব প্রতিদিন ভক্ষণকৃত জটিল খাদ্য দেহের গ্রহণযোগ্য সরল খাদ্যে রূপান্তর করার উপযোগী। এতে কতগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

যান্ত্রিক পরিপাক (mechanical digestion): কতগুলো সংগ্রালন ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের পরিপাক নালির ভেতরে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

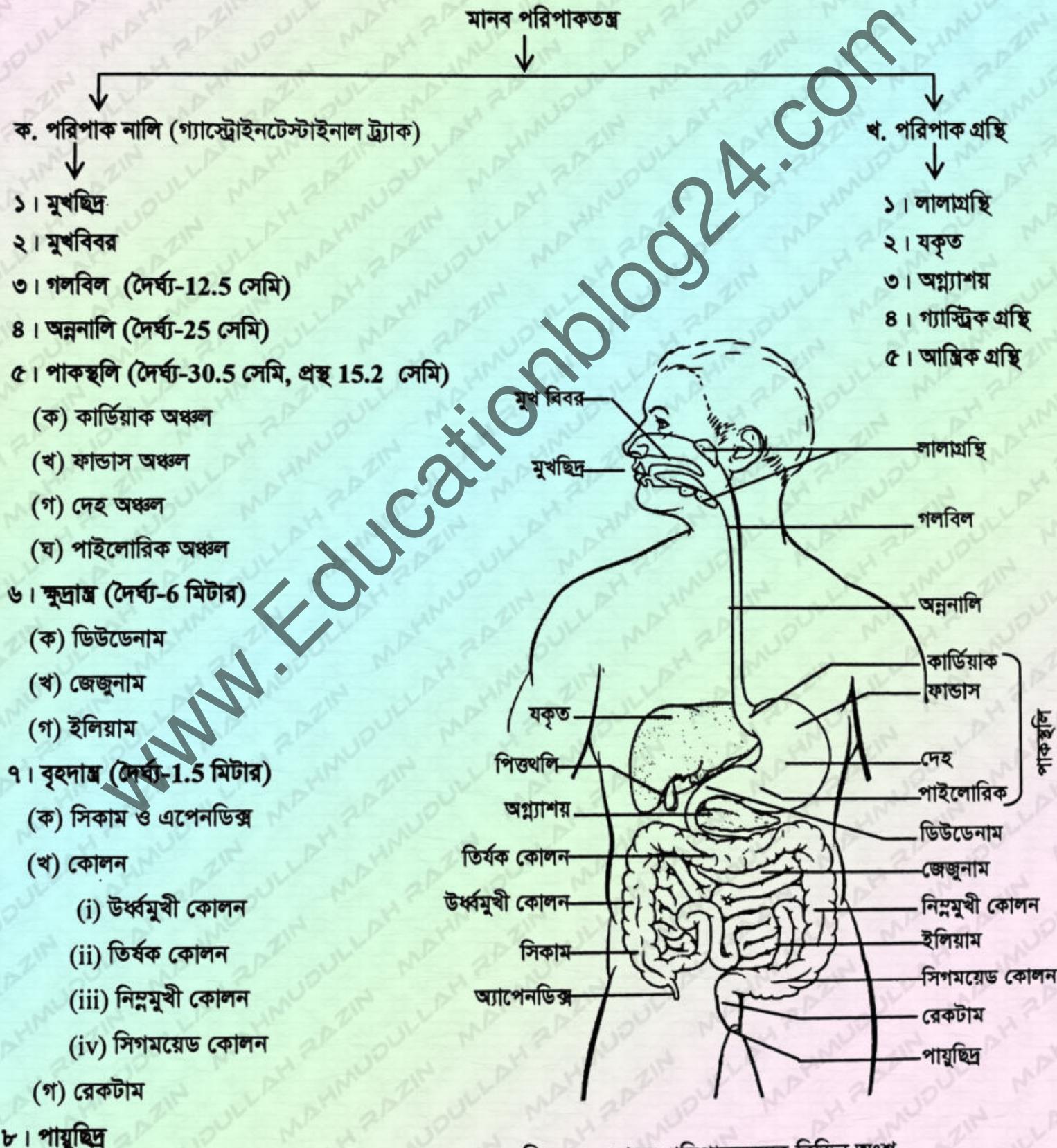
রাসায়নিক পরিপাক (chemical digestion): কতগুলো ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সরল ও গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

মানুষের বিভিন্ন রকমের খাদ্যের পরিপাকীয় চূড়ান্ত পরিণতি নিম্নরূপ:

খাদ্যের ধরন	পরিপাককারী প্রধান এনজাইম	চূড়ান্ত পরিণতি
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (ভাত, রংটি, আলু, চিনি)	অ্যামাইলোলাইটিক (amylolytic) এনজাইম (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ বা প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সজি, ফল)	প্রোটোলাইটিক (proteolytic) এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন)	অ্যামিনো অ্যাসিড
স্নেহ বা লিপিড (ভোজ্যতেল, ধী, মাখন, প্রাণীজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক (lypolitic) এনজাইম (লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ)	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

মানব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

খাদ্য পরিপাক উপযোগী কতগুলো অঙ্গ ও গ্রহিত সমন্বয়ে মানুষের পরিপাকতন্ত্র গঠিত। বেঁচে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি। আমাদের দেহ সে খাদ্যকে ডেঙে ছোট ছোট অণুতে পরিণত করে এবং অপরিপাকৃত অংশ নিষ্কাশন করে। খাদ্য পরিপাককারী অঙ্গের অধিকাংশই নলাকার এবং এর দৈর্ঘ্য বরাবর বিভিন্ন অবস্থার খাদ্য ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিপাকতন্ত্র একটি লম্বা, প্যাচানো নল যা মুখছিদ্র হতে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সংশ্লিষ্ট কতগুলো গ্রহি নিয়ে গঠিত যেগুলো পরিপাক রস বা রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। মানব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নের ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:



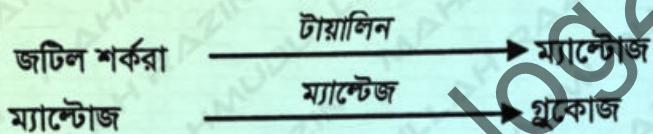
মুখবিবরে খাদ্য পরিপাক

□ যান্ত্রিক পরিপাক

খাদ্যবস্তু মুখবিবরে প্রবেশ করলে দাঁতের সাহায্যে চর্বিত হয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়। মানুষের চার ধরনের দাঁত (কর্তন, ছেদন, অঞ্চলিক ও পেষণ) খাদ্য চর্বণে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে। মুখবিবরে খাদ্যবস্তু দাঁত, জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে খাদ্য নিষ্পেষিত হয় এবং লালা মিশ্রিত হয়। জিহ্বা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে। লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রাখে। এটি খাদ্যবস্তুকে সিঞ্চ করে এবং চর্বণের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে। লালা উত্তপ্ত ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে। মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে। এছাড়া এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে। লালামিশ্রিত পিঙাকৃতির খাদ্যকে বোলাস (bolus) বলে যা জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে গলবিলের মাধ্যমে পেছনের অন্ননালিতে প্রেরিত হয়।

□ রাসায়নিক পরিপাক:

(ক) শর্করা পরিপাক: লালারসে বিদ্যমান শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম টায়ালিন ও ম্যাল্টেজ দ্বারা জটিল কিছু শর্করা ম্যাল্টোজে এবং সামান্য ম্যাল্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়।



(খ) আমিষ পরিপাক: মুখবিবরে আমিষ খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল ও নরম হয়। কিন্তু এখানে কোনো প্রোটিওলাইটিক এনজাইম না থাকায় আমিষ খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

(গ) স্নেহ পরিপাক: মুখবিবরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোনো এনজাইম থাকে না। এখানে খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে নরম হয়।

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক

□ যান্ত্রিক পরিপাক:

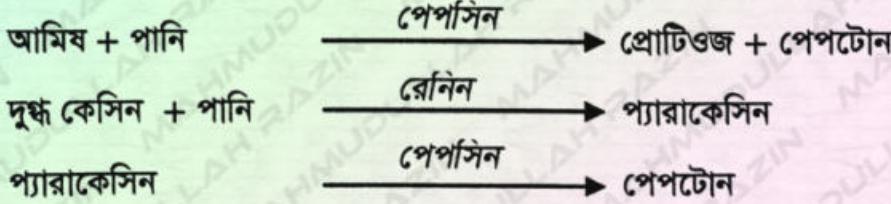
খাদ্যবস্তু অন্ননালি হতে পাকস্থলিতে প্রোগ্রেশের পর প্রতি 15-20 সেকেন্ড পর পর পাকস্থলির প্রাচীরে একটি পেরিস্ট্যালিটিক (peristaltic) সঞ্চালন প্রবাহিত হয়। এ ধরনের সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু পাকস্থলির গ্রাহণ নিঃস্ত পরিপাক রসের (gastric juice) সাথে মিশ্রিত হয় এবং নরম, পিচ্ছিল হাসপ্রাণ খাদ্যপিণ্ড কাইমে (chyme) পরিণত হয়।

পাকস্থলির পরিপাক রসে বিদ্যমান HCl দ্বারা খাদ্য জীবাণুমুক্ত এবং অস্ত্রীয় হয়। এসময় পেরিস্ট্যালিটিক সঞ্চালন মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে পাকস্থলির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কয়েকবার সামনে পেছনে সঞ্চালিত করে। এ সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু পরিপাক রসের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত হয়।

□ রাসায়নিক পরিপাক

(ক) শর্করা পরিপাক: পাকস্থলিতে শর্করা বিশ্লেষী কোনো এনজাইম থাকে না। এজন্য এখানে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না।

(খ) আমিষ পরিপাক: চিবানো ও লালা মিশ্রিত আমিষ খাদ্য পাকস্থলির গহ্বরে পৌঁছালে পাকস্থলির প্রাচীর হতে গ্যাস্ট্রিন (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রাহণ হতে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃস্ত হয় এ রসে পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম থাকে। এ দুটি নিক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক বসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে পেপসিন ও রেনিন নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অস্ত্রীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত করে। রেনিন দুষ্ফ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।



(গ) স্নেহ পরিপাক: পাকস্থলিতে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোনো এনজাইম না থাকায় এখানে এ খাদ্যের পরিপাক ঘটে না।

এ অর্ধ-পরিপাককৃত খাদ্য অল্লীয় কাইম পাকস্থলির পাইলোরিক ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রাত্মে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রাত্মে খাদ্য পরিপাক

ক্ষুদ্রাত্মে খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রাত্মে।

□ যান্ত্রিক পরিপাক:

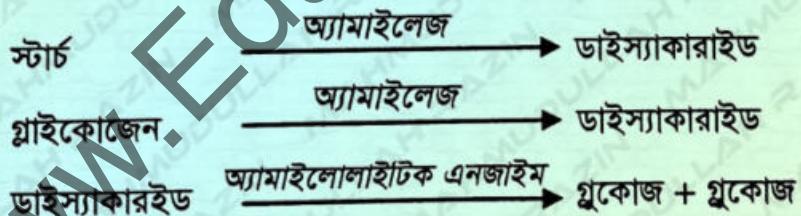
ক্ষুদ্রাত্মে খাদ্যের দুধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। প্রথমত এখানে খাদ্যের সেগমেন্টেশন (segmentation) ঘটে অর্থাৎ খাদ্য ক্ষুদ্রাত্মের সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সামনে-পেছনে সঞ্চালিত হয়। এতে আন্ত্রিক রস ও মিউকাসের সাথে খাদ্য ভালোভাবে মিশ্রিত হয়।

দ্বিতীয়ত পেরিস্ট্যালিক সঞ্চালনের (peristaltic movement) মাধ্যমে কাইম জাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রাত্মের মধ্যে ধীরভাবে প্রবাহিত হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রাত্মে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে কারণ এর ভেতর দিয়ে কাইম প্রতি মিনিটে এক সেন্টিমিটার গতিতে সঞ্চালিত হয়।

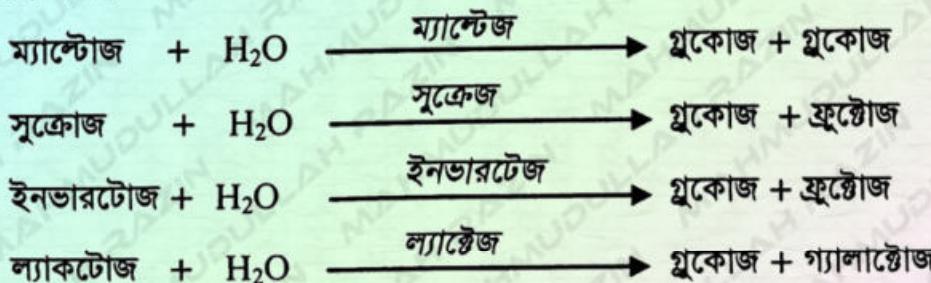
□ রাসায়নিক পরিপাক:

পাকস্থলি থেকে আগত অল্লীয় কাইমে থাকে অর্ধ পরিপাককৃত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাকৃত স্নেহ খাদ্য। অল্লীয় কাইম ক্ষুদ্রাত্মের গহ্বরে পৌছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রস্টি, অগ্ন্যাশয় ও পিণ্ডথলি থেকে যথাক্রমে আন্ত্রিকরস, অগ্ন্যাশয়রস ও পিণ্ডরস নিঃসৃত হয়ে অন্ত্রের গহ্বরের খাদ্যে মিশ্রিত হয়। ফলে অন্ত্রের ডিউডেনামে খাদ্যবস্তু আন্ত্রিকরস, অগ্ন্যাশয়রস ও পিণ্ডরস দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়। এ নিঃসরণগুলোর সকলেই ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় খুব শীঘ্রই খাদ্য অল্লীয় অবস্থা থেকে নিরপেক্ষ অবস্থায় পরিণত হয় এবং অন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি হয়।

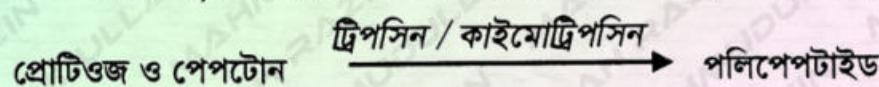
(ক) শর্করা পরিপাক: অন্ত্রের ডিউডেনামে বিদ্যমান অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় শর্করাকে ডাইস্যাকারাইড ও কিছু ডাইস্যাকারাইডকে গ্লুকোজে পরিণত করে।



অন্ত্রের ইলিয়ামের বিদ্যমান আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইমসমূহ সকল ডাইস্যাকারাইডকে নিম্নরূপে অর্দ্ধ বিশ্লেষণ করে গ্লুকোজে পরিণত করে।

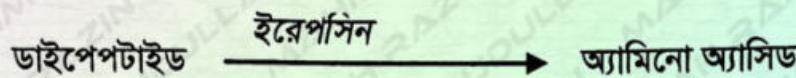


(খ) আমিষ পরিপাক: অগ্ন্যাশয় রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপ্টাইডেজ, ট্রাইপেপ্টাইডেজ, ডাইপেপ্টাইডেজ, কোলাজিনেজ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এরা আমিষ খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে-

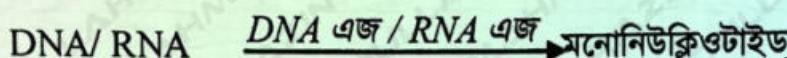


পলিপেপটাইড	<u>কার্বোক্সিপেপটাইডেজ</u>	অ্যামিনো অ্যাসিড
ট্রাইপেপটাইড	<u>ট্রাইপেপটাইডেজ</u>	অ্যামিনো অ্যাসিড
ডাইপেপটাইড	<u>ডাইপেপটাইডেজ</u>	অ্যামিনো অ্যাসিড
কোলাজেন	<u>কোলাজিনেজ</u>	অ্যামিনো অ্যাসিড

আন্তরিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ইরেপসিন থাকে। এটি ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।



ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ (DNAase) এবং রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNAase) এনজাইমের ক্রিয়ার যথাক্রমে DNA ও RNA পরিপাক হয়ে এদের মনোনিউক্লিওটাইড অণু সৃষ্টি করে।



(গ) স্নেহ পরিপাক: স্নেহ পরিপাকে যকৃত নিঃসৃত পিন্ডরস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিন্ডরসে কোনো এনজাইম থাকে না। পিন্ডরসে বিদ্যমান পিন্ডলবণ সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium taurocholate) ও সোডিয়াম টাউরোকোলেট (sodium glycocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে সাবানের ফেন্সার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন (imulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজ, ফসফেলাইপেজ ও কোলেস্টেরল এস্টারেজ থাকে। এরা স্নেহদানাকে নিম্নরূপে পরিপাক করে-

চর্বি	<u>লাইপেজ</u>	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল
ফসফেলিপিড	<u>ফসফেলাইপেজ</u>	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড
কোলেস্টেরল এস্টার	<u>কোলেস্টেরল এস্টারেজ</u>	ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল

আন্তরিক রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজ ও লেসিথিনেজ থাকে। এরা স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে-

ট্রাইগ্লিসারাইড	<u>লাইপেজ</u>	ফ্যাটি অ্যাসিড ও মনোগ্লিসারাইড
লেসিথিন	<u>লেসিথিনেজ</u>	ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড + কোলিন

খাদ্যসার শোষণ (Absorption of food)

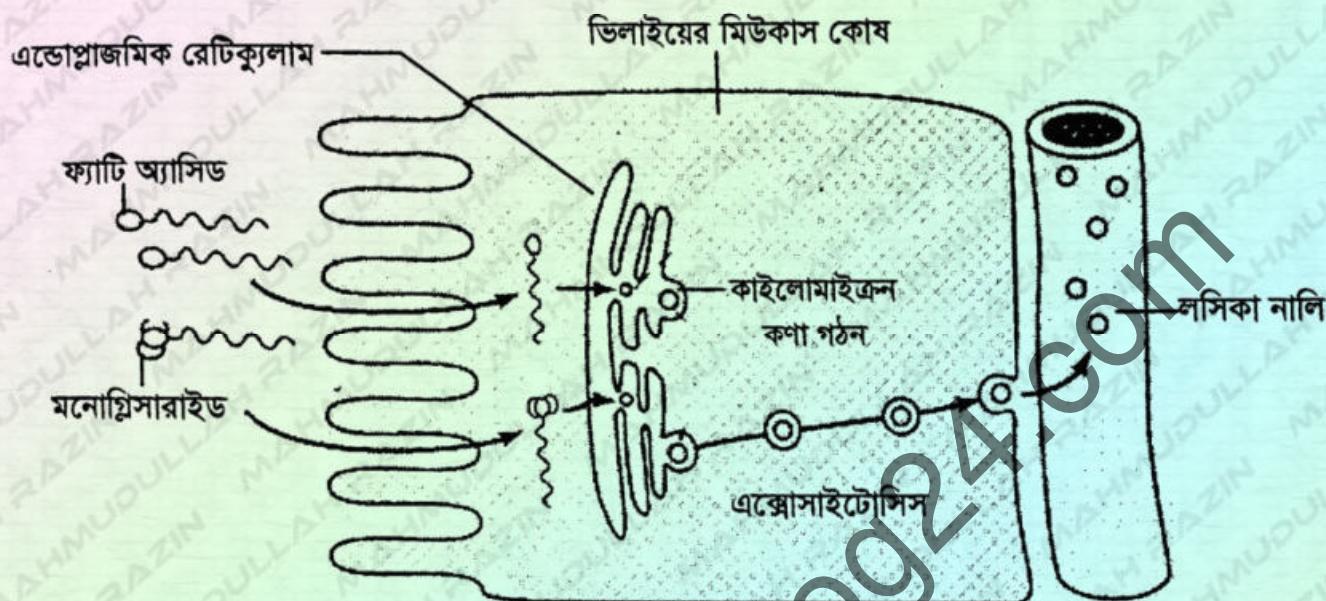
যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিপাকনালি হতে রক্তে ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে খাদ্যসার শোষণ বলে। খাদ্যসার শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপাককৃত অধিকাংশ খাদ্যসার, ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানির সাথে ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেনে সজ্জিয় পরিবহন বা ব্যাপন কিংবা এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে শোষিত হয়। এক্রতপক্ষে খাদ্যের 90% শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে, বাকী 10% সংঘটিত হয় বৃহদান্ত্র ও পাকস্থলিতে। বিভিন্ন হরমোন দ্বারা খাদ্যসার শোষণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

(ক) শর্করা শোষণ : শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে গ্লুকোজ, ফ্রুটোজ, গ্যালাট্টোজ, জাইলোজ, লেবুলোজ, ম্যানোজ প্রভৃতি সরল মনোস্যাকারাইডে পরিণত হয়। তবে অধিকাংশ শর্করাই গ্লুকোজে পরিণত হয়। Na^+ এবং ATP সহযোগে ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা শোষিত হয়। ইনসুলিন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) আমিষ শোষণ: আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ, ব্যাপন ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড শোষিত হয়। থাইরয়েড গ্রাস্টি ক্ষরিত থাইরঙ্গিন হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) লিপিড শোষণ: লিপিড জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ছিসারল, মনোগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল-এ পরিণত হয়। ক্ষুদ্রাঞ্চের ডিওডেনাম ও ইলিয়াম অংশে লিপিড শোষণ ঘটে। ছিসারল পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় সরাসরি ভিলাইয়ের প্রাচীর ভেদ করে পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে। কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া।



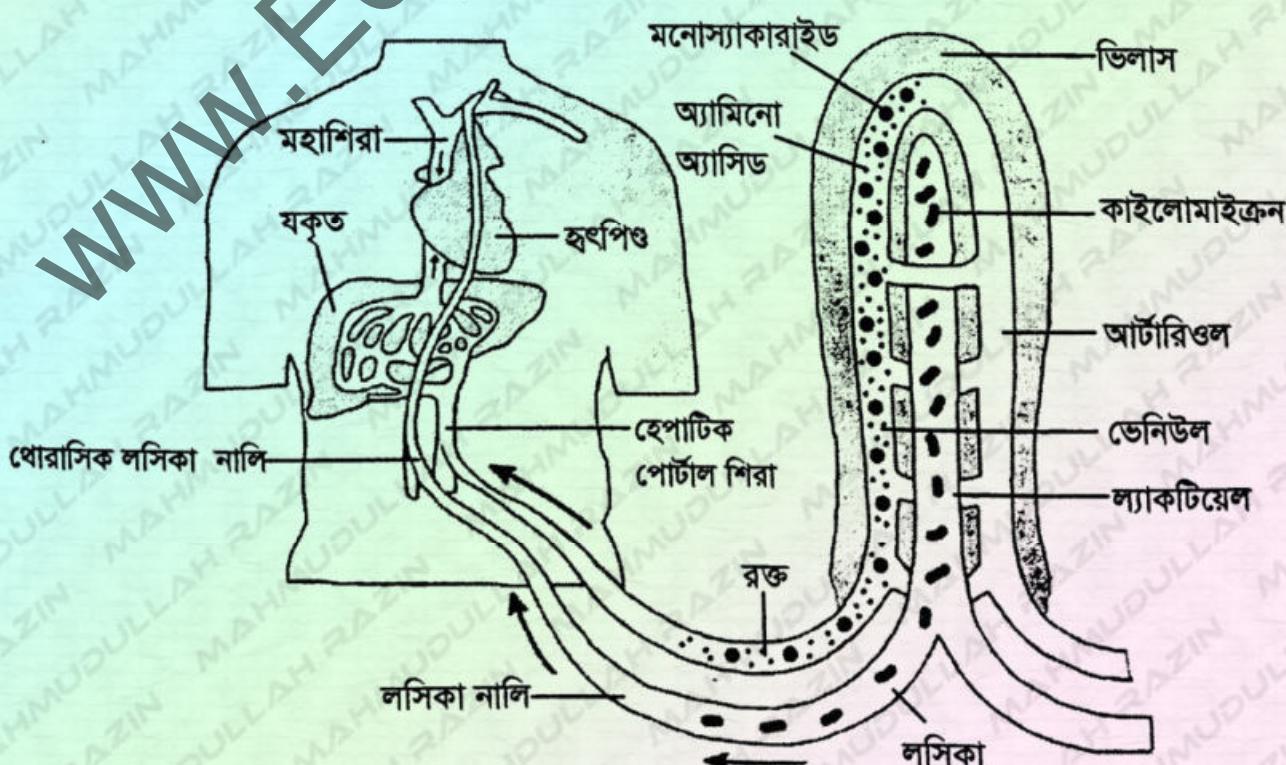
চিত্র: ৩.২ অন্তে খাদ্যসার (ফ্যাটি অ্যাসিড) শোষণ

ফ্যাটি অ্যাসিড প্রথমে থায়োকাইনেজ এনজাইমের ক্রিয়ায় সক্রিয় ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ সক্রিয় ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল ও প্রোটিন একত্রে যুক্ত হয়ে কাইলোমাইক্রন (chylomicron) কণার সৃষ্টি করে যা ভিলাইয়ের কোষ পর্দা অতিক্রম করে লসিকাবাহে প্রবেশ করে। প্রাইরয়েড অঙ্গ ক্ষরিত থাইরঙ্গিন হরমোন লিপিড শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) পানি শোষণ: ক্ষুদ্রাঞ্চের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় 200-400 মিলিলিটার পানি শোষিত হয়।

(ঙ) খনিজলবণ শোষণ: বৃহদ্রাঞ্চের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অধিকাংশ খনিজলবণ শোষিত হয়।

(চ) ভিটামিন শোষণ: ক্ষুদ্রাঞ্চের ভিলাই কর্তৃক পানি বা চর্বিতে দ্রব্যীভূত হয়ে ভিটামিন শোষিত হয়।



চিত্র: ৩.৩ অন্তের প্রাচীর (ভিলাই) থেকে রক্তনালির মাধ্যমে দেহে খাদ্যসার পরিবহন

খাদ্যসার পরিবহন: বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসার অঙ্গের ভিলাইয়ের এপিথেলিয়াল কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ভিলাসের (একবচন) অভ্যন্তরে থাকে কৈশিক জালিকা (capillaries), লসিকাতন্ত্রের ল্যাকটিয়েল (lacteal)। প্লকোজ ও অ্যামিনো অ্যাসিড ভিলাসের কোষ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিকনালিতে আসে। অতঃপর এরা হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে আসে এবং যকৃত থেকে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও হিসারল ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে। ল্যাকটিয়েল থেকে থোরাসিক লসিকা নালির (thoracic lymphatic canal) মাধ্যমে বাহিত হয়ে শিরাতন্ত্রের রক্ত প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডে আসে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

৩.২ পরিপাক প্রক্রিয়া

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের পৌষ্টিকগুলি বা পরিপাক গুলি বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগুলি বিদ্যমান, যথা- লালাঘঢ়ি, যকৃত, অঞ্চাখয়, গ্যাস্ট্রিক গুলি ও আল্ট্রিক গুলি। এসব গুলির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গুলি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আল্ট্রিক গুলি অঙ্গের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গুলিগুলি পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠন বিশিষ্ট। নিম্নে বিভিন্ন পৌষ্টিকগুলির বিবরণ দেয়া হলো:

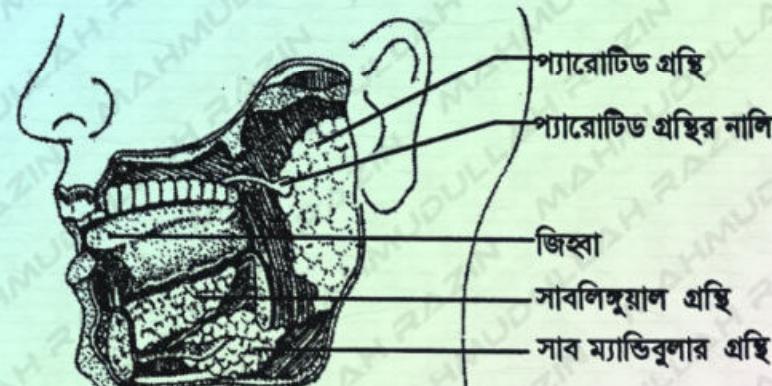
লালাঘঢ়ি (Salivary glands)

মানুষের মুখবিবরের দুপাশে ৩ জোড়া লালাঘঢ়ি বিদ্যমান। লালাঘঢ়িগুলি এপিথেলিয়াম আবৃত গোলাকার বা ডিখাকার রসনিঃসারী অসংখ্য থলি নিয়ে গঠিত। থলির প্রাচীরে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ থাকে। প্রতিটি থলি হতে একটি নালি বের হয়ে লালাঘঢ়ির মূল নালিতে যুক্ত হয়। মানুষের তিন ধরনের লালাঘঢ়ি থাকে। এগুলো হলো-

১। **প্যারোটিড গুলি (Parotid gland):** এগুলো সরচেঞ্চে বড় লালাঘঢ়ি। প্রতি কানের নিচে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গুলি বিদ্যমান। প্রতিটি গুলি থেকে একটি নালি বের হয়ে দ্বিতীয় উর্ধমোলার দাঁতের বিপরীতে ভেস্টিবিউলে (মুখবিবর) উন্মুক্ত হয়।

২। **সাবম্যানিবুলার গুলি (Submandibular gland):** প্রতি ম্যানিবুল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যানিবুলার গুলি বিদ্যমান। এ গুলির নালি জিহ্বার ফ্রেনুলামের পাশে উন্মুক্ত হয়।

৩। **সাবলিঙ্গুয়াল গুলি (Sublingual gland):** জিহ্বার নিচে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গুলি বিদ্যমান। এদের নালি জিহ্বার ফ্রেনুলামের পাশে উন্মুক্ত হয়।



চিত্র: ৩.৪ মানুষের লালাঘঢ়ি

লালা (Saliva): লালাঘঢ়ি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক 1200-1500 মিলি লালা নিঃসরণ করে। লালা ঈষৎ অল্লীয়, ফলে মুখবিবরে সর্বদা pH 6.2-6.4 মাত্রায় অল্লীয় অবস্থা বিরাজিত থাকে।

লালার উপাদান

- ১। পানি: 95.5%।
- ২। কোষীয় উপাদান: ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।
- ৩। গ্যাস: প্রতি 100 মিলি লালায় 1 মিলি অক্সিজেন, 2.5 মিলি নাইট্রোজেন এবং 50 মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
- ৪। অজ্ঞের পদার্থ: প্রায় 0.2%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫। জৈব পদার্থ: প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিওলাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লালার কাজ

১। যান্ত্রিক কাজ: লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রেখে কথা বলতে সহায়তা করে। এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বনের সময় লুট্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে। লালা উত্পন্ন ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে। লালায় IgA এবং lysozyme থাকায় এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে।

২। খাদ্য পরিপাক: লালায় শর্করা পরিপাককারী টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম থাকে। এরা জটিল শর্করাকে সরলে পরিণত করে।

৩। রেচন: কিছু ক্ষতিকর বর্জ্য যেমন- ইউরিয়া, ভারী ধাতু (Hg, Pb, As), থায়োসায়ানেট, মরফিন, অ্যান্টিবায়োটিক, ইথাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি লালার মাধ্যমে দেহ হতে রেচিত হয়।

৪। স্বাদ গ্রহণ: স্বাদ হলো এক ধরনের রাসায়নিক অনুভূতি। লালা খাদ্যের বিভিন্ন পদার্থকে দ্রবীভূত করে জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে। কম লালা নিঃসরী মানুষ ডিসজিউসিয়া (dysgeusia) রোগে ভোগে।

৫। দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা: দেহে পানিশূল্যতা দেখা দিলে লালা নিঃসরণ করে যায় এবং এতে তৎক্ষণাৎ বোধ হয়। তৎক্ষণাত্ম মানুষ পানি পান করলে দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা হয়।

৬। বাফার: লালায় বিদ্যমান বাইকার্বনেট, ফসফেট ও মিউসিন বাফার হিসেবে কাজ করে।

যকৃত (Liver)

যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রহি। প্রাণ্ডবয়স্ক পুরুষ মানুষের যকৃতের ওজন ১.৪৪-১.৬৬ কেজি (৩.২-৩.৭ পাউণ্ড)। এটি উদর গহ্বরের উপরের দিকে পাকস্তলির ডান পার্শ্বে ডায়াক্রামের ঠিক নিচে অবস্থিত। এর রঙ লালচে বাদামী এবং দেখতে কিছুটা ত্রিকোণাকার। যকৃত বামখঙ্গ (left lobes) ও ডানখঙ্গ (right lobes) নামে দুটি বড় অংশ এবং ক্যড্যাট (caudate) ও কোয়াড্রেট (quadrate) নামের দুটি ছোট অংশ নিয়ে গঠিত। এর উপরের প্রান্তটি উত্তল এবং ডায়াক্রামের সমান্তরালে অবস্থান করে। নিচের প্রান্তটি অবতল এবং পাকস্তলিকে আবৃত করে রাখে। যকৃত বাইরের দিকে গ্লিসন ক্যাপসুল (Glisson's capsule) নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যকৃতকে হেপাটিক লোবিউল (hepatic lobules) নামক অসংখ্য নামক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। প্রতিটি হেপাটিক লোবিউলে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে যাকে পরিবেষ্টন করে ষড়ভূজাকৃতির বহুসংখ্যক যকৃতকোষ অবস্থান করে। লোবিউলে অসংখ্য পিন্ডনালি ও রক্তনালি থাকে। পিন্ডনালিগুলো মিলিত হয়ে সাধারণ হেপাটিক নালি গঠন করে। এটি পিন্ডথলির সিস্টিক নালির সাথে মিলিত হয়ে সাধারণ পিন্ডনালি গঠন করে যা পুনরায় অগ্ন্যাশয় নালির সাথে অ্যাম্পুলা অব ভাটার (ampulla of vater) গঠন করে।

যকৃতের সংরক্ষণ ও বিপাকীয় ভূমিকা

মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক গ্রহি যকৃত। যকৃত থেকে পিন্ডরস নিঃস্ত হয় যা লিপিড খাদ্য পরিপাকের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এছাড়া যকৃতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এজন্য যকৃতকে মানবদেহের জৈব রসায়নাগার (organic laboratory) বলা হয়। পাকস্তলি ও অন্ত হতে সকল রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃতে খাদ্যকণা ও ওষুধ ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় যা দেহ সহজেই গ্রহণ করতে পার। যকৃত প্রায় ৫০০ ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে বলে বিজ্ঞানীগণ শনাক্ত করেছেন।

যকৃতের সংরক্ষণ ভূমিকা

১। গ্লাইকোজেন সংরক্ষণ (Storage of glycogen): রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ যকৃতে গ্লাইকোজেনের সংরক্ষণ করে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হওয়ার পদ্ধতিকে গ্লাইকোজেনেসিস (glycogenesis) বলে। গ্লাইকোজেন হলো গ্লুকোজের পলিমার। কয়েক হাজার গ্লুকোজ অণু ১-৪ ও ১-৬ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে গ্লাইকোজেন গঠন করে।

অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন হরমোন দ্বারা উদ্বিগ্নিত হয়ে গ্লাইকোজেনেসিস সংঘটিত হয়। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

২। পিস্তরস সংরক্ষণ (Storage of bile): যকৃত থেকে পিস্তরস নিঃসৃত হয়ে পিস্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় 400 থেকে 800 মিলিলিটার পিস্ত তৈরি করে।

৩। ভিটামিন সংরক্ষণ (Storage of vitamins): যকৃতে ভিটামিন A, D, E, K, B₆ ও B₁₂ সংরক্ষিত হয়।

৪। খনিজদ্রব্য সংরক্ষণ (Storage of minerals): যকৃত বিভিন্ন ধরনের খনিজদ্রব্য যেমন- কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, লৌহ, পটাসিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ করে। ভিটামিনের সাথে এসব খনিজদ্রব্য নানারকম পৃষ্ঠি পদার্থ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

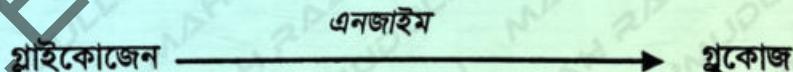
৫। লিপিড সংরক্ষণ (Storage of lipids): যকৃতে বিপুল পরিমাণে কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড সংশ্লেষিত হয়। এদের কিছু সংখ্যক লিপোপ্রোটিন হিসেবে যকৃতে সংরক্ষিত থাকে এবং দেহের অন্যান্য অংশের প্রয়োজনের ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অতিরিক্ত শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয় যেগুলো পরবর্তীতে অ্যাডিপোজ কলায় সংরক্ষিত হয়।

৬। রক্ত সংরক্ষণ (Storage of blood): যকৃত হেপাটিক পোর্টাল শিরা ও হেপাটিক ধমনির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রক্ত গ্রহণ করে। যকৃতের অভ্যন্তরে বিস্তৃত রক্ত নালিকা প্রবাহিত থাকায় এটি বিপুল পরিমাণ রক্তের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে এবং প্রায় 1500 সিসি রক্ত ধারণ করতে পারে। যকৃতে বিদ্যমান ম্যাক্রোফেজ থেত রক্তকণিকা বা কুফার কোষ (kupffer cells) রক্ত থেকে বিভিন্ন অণুজীব যেমন-ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাক ইত্যাদি ছাঁকনের মাধ্যমে অপসারণ করে। এছাড়া যকৃতে রক্ত থেকে মৃতপ্রায় লোহিত রক্তকণিকা, মৃত কোষ, ক্যানসার কোষ ও কোষীয় বর্জ্য অপসারিত হয়।

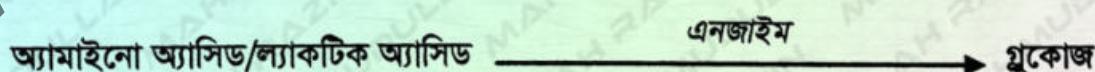
যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা

১। শর্করা বিপাক (Carbohydrate metabolism): রক্তের স্বাভাবিক গ্লুকোজ মাত্রা বজায় রাখতে যকৃত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করে। যেমন-

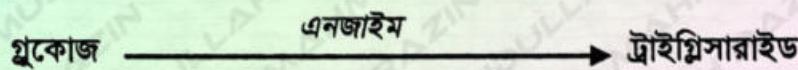
(ক) গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis): রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সংরক্ষিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়। এ প্রক্রিয়াটি ইপিনেক্রিন ও গ্লুকাগন হরমোন দ্বারা উদ্বিগ্নিত হয়।



(খ) গ্লাইকোনিউজেনেসিস (Gluconeogenesis): রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত কমে গেলে (hypoglycemia) যকৃত কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে গ্লাইকোনিউজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে প্রেরণ করে।



(গ) লাইপোজেনেসিস (Lipogenesis): রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে উহা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সংরক্ষণ ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইডে (triglyceride=TG) রূপান্তর করে। এ ট্রাইগ্লিসারাইড কোষে চর্বি হিসেবে সংরক্ষিত হয়। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য থেকে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) মাত্রা বেড়ে যায় যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের প্রধান কারণ।



২। লিপিড বিপাক (Lipid metabolism): যকৃতকোষ বা হেপাটোসাইটস লিপিড বিপাকীয় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে:

(ক) যকৃতে ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (ATP) তৈরি হয় যা পেশির প্রসারণ ও শিথিলে ব্যবহৃত হয়।

(খ) যকৃত লিপোপ্রোটিন সংশ্লেষণ করে যা কোষের বাইরে ও ভেতরে ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) যকৃত কিছু পরিমাণ ট্রাইগ্লিসারাইড সঞ্চয় করে।

(ঘ) যকৃত কোলেস্টেরল সঞ্চয় করে এবং এর দ্বারা সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টাউরোকোলেট নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ পিণ্ডলবণ তৈরি করে।

৩। প্রোটিন বিপাক (Protein metabolism): যকৃত প্রোটিন বিপাকীয় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে:

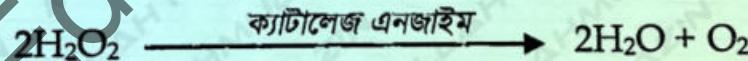
(ক) প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of plasma proteins): যকৃত γ গ্লোবিউলিন ব্যতিত প্রায় সকল ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হলো: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, α_1 ফেটোপ্রোটিন এবং রক্ত তৎপন ফ্যাট্টের ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রিন, V, VII, IX, X, XII, XII.

(খ) হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of hormone): যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ষ নিঃস্ত রেনিন (renin) এনজাইম দ্বারা সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

(গ) ডিঅ্যামিনেশন (Deamination): মানবদেহ অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সঞ্চয় করতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো অ্যাসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙে কিটো অ্যাসিড ও অ্যামিন মূলক (-NH₂) তৈরি করে। কিটো অ্যাসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক (-NH₂) হাইড্রোজেন আয়ন (H⁺) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH₃) সৃষ্টি করে।

(ঘ) ইউরিয়া সৃষ্টি (Urea formation): অ্যামোনিয়া অভ্যন্তর বিষাক্ত ক্ষতিকর যা দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে অরনিথিন চক্রে (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্টি CO₂ এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ষ হতে মৃত্যুর পথে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

৪। এনজাইম উৎপাদন (Enzyme metabolism): যকৃত ক্যাটালেজ (catalase) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম উৎপাদন করে। কোষে সঞ্চিত বিষাক্ত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H₂O₂) ক্যাটালেজ এনজাইম দ্বারা ভেঙে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। এছাড়ার ক্যাটালেজ এনজাইম দ্বারা মানুষের যকৃতে রক্তের অনেক বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হয়।



৫। তাপশক্তি উৎপাদন (Heat energy production): যকৃতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত হয় এবং এতে প্রচুর তাপশক্তির উৎপাদন ঘটে। এছাড়া যকৃতে বিভিন্ন ধরনের জটিল বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে প্রচুর তাপশক্তি উৎপাদিত হয়। এসব তাপশক্তি রক্তবাহিত হয়ে সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হয় এবং দেহের তাপীয় সাম্যবস্থা বজায় রাখে।

৬। বিষ অপসারণ (Detoxification): যকৃতের কোষসমূহ সর্বদা রক্তের উপাদান পর্যবেক্ষণ করে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছানোর পূর্বেই রক্ত হতে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করে। যকৃতকোষের বিভিন্ন এনজাইম বিষাক্ত রাসায়নিক যোগ, যেমন-অ্যালকোহল ও মাদকদ্রব্য ইত্যাদির বিপাক ঘটিয়ে এদের নিষ্কায় যৌগে পরিণত করে। যকৃতে ঔষুধ বিপাক (drug metabolism) প্রক্রিয়ায় দেহে ব্যবহৃত অতিরিক্ত ঔষুধ অপসারিত হয়।

৭। রক্তের উপাদান সংশ্লেষ (Synthesis of blood components): যকৃত রক্তের বিভিন্ন তৎপন ফ্যাট্টের, ইমিউন ফ্যাট্টের এবং লোহিত কণিকা সৃষ্টির কাঁচামাল উৎপাদন করে।

৮। হিমোগ্লোবিন ভাঙ্গন (Hemoglobin breakdown): যকৃতের কুপার কোষ সর্বদা রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার মৃত্যুর পর উহার হিমোগ্লোবিন ভেঙে বিলিরুবিন (bilirubin) ও বিলিভার্ডিন (biliverdin) নামক রঞ্জক পদার্থ সৃষ্টি করে।

৯। হরমোন ভাঙ্গন (Hormone breakdown): যকৃতে টেস্টোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, থাইরিনসহ প্রায় সকল ধরনের হরমোনের ভাঙ্গন ঘটে এবং এভাবে দেহে হরমোনের সাম্যবস্থা বজায় থাকে।

যকৃতের রোগ

- **হেপাটাইটিস (Hepatitis):** যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে। সাধারণত যকৃত কোষে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এরোগ হয় এবং হেপাটাইটিস A, B, C, D ও E নামে চিহ্নিত করা হয়।
- **হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (Hepatic encephalopathy):** যকৃত রক্তের বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে অক্ষম হলে সেগুলো রক্তে জমে গিয়ে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি সৃষ্টি করে। এর কারণে মানুষ কোমায় চলে যায় অথবা মৃত্যুবরণ করে।
- **বাড়-কায়ারি সিন্ড্রম (Budd-Chiari syndrome):** যকৃতে রক্ত সরবরাহকারী হেপাটিক শিরায় ব্লক সৃষ্টি হলে তাকে বাড়-কায়ারি সিন্ড্রম বলে।
- **প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস (Primary biliary cirrhosis):** এটি যকৃতের একটি অটোইমিউন রোগ।
- **হেপাটোমেগালি (Hepatomegaly):** যকৃত অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে যাওয়াকে হেপাটোমেগালি বলে।
- **যকৃত রোগের লক্ষণ:**

হলুদাভ মল, গাঢ় বর্ণের মৃত্র, জন্সন, হাঁটু-পা ও উদর ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ, যকৃতের উপরের দিকে ব্যথা অনুভব, ক্রুধামন্দা, বদহজম ইত্যাদি।

পিস্তরস (Bile): যকৃত নিঃসৃত রসকে পিস্ত বা পিস্তরস বলে। এটি একটি হলুদাভাব তরল। এটি তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় পদার্থ।

পিস্তরসের উপাদান : পিস্তরসে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে-

- ১। পানি: 89%;
- ২। অজ্জেব লবণ: 0.8%- সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন লবণ;
- ৩। পিস্ত লবণ: 6.0%- সোডিয়াম টাউরোকোলেট ও সোডিয়াম ফ্লাইক্রোকোলেট;
- ৪। পিস্ত রঞ্জক: 3% -বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন;
- ৫। কোলেস্টেরল: 0.38%;
- ৬। ফ্যাট: 0.82%।

পিস্তরসের কাজ: পিস্ত জীবনধারণের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। যদিও এতে কোনো এনজাইম নেই তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক রস। নিম্নে পিস্তরসের কাজ উল্লেখ করা হলো-

- ১। পরিপাক: পিস্ত অঙ্গে ক্ষারীয় মাধ্যমে সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন খাদ্য পরিপাকের জন্য অত্যাবশ্যক। পিস্তলবণ স্থেহ জাতীয় খাদ্যকে ইমালসিফিকেশনের মাধ্যমে স্ফুর্ত স্ফুর্ত দানায় পরিণত করে।
- ২। শোষণ: চর্বি, লৌহ ও ক্যালসিয়াম, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ইত্যাদি শোষণের জন্য পিস্তলবণ অত্যাবশ্যক।
- ৩। রেচন: কপার, জিঙ্ক, লেড, টার্মিক পদার্থ, পিস্তরঞ্জক, ব্যাকটেরিয়া, লেসিথিন ইত্যাদি রেচন দ্রব্য পিস্তের মাধ্যমে দেহ হতে বহিকার হয়।
- ৪। জোলাপ ত্রিল্যা: পিস্তলবণ পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ায় উদ্বৃত্তি দেয়। এটি মলকে নরম করে।
- ৫। pH নিয়ন্ত্রণ: পিস্ত ডিওডেনামের pH ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়ায় সহায়তা করে।
- ৬। বাফার ও লুক্রিকেট: পিস্তের মিউসিন বাফার ও লুক্রিকেট হিসেবে কাজ করে।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অগ্ন্যাশয় পরিপাক ও অন্তঃক্ষরাত্ত্বের একটি জটিল, মিশ্র প্রকৃতির গ্রাহিময় অঙ্গ। এটি পাকস্থলির নিচে ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুণ্ডলির মাঝে অবস্থিত। এটি 5.75-9.5 সেন্টিমিটার লম্বা ও 5 সেন্টিমিটার চওড়া এবং দেখতে অনেকটা মরিচের মতো। এটি মস্তক, দেহ ও লেজ এ তিন অংশে বিভক্ত। সমগ্র অগ্ন্যাশয়টি যোজক কলার আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এ আবরণ অগ্ন্যাশয়ের ভেতরে প্রবেশ করে উহাকে কয়েকটি লোবিউলে বিভক্ত করে। অগ্ন্যাশয়ের এসব লোবিউলের মধ্যে দুই ধরনের গ্রাহিকলা থাকে। এদের অধিকাংশই (90%) এনজাইম নিঃসরণকারী নালিযুক্ত গ্রাহিকলা। অন্যগুলো (10%) হলো ফাঁকে ফাঁকে ও গুচ্ছাকারে অবস্থিত হরমোন ক্ররণকারী অনাল গ্রাহিক আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যাল (Islets of Langerhans)। অগ্ন্যাশয় একাধারে এনজাইম নিঃসরণ ও হরমোন ক্ররণ করে বলে একে মিশ্র গ্রাহি বলা হয়। অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম

নিঃসরণকারী গ্রহিণুলো থেকে ছোট ছোট নালি বের হয়ে উইরসাং নালি (Wersaung canal) গঠন করে যা অগ্ন্যাশয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর এসে পিস্তনালির সাথে মিলিত হয় এবং সমন্বিতভাবে অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার (Amphula of Vater) এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয়ের কাজ (Functions of Pancreas): অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রহি হিসেবে কাজ করে। এজন্য একে মিশ্র গ্রহি (mixed gland) বলা হয়। এ গ্রহির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। এনজাইম নিঃসরণ: এ গ্রহির নালিযুক্ত অংশ থেকে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও আমাইলেজ এনজাইম নিঃস্তৃত হয় যেগুলো যথাক্রমে আমিষ, স্নেহ ও শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।

২। হরমোন ক্ষরণ: অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যাল প্রায় 10 লক্ষ কোষের একটি গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। কোষগুলো চার ধরনের হয়:

(ক) আলফা কোষ (α cells): এরা গ্লুকাগন (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(খ) বিটা কোষ (β cells): এরা ইনসুলিন (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়।

(গ) ডেল্টাকোষ (δ cells): এরা সোমাটোস্ট্যাটিন (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) গামা কোষ (γ cells): এরা প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

৩। লবণ নিঃসরণ: এ গ্রহির নালিযুক্ত অংশ থেকে বাইকার্বনেট লবণ নিঃস্তৃত হয় যা পাকস্থলির অন্তর্ভুক্ত লাগব করে।

৪। অন্যান্য কাজ: দেহের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, পারিসাম্যতা রক্ষা, তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃক্ষীয় কাজে অগ্ন্যাশয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juices): অগ্ন্যাশয়ের নালিযুক্ত গ্রহি থেকে নিঃস্তৃত রসকে অগ্ন্যাশয় রস বলে। উচ্চ মাত্রায় বাইকার্বনেট লবণ থাকার কারণে এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির।

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

১। পানি: 98%

২। জৈব বস্তু: 1.8%-ট্রিপসিন, আমাইলেজ, লাইপেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাটেজ, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম।

৩। অজৈব বস্তু: 0.2%-সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের বাইকার্বনেট লবণ ইত্যাদি।

অগ্ন্যাশয় রসের কাজ

১। এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় সম পরিমাণ পাকস্থলির অন্তর্ভুক্ত রসকে প্রশামিত করে।

২। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান আমাইলেজ, ম্যাল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাটেজ এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৩। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৪। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান লাইপেজ এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রহি (Gastric glands)

পাকস্থলির অন্তর্গাত্রের মিউকোসা স্তরে বিভিন্ন এককোষী গ্রহি খাদ্য পরিপাককারী রস নিঃসরণ করে। এসব গ্রহির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মিউকাস কোষ, কার্ডিয়াক গ্রহি, পেপটিক কোষ, প্যারাইটাল কোষ, গবলেট কোষ, জি-কোষ ইত্যাদি। এসব গ্রহি থেকে যে রস নিঃস্তৃত হয় তাকে গ্যাস্ট্রিক রস (gastric juices) বলে। মানুষের পাকস্থলিতে প্রতিদিন থাম দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক রস নিঃস্তৃত হয়।

গ্যাস্ট্রিক রসের উপাদান

১। পানি : 99.45%

২। অজেব পদার্থ: 0.15%- HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

৩। জৈব পদার্থ: 0.40%- মিউসিন, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাট্টের; এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।
গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ :

১। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলিতে অল্পীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান পেপসিন এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান রেনিন এনজাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।

৪। গ্যাস্ট্রিক রস পাকস্থলির প্রাচীরকে সুরক্ষা করে।

৫। কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালক্যালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক রসের সাথে দেহ হতে রাখ্যকৃত হয়।

আন্তিক গ্রস্তি (Intestinal glands)

অন্ত্রের প্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রস্তি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম নিঃসরণ করে। এরা হলে ত্রাশকোষ, গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, আরজেন্টাফিল কোষ, লিবারকুন-এর গ্রস্তি এবং ক্রুনার-এর গ্রস্তি। এসব গ্রস্তি থেকে নিঃস্তু রসকে আন্তিক রস বা সাক্স ইন্টেরিকাস (Intestinal juice or Succus intericus) বলে।

আন্তিক রসের উপাদান

১। পানি: 98.5%।

২। অজেব পদার্থ: 0.8%- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

৩। জৈব পদার্থ: 0.7%, সক্রিয়ক-এন্টারোকাইনেজ, এনজাইম-ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ ও লাইপেজ ইত্যাদি।

আন্তিক রসের কাজ:

১। আন্তিক রসে বিদ্যমান মিউকাস অন্ত্রের প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

২। এতে বিদ্যমান সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।

৩। এতে বিদ্যমান মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

৪। এতে বিদ্যমান পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

মেম্ব্রেন এনজাইম (Membrane enzymes)

অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা মেম্ব্রেনে কতগুলো এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা মেম্ব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে মেম্ব্রেন এনজাইম বলে। প্রধান মেম্ব্রেন এনজাইম হলো:

অ্যামিনোপেপটাইডেজ (aminopeptidase)-পেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

ম্যালটেজ (maltase)- ম্যালটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

সুক্রেজ (sucrase)-সুক্রোজকে ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টেজ (lactase)-দুক্ষ চিনি ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্ল্যালাক্টোজে পরিণত করে।

মেম্ব্রেন এনজাইমের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য হলো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ (alkaline phosphatase) যা বিভিন্ন ফসফেট যৌগকে ভাঙ্চে, নিউক্লিউটাইডেজ (nucleotidases) যা নিউক্লিউটাইডকে নিউক্লিউসাইডে পরিণত করে এবং নিউক্লিউসাইডেজ (nucleosidases) যা নিউক্লিউসাইডকে চিনি, পিউরিন ও পাইরিমিডিন-এ পরিণত করে।

পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য

পরিপাক

শোষণ

১। পরিপাক প্রক্রিয়ায় বৃহদাকৃতির জটিল খাদ্য যান্ত্রিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল ও শোষণ উপযোগী খাদ্যসারে পরিণত হয়।	১। শোষণ প্রক্রিয়ায় সরল খাদ্যসার পরিপাক নালি হতে রক্তে প্রবেশ করে।
২। পরিপাক প্রক্রিয়া মুখবিবর, পাকস্থলি ও অঙ্গের গহ্বরে সংঘটিত হয়।	২। শোষণ প্রক্রিয়া অঙ্গের ইলিয়াম ও জেজুনামের ভিলাইয়ে সংঘটিত হয়।
৩। পরিপাক প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয়।	৩। শোষণ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয় না।
৪। পরিপাক সর্বদাই একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এতে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়।	৪। শোষণ একটি নিষ্ক্রিয় ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং এতে কোন জৈব শক্তির প্রয়োজন হয় না।
৫। পরিপাকে খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।	৫। শোষণে খাদ্যের গাঠনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে না।
৬। পরিপাকে রক্তের কোন প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই।	৬। শোষণে রক্তের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে।
৭। কেবল বৃহৎ ও জটিল পাচক দ্রব্যের উপর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।	৭। সরল প্রকৃতির পাচক ও অপাচক উভয় ধরনের দ্রব্যের শোষণ প্রক্রিয়া ঘটে।

এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম

হরমোন

১। সনাল গ্রহিত থেকে কিংবা কোষাভ্যন্তরে নিঃসৃত হয়।	১। অনাল গ্রহিত থেকে ক্ষরিত হয়।
২। উৎসের নিকটবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।	২। উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।
৩। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৩। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে উদ্বৃত্তি করে এবং বিক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৪। কাজের গতি দ্রুত ও ফলাফল তাৎক্ষণিক।	৪। কাজের গতি মন্ত্র ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী।
৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া উভয়মুখী।	৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী।
৬। নালি দ্বারা পরিবাহিত হয়।	৬। রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।
৭। কোষ আবরণী দিয়ে এদের ব্যপন ঘটে না।	৭। কোষ আবরণী দিয়ে এদের ব্যপন ঘটে।
৭। উদাহরণ : ট্রিপ্সিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	৭। উদাহরণ: গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

এনজাইম ও পিন্ডরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম

পিন্ডরস

১। এনজাইম নালিযুক্ত গ্রহিত নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	১। পিন্ডরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ।
২। এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	২। পিন্ডরস পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩। এনজাইম গ্রহিত থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না।	৩। পিন্ডরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিন্ডথলিতে সঞ্চিত থাকে।
৪। এনজাইমের সময় কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।	৪। পিন্ডরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ।
৫। এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৫। পিন্ডরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে।
৬। এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৬। পিন্ডরস কার্যশেষে বর্জ্যরূপে দেহ হতে নিষ্কাশ্য হয়।

মানব পরিপাকতত্ত্বে খাদ্য পরিপাকের সারসংক্ষেপ



- যান্ত্রিক পরিপাক: খাদ্যবস্তুর চর্বণ ও গলাধংকরণ
- রাসায়নিক পরিপাক: স্টোচ (শর্করা) → ম্যালটোজ
- প্রধান পরিপাক এনজাইম: লালায় বিদ্যমান টায়ালিন এনজাইম

- যান্ত্রিক পরিপাক: খাদ্যবস্তুর পেরিস্ট্যালিক মিশ্রণ
- রাসায়নিক পরিপাক: জটিল আমিষ → পলিপেপটাইড
- প্রধান পরিপাক পদার্থ: গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান পেপসিন এনজাইম
- শোষণ: চর্বিতে দ্রবণীয় অ্যাসপাইরিন জাতীয় পদার্থের শোষণ

- যান্ত্রিক পরিপাক: খাদ্যবস্তুর সেগমেনটেশন ও পেরিস্ট্যালিক মিশ্রণ
- রাসায়নিক পরিপাক: চর্বির ইমালসিফিকেশন
চর্বি → ফ্যাট অ্যাসিড ও ফ্লিসারল
পলিপেপটাইড → অ্যামিনো অ্যাসিড
ডাইস্যাকারাইড/ম্যালটোজ → গ্লুকোজ
- প্রধান পরিপাক পদার্থ: পিণ্ডরসে বিদ্যমান পিণ্ডলবণ এবং অগ্ন্যাশয় রসে
বিদ্যমান ট্রিপরিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ এনজাইম
- শোষণ: গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাট অ্যাসিড ও ফ্লিসারল, পানি,
ভিটামিন ও খনিজলবণ

- যান্ত্রিক পরিপাক: গাঁজন ও পাচন
- রাসায়নিক পরিপাক: অপাচ খাদ্যবস্তু → ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাট অ্যাসিড
- প্রধান পরিপাক পদার্থ: ব্যাকটেরিয়া
- শোষণ: পানি ও খনিজলবণ

চিত্র ৩.৫ মানুষের পরিপাকতত্ত্বের বিভিন্ন অংশে খাদ্যবস্তুর পরিপাক

৩.৩ খাদ্য পরিপাকে স্নায়ুতত্ত্ব ও হরমোনের ভূমিকা

(ক) স্নায়ুতত্ত্বের ভূমিকা

মন্তিক্ষের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত ক্ষুধা কেন্দ্র (hunger centers) মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা কমে গেলে মানুষ খাদ্যগ্রহণে উদ্বৃদ্ধি হয়। দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ু মানুষের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদেরকে অঙ্গনিহিত স্নায়ুজালক বা ইন্ট্রিনসিক প্লেক্সাস (Intrinsic plexuses) ও বহির্নিহিত স্নায়ুজালক বা এক্স্ট্রিনসিক প্লেক্সাস (Extrinsic plexuses) বলে।

□ অঙ্গনিহিত স্নায়ুজালক (Intrinsic plexuses): পরিপাকতত্ত্বের ইন্ট্রিনসিক প্লেক্সাসকে এন্টেরিক স্নায়ুতত্ত্ব (enteric nervous system) বা অঙ্গীয় স্নায়ুতত্ত্ব বলে। এগুলো পৌষ্টিকনালির অগ্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রাঙ্গ ও কোলনের প্রাচীরে ঘন সন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থাকে। এগুলো পৌষ্টিকনালির ভেতর থেকে উদ্বৃদ্ধি গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। দুই ধরনের ইন্ট্রিনসিক প্লেক্সাস পরিপাকতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের একটি হলো মায়েন্টারিক প্লেক্সাস (myenteric plexus) যা পরিপাকতত্ত্বের মসৃণ পেশিগুলোর সংক্ষেপে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি হলো সাবমিউকোসাল প্লেক্সাস (submucosal plexus) যা পরিপাকতত্ত্বের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এন্টেরিক স্নায়ুতত্ত্ব খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে।

□ **বহির্নির্ভুল স্নায়ুজালক (Extrinsic plexuses):** এগুলো পৌষ্টিকনালির বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা পরিপাকতত্ত্বের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- যেমন খাদ্যের আগ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে কিংবা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেয়া। এক্সট্রিনসিক স্নায়ুগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতত্ত্বের (autonomic nervous system) সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক শাখা হতে আসে। এরা অ্যাসিটালকোলিন (acetylcholine) এবং অ্যাডরেনালিন (adrenaline) নামক রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত করে। অ্যাসিটালকোলিন পৌষ্টিকনালির ভেতর দিয়ে খাদ্য এবং পানীয় দ্রুত প্রবাহিত হতে শক্তি প্রয়োগ করে। এছাড়া এটি পাকস্থলি ও অগ্ন্যাশয় হতে অধিক পরিমাণ পাচক রস নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে। অ্যাডরেনালিন পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশিকে শিথিল করে এবং এসব অঙ্গে রক্ত প্রবাহ মন্ত্র করে।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের বৃহদস্ত্রের প্রাচীরে বিদ্যমান স্নায়ুজালিকা খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এন্টেরিক স্নায়ুতত্ত্বকে বিজ্ঞানীগণ মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক (second brain) নাম দিয়েছেন। কেননা এটি একদিকে যেমন মস্তিষ্কে উদ্দীপনা প্রেরণে সক্ষম অন্যদিকে তেমনি পরিপাকতত্ত্বের হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিপাকনালিতে খাদ্য চলাচল, মানুষের ক্ষুধা ও ত্ত্বি অনুভব ইত্যাদি অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম। বর্তমানে Neurogastroenterology চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি আধুনিক শাখা যেখানে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক কিভাবে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে সে বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

(খ) হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হরমোন ক্ষরণ ব্যৱহৃত হলে পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিপ্লব ঘটে। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হরমোন বা জি আই হরমোন (gastrointestinal or GI hormones) নামে পরিচিত। এগুলো রক্তে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতত্ত্বের বিভিন্ন রক্তনালি দিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌছে এবং সেখান থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতত্ত্বে ফিরে আসে যেখানে এরা বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সংঘালন কার্যকে উদ্দীপিত করে। খাদ্যের পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলো হলো:

১। **গ্যাস্ট্রিন (Gastrin):** পাইলোরিক পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিন কোষ (G-cells) হতে গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রিস্টি গ্রিস্টি হতে গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলির প্রাচীর হতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। এছাড়া পাকস্থলি, ক্ষুদ্রাঞ্চ ও কোলনের অন্তঃআবরণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ হরমোনের ক্ষরণ অপরিহার্য।

২। **সিক্রেটিন (Secretin):** অন্ত্রের প্রাচীর থেকে সিক্রেটিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। এছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিন্ড ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

৩। **কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin- CCK):** ক্ষুদ্রাঞ্চের ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে কোলেসিস্টোকাইনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। খাদ্যে চর্বির উপস্থিতিতে উদ্দীপিত হয়ে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি পিন্ডথলি থেকে পিন্ডরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে।

৪। **এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin):** ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এ হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আত্মিক গ্রিস্টি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাকটেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়। এটি পিন্ডথলি থেকে পিন্ডরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে।

৫। **পেপটাইড YY (Peptide YY):** ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৬। **গ্যাস্ট্রিক ইনহ্যাবিটরি পেপটাইড (Gastric inhibitory peptide -GIP):** ডিউডেনামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পাকস্থলি থেকে খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণের সূচনা ঘটায়।

৭। **সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin):** ডিউডেনামের প্রাচীরের ডেল্টা কোষ (δ cells) থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি প্যারাইটাল কোষের উপর ক্রিয়া করে এদের অ্যাসিড ক্ষরণ হ্রাস করে।

৮। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide=PP): অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যাস কোষ শুচ্ছের PP কোষ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এ হরমোন অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এটি যকৃতে ফাইকোজেন মাত্রা ও পাকস্থলি-অন্ত্রের নিঃসরণকে প্রভাবিত করে।

৯। ভিলিকাইনিন (Villikinin): ক্ষুদ্রান্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি ভিলাইয়ের সংঘালনকে ত্বরান্বিত করে।

১০। ডিওক্রিনিন (Deocrinin): ডিওডেনামের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি আন্ত্রিক রসে মিউকাস ও এনজাইম নিঃসরণের জন্য ক্রমারের গ্রস্টিকে (Brunner's glands) উদ্বাপিত করে।

১১। এন্টেরোক্রিনিন (Enterocrinin): ডিওডেনামের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি আন্ত্রিক রসে মিউকাস ও এনজাইম নিঃসরণের জন্য লিবারকুন গ্রস্টিকে (Crypts of Lieberkuhn) উদ্বাপিত করে।

১২। ভেসোয়াকটিভ ইনস্টেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive intestinal peptide-VIP): ক্ষুদ্রান্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন

কতিপয় GI পেপটাইড যেমন-ভেসোয়াকটিভ ইনস্টেস্টাইনাল পেপটাইড (VIP), গ্রাকাগন লাইক পেপটাইড-১ (GLP-1), প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (PP), গ্যাস্ট্রিক ইনহ্যাবিটরি পেপটাইড (GIP), গ্রিলিন (ghrelin) এবং পেপটাইড YY মন্তিকে নিউরোটাসমিটার হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে গ্রিলিন, PP এবং PYY সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রকের কাজ করে। খাদ্যগ্রহণের পূর্বে রক্তে গ্রিলিন (ghrelin) হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে ক্ষুধার (appetite) উদ্বেগ হয়। অন্যদিকে খাদ্য গ্রহণের সময় রক্তে PP এবং PYY হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে খাবারে তৃষ্ণি (satiety) আসে।

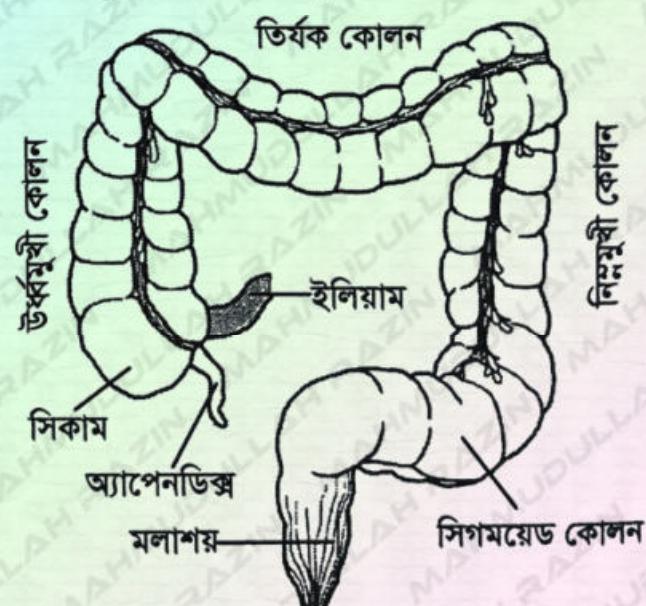
৩.৪ বৃহদান্ত্রের কাজ (Function of Large Intestine)

মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পেছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে বৃহদান্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 1.5 মিটার। এটি প্রধান দুই অংশে বিভক্ত। এর সামনের U আকৃতির বৃহৎ অংশকে কোলন (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলে আকৃতির অংশকে মলাশয় (rectum) বলে। কোলন চারটি অংশে বিভক্ত, যথা- উর্ধ্মযুক্তি, তির্যক, নিম্নযুক্তি ও সিগময়েড অংশ। ইলিয়াম ও কোলনের সংযোগস্থলে সিকাম (caecum) নামক একটি বৃহৎ থলি বিদ্যমান। সিকামের সাথে একটি বন্ধ ধরনের প্রক্ষেপন যুক্ত থাকে। একে অ্যাপেনডিক্স (appendix) বলে। বৃহদান্ত্রের রেকটাম প্রায় 12 সেন্টিমিটার লম্বা। এটি পায়ু ছিদ্র (anus) দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। পায়ুছিদ্র কতগুলো প্রিচ্ছিক প্রকৃতির ক্ষিংটার পেশি দ্বারা বেষ্টিত থাকে যেগুলো মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের বৃহদান্ত্র প্রধান চারটি কাজ সম্পন্ন করে। যথা-

১। এখানে পানি ও কিছু খনিজলবণ আয়ন, যেমন সোডিয়াম ও ক্রোরাইড শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্য বিদ্যমান পানির প্রায় 80% বৃহদান্ত্রের কোলনে পুনঃশোষিত হয়।

২। এখানে মল তৈরি হয়ে সাময়িকভাবে জমা থাকে।



চিত্র ৩.৬: বৃহদান্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৩ বৃহদান্ত্রে খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটে। এখানে প্রায় 500 প্রজাতির মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া থাকে যেগুলো খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন (fermentation) ঘটায়।

৪ বৃহদান্ত্রের অ্যাপেনডিস্কে উপকারি জীবাণুর সুরক্ষিত ভাণ্ডার বলা হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে আমাশয় বা কলেরা বা অন্য কোন অপকারি জীবাণু দ্বারা অন্ত্রের উপকারি ব্যাকটেরিয়া ধৰ্মস প্রাপ্ত হলে অ্যাপেনডিস্কের উপকারি ব্যাকটেরিয়াগুলো অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার জীবগোষ্ঠিকে (gut flora) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে বৃহদান্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া আমাদের সুস্থান্ত্র রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন পরিণত মানুষের কোলনে বসবাসকারী প্রায় 500 প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সংক্রান্ত পাওয়া গেছে। এসব ব্যাকটেরিয়া অ্যানাইরোব (anaerobe) প্রকৃতির অর্থাৎ এরা অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এরা বৃহদান্ত্রে কিছু অপাচ্য খাদ্য উপাদানকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙে স্ফুর্দ্র শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড (short-chain fatty acids=SCFAs) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস মুক্ত করে। এসব স্ফুর্দ্র শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন-অ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপাওনিক অ্যাসিড ও বিউটারিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া এবং কোলনের প্রাচীরের কোষে শক্তি সরবরাহ করে।

৩.৫ ব্যবহারিক

যকৃত, অঘ্যাশয়, পাকস্থলি ও স্ফুর্দ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পাকস্থলির অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ: পাকস্থলির অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর দেখা যায়-

- সেরোসা: এন্টরটি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত।
- মাসকুলারিস: এন্টরটি পুরু এবং অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি দিয়ে গঠিত।
- সাবমিউকোসা: এটি অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত এবং এতে রক্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যমান থাকে।
- মাসকুলারিস মিউকোসা: এন্টরটি মসৃণ পেশি নির্মিত এবং টেউ খেলানো।

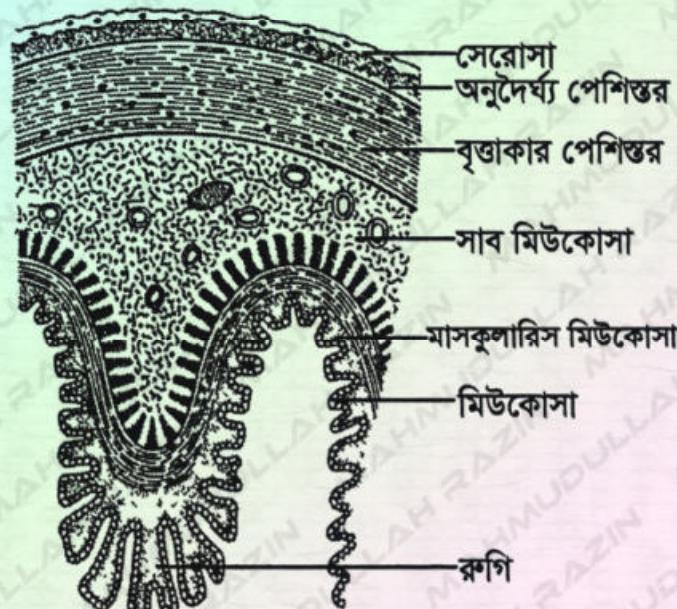
□ মিউকোসা: এন্টরটি এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। এতে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রস্তি থাকে। এ স্তর থেকে Y আকৃতির রংগি (rugae) নামক কতগুলো ভোংতা ও প্রশস্ত অভিক্ষেপ বের হয়ে পাকস্থলির লুমেনে প্রক্ষিপ্ত থাকে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ১। পাকস্থলির প্রাচীরে সেরোসা, মাসকুলারিস, সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তরে নামক পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর বিদ্যমান।

- ২। Y আকৃতির ভোংতা ও প্রশস্ত অভিক্ষেপ রংগি (rugae) বিদ্যমান।

- ৩। মিউকোসা স্তরে গ্যাস্ট্রিক গ্রস্তি বিদ্যমান।



চিত্র ৩.৭ পাকস্থলির অনুচ্ছেদ

অন্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ: অন্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর দেখা যায়-

- সেরোসা: এন্টরটি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত।
- মাসকুলারিস: এটি তুলনামূলক পাতলা এবং অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি দিয়ে গঠিত।

□ **সাবমিউকোসা:** এটি অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত এবং এতে রক্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যমান।

□ **মাসকুলারিস মিউকোসা:** এস্তরটি মসৃণ পেশি নির্মিত এবং ঢেউ খেলানো।

□ **মিউকোসা:** এস্তর এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে গবলেট কোষ ও শোষণক্ষম কোষ বিদ্যমান থাকে।

□ **ভিলাই:** অন্ত্রের সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর মিলে অন্ত্রের লুমেনে ভিলাই (villi) নামক আঙুলের মতো সরু কতগুলো অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। অন্ত্রের প্রাচীরে সেরোসা, মাসকুলারিস, সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর নামক পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর বিদ্যমান।

২। অন্ত্রের অস্তঃপ্রাচীরে ভিলাই নামক আঙুলের মতো সরু কতগুলো অভিক্ষেপ বিদ্যমান।

৩। মিউকোসা স্তরে গবলেট কোষ ও শোষণক্ষম কোষ বিদ্যমান।

যকৃতের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্টাইল

পর্যবেক্ষণ:

□ যকৃত প্লিসন ক্যাপস্যুল (Glisson's capsule) নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যকৃতকে হেপাটিক লোবিউল (hepatic lobules) নামক অসংখ্য নামক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে।

□ প্রতিটি লোবিউল ষড়ভূজাকৃতির কিংবা প্রিজম আকৃতির এবং প্লিসন ক্যাপস্যুল ও যোজক কলা নির্মিত পাতলা আবরণ দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

□ দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক কলা পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিণ্ডনালির শাখা থাকে।

□ লোবিউলগুলোর ভেতরে অসংখ্য বহুভূজাকৃতির হেপাটিক কোষ থাকে যেগুলো সারিবদ্ধভাবে হেপাটিক কর্ড (hepatic cord) গঠন করে একটি কেন্দ্রকে ঘিরে অরৌয়ভাবে সজ্জিত থাকে।

□ হেপাটিক কর্ডের ফাঁকে ফাঁকে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামে ফাঁকা স্থান এবং রক্ত ক্যানালিকুলি বিদ্যমান থাকে।

□ সাইনুসয়েডগুলো কুপফার'স কোষ (Kupffer's cells) দ্বারা আবৃত থাকে।

□ প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে।

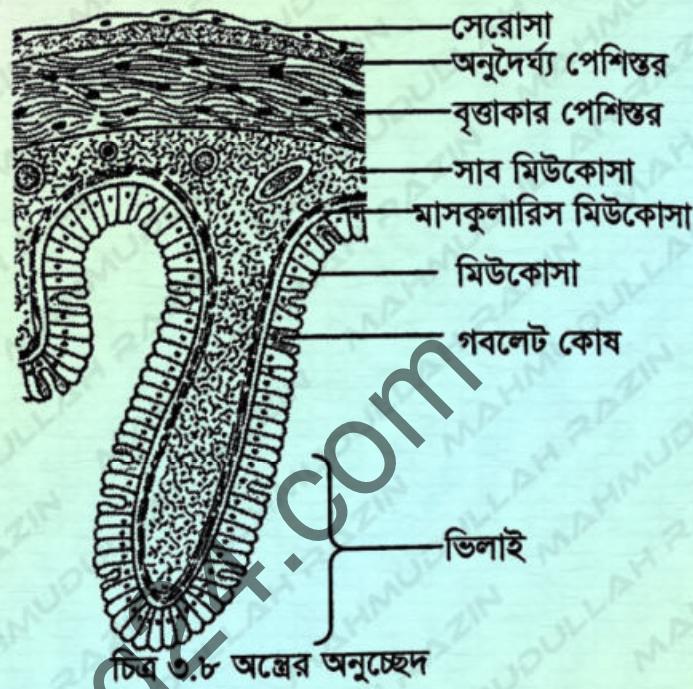
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থিত ষড়ভূজাকৃতির হেপাটিক লোবিউল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিদ্যমান।

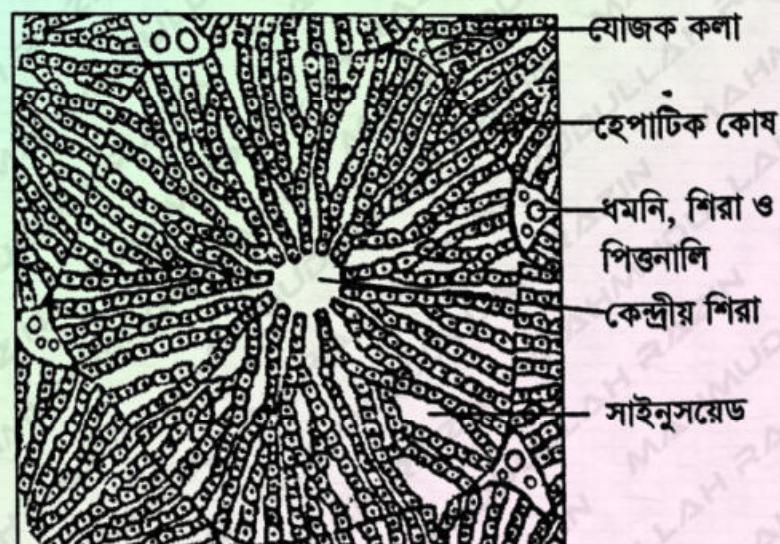
২। প্রতিটি হেপাটিক লোবিউল প্লিসন ক্যাপস্যুল ও যোজক কলা নির্মিত পাতলা আবরণ দ্বারা আবদ্ধ।

৩। দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক কলা পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিণ্ডনালির শাখা বিদ্যমান।

৪। প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে।



চিত্র ৩.৮ অন্ত্রের অনুচ্ছেদ



চিত্র ৩.৯ যকৃতের অনুপ্রস্থচ্ছেদ

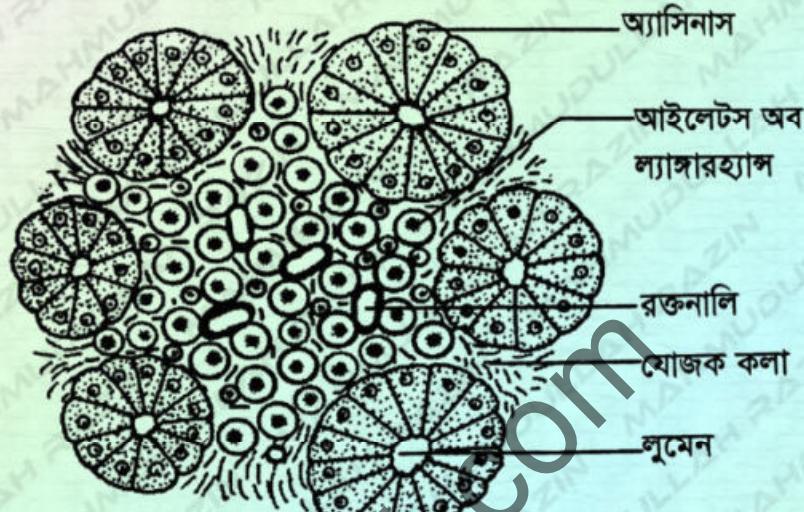
অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। এনজাইম নিঃসরী কোষ নিয়ে গঠিত লোবিউল বা অ্যাসিনাস এবং হরমোন নিঃস্রাবী কোষ নিয়ে গঠিত ‘আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যাল’ নিয়ে অগ্ন্যাশয় গঠিত।

২। এ দুই অংশের ফাঁকে ফাঁকে যোজক কলা, রক্তনালিকা ও অগ্ন্যাশয় অণুনালিকা বিদ্যমান থাকে।

৩। প্রতিটি অ্যাসিনাসের কেন্দ্রে একটি লুমেন থাকে।

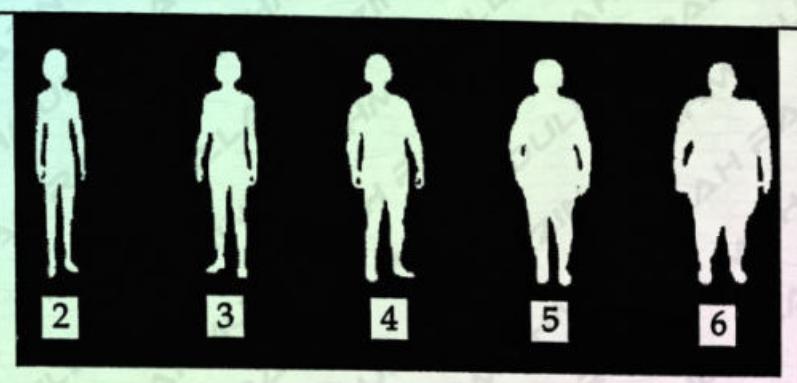


চিত্র ৩.১০ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

৩.৬ স্তুলতা (Obesity)

স্তুলতা এক ধরনের স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাতে দেহের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হয়ে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবনকাল হ্রাস করে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেসব মানুষের দেহ ভর সূচক (Body Mass Index =BMI) ৩০ কেজি/বর্গমিটারের অধিক হয় তারা স্তুল প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বব্যাপি মানুষের স্তুলতার মান নির্ণয়ে দেহভর সূচক বা BMI মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী দেহের মোট ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে BMI বলা হয়। অর্থাৎ বিএমআই=কিলোগ্রাম/বর্গমিটার ($BMI=kilograms/meters^2$)। এ হিসেবে 160 সেন্টিমিটার (1.6 মিটার) উচ্চতা ও 74 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে প্রায় 29। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization =WHO) 2000 সালে বিএমআই এর নিম্নলিখিত মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে যা দ্বারা খুব সহজেই মানুষের স্তুলতা নির্ণয় করা যায়।

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	$< 18.5 \text{ Kg/m}^2$	শরীরের ওজন কম
2	$18.5- 24.9 \text{ Kg/m}^2$	স্বাভাবিক ওজন
3	$25.0-29.9 \text{ Kg/m}^2$	অতিরিক্ত ওজন
4	$30.0-34.9 \text{ Kg/m}^2$	স্তুলতার ১ম স্তর
5	$35.0-39.9 \text{ Kg/m}^2$	স্তুলতার ২য় স্তর
6	$\geq 40.0 \text{ Kg/m}^2$	স্তুলতার ৩য় স্তর



এশিয়ার মানুষের স্তুল (obese) হওয়ার প্রবণতা ইউরোপিয়ানদের চেয়ে কম। সাধারণত এশিয়ার মানুষের বিএমআই মান কম থাকে। এজন্য এশিয়ার অনেক দেশে স্তুলতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। যেমন জাপান ও চীনে বিএমআই মান যথাক্রমে 25 Kg/m^2 ও 28 Kg/m^2 এর বেশি হলেই স্তুলতা ধরা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে স্তুলতার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে 1.5-3.6 লক্ষ লোক মারা যায়। ইউরোপে এ সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ। গড়ে স্তুলতার কারণে মানুষের আয়ু 7-8 বছর কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে অতিমাত্রায় স্তুলতার (স্তুলতার ৩য় স্তর) কারণে মানুষের গড় আয়ু 10 বছর কমে যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে 64% পুরুষ এবং 77% মহিলার ডায়াবেটিস স্তুলতার সাথে সম্পর্কিত বলে গবেষকগণ প্রমাণ পেয়েছেন।

স্বাস্থ্যগত সমস্যা: স্তুলতার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় বিশেষ করে হৃৎরোগ, টাইপ-2 ডায়াবেটিস, কয়েক প্রকার ক্যানসার, গিট বাত, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিণ্ডথলির সমস্যা ইত্যাদি। স্তুলতা বিশ্বব্যাপি মানুষের মৃত্যুর একটি প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে শিশু ও বয়স্ক স্তুল মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। স্তুলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অঙ্গোপচার বিষয়ক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেরিয়াট্রিক্স (Bariatrics) নামে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

স্তুলতার কারণ: মানুষের স্তুলতার জন্য একাধিক প্রভাবকের সমন্বিত ক্রিয়াকে দায়ী করা হয়। যেসব প্রভাবক স্তুলতার জন্য দায়ী সেগুলো হলো:

১। **খাদ্যাভ্যাস:** (i) অতিরিক্ত চর্বি ও ক্যালরিয়ুক্ত খাবার গ্রহণ করা; (ii) অতিরিক্ত ফাষ্ট ফুড খাওয়া; (iii) বিশেষ দিনের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করা; (iv) প্রতিদিন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণে খাওয়া; (v) অতিমাত্রায় তরল পানীয় পান করা।

২। **জীবন যাত্রা প্রণালী:** (i) অলস ও আয়েসী জীবন যাপন; (ii) উপার্জনের অধিকাংশ অর্থ খাবার খেয়ে ব্যয় করা; (iii) তরঙ্গ-তরঙ্গীদের বাড়ির বাইরে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ; (iv) নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা; (v) কায়িক পরিশ্রম নেই এমন চাকুরী করা (ডেক্ষ জব)।

৩। **শিক্ষার অভাব:** (i) স্তুলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা; (ii) ভালো খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা; (iii) ধারণার অভাবে বাচ্চাদের মাত্রাত্তিরিক্ত খাওয়ানো; (iv) খাবারের প্রতি সামাজিক আকর্ষণ; (v) সুস্থান্ত্র সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৪। **গর্ভধারণ:** গর্ভবতী মায়েদের স্বাভাবিকের চাইতে বেশি খাবার গ্রহণ করতে হয়। এতে গর্ভকালীন সময়ে দেহের ওজন বেড়ে যায়। সন্তান প্রসবের পরও অনেক মহিলা এ অতিরিক্ত ওজন আর কমাতে পারে না। ফলে স্তুলতা দেখা দেয়।

৫। **নির্দ্রাহীনতা:** রাতে ৭ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হৃষিকেন্দ্রিক পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধাপ্রতা বেড়ে যায় ফলে অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে দেহের ওজন বাঢ়ানোয় ভূমিকা রাখে।

৬। **ওষুধ সেবন:** কিছু কিছু ওষুধ যেমন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ এবং বিষন্নতা বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ নিয়মিত সেবন করলে স্তুলতার প্রবণতা দেখা দেয়।

৭। **স্বাস্থ্যগত ও জিনগত সমস্যা:** অনেকস্থে অন্তঃক্ষরা গ্রস্তির অস্বাভাবিকতা, নিম্ন বিপাক হার প্রভৃতি স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং জিনগত সংবেদনশীলতা মানুষের স্তুলতার কারণ হয়ে দাঢ়ায়।

৮। **অসুস্থি:** হাইপোথাইরয়োজিজ্ম (hypothyroidism), কুসিং সিন্ড্রোম (Cushing syndrome), পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (polycystic ovary syndrome), প্রাদার-উইলি সিন্ড্রোম (Prader-Willi syndrome) প্রভৃতি অসুস্থজনিত কারণে স্তুলতা দেখা দিতে পারে।

স্তুলতা প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণের উপায়

১। **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম:** স্তুলতা নিয়ন্ত্রণের প্রধান চিকিৎসা হলো খাবার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম। অতিরিক্ত লবণ, মিষ্ঠি ও চর্বি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব পরিহার করে প্রতিদিন আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। বেশি পরিমাণ ফল-মূল, শাক-সবজি, ডাল, বাদাম ইত্যাদি খেতে হবে। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা শরীরের ওজন কমানো যায়। নিয়মিত হাটার অভ্যাস করতে হবে।

২। **ওষুধ সেবন:** ক্ষুধা কমানোর কিংবা চর্বি শোষণ রোধ করে এমন ওষুধ সেবন করে স্তুলতা রোধ করা যায়। তবে নিজে নিজে ওষুধ সেবন করা যাবে না। ওষুধ ব্যবহারের জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FDA কর্তৃক অনুমোদিত Orlistat (Xenical), Phentermine (Suprenza), Lorcaserine (Belviq) ওষুধ বর্তমানে স্তুলতা নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। **GI হৃষিকেন্দ্রিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হৃষিকেন বা GI হৃষিকেনের ব্যবহার স্তুলতাকে দ্রুত হাস করে। ফলে বিশেষ সংকট দূরীকরণে এসব হৃষিকেন ম্যাজিক বুলেট (magic bullet) হিসেবে কাজ করছে।**

৪। **গ্যাস্ট্রিক বেলুনের ব্যবহার:** খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম কিংবা ওষুধে স্থুলতা না কমলে গ্যাস্ট্রিক বেলুন (gastric balloon) ব্যবহার করে ওজন কমানো যায়।

৫। **ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি:** স্থুলতা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ফলপ্রসূ চিকিৎসা হলো ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি (bariatric surgery) যার মাধ্যমে দেহ হতে সঞ্চিত চর্বি অপসারণ করা যায়। 40 kg/m^2 কিংবা এর বেশি BMI সম্পর্কে ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যাবিয়াট্রিক সার্জারির পরামর্শ দেয়া হয়।

৬। **চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার:** উচ্চ চর্বিযুক্ত দুষ্ফুর জাতীয় চিজ ও বাটার, ফাস্টফুড এবং কোল্ড ড্রিংস পরিহার করে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

৭। **ফল ও সজি আহার:** প্রধান খাবার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষুধা লাগলে ফল ও ফলের রস খেতে হবে। সবুজ সালাদ একদিকে যেমন ক্ষুধা মেটায় অন্যদিকে দেহের ওজন কমায়। স্থুলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিনের খাবারে প্রচুর পরিমাণ সবুজ সজি ও ফলমূল যোগ করতে হবে।

৮। **চিনিযুক্ত খাবার পরিহার:** চিনিযুক্ত খাবার যেমন-মিষ্ঠি, চা, কফি, চকোলেট, পুড়ি, ড্রিংস, কেক ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। কেননা এসব খাদ্য শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি যোগায় এবং স্থুলতা বৃদ্ধি করে।

৯। **সঠিক বিনোদন:** বাচ্চাদের টেলিভিশন দেখা, ভিডিও গেম, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিনোদনে উৎসাহিত না করে তাদের নিয়ে মাঠে খেলতে যাওয়া, পার্কে ঘোরাঘুরি করা, রাস্তায় হাটা, বাসার ছান্দো বেড়ানো ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দিলে স্থুলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০। **মনের ইচ্ছা ও সচেতনতা:** দেহের ওজন কমানোর জন্য মনের ইচ্ছাটাকে দৃঢ়ভাবে মনে প্রাণে ধারণ করতে হবে। স্থুলতা অনেক রোগের কারণ-এব্যাপারেও সবাইকে সচেতন হতে হবে।

১১। **সুষম খাদ্য তালিকা:** প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত মুটিয়ে যাওয়ার মাত্রা নির্ণয় করে বয়সানুসারে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশনা মেলে চলতে হবে।

১২। **সরল জীবন ধাপন করা:** সরল ও সুখী জীবন ধাপন, ধূমপান পরিত্যাগ করা, দৃঢ় মনোবলের অধিকারি হওয়া, সর্বদা সূজনশীল চিন্তা করা ইত্যাদি কাজ মানুষকে ভালো স্থান্ত্রের অধিকারি করে এবং স্থুলতা থেকে রক্ষা করে।

সারসংক্ষেপ

- পরিপাক:** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্বণীয় ও কঠিন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ ও আণীকরণের উপযোগী হয় তাকে পরিপাক বা হজম বলে।

- যান্ত্রিক পরিপাক:** কতগুলো সঞ্চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের পরিপাক নালির ভেতরে প্রাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

- রাসায়নিক পরিপাক:** অন্যদিকে কতগুলো ধারবাহিক বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সরল ও গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

- খাদ্যসার শোষণ:** যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিপাকনালি হতে রক্তে প্রবেশ করে তাকে খাদ্যসার শোষণ বলে। খাদ্যসার শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপাককৃত অধিকাংশ খাদ্যসার ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানির সাথে ক্ষুদ্রান্ত্রের মুমেনে সক্রিয় পরিবহন বা ব্যাপন কিংবা এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে শোষিত হয়।

- জৈব রসায়নাগার:** যকৃতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এজন্য যকৃতকে মানবদেহের জৈব রসায়নাগার বলা হয়।

- গ্লাইকোজেনেসিস:** মানুষের যকৃতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্রেষিত হওয়ার পদ্ধতিকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।

- মিশ্র গ্রহি:** মানবদেহের যে গ্রহি একাধারে এনজাইম নিঃসরণ ও হরমোন ক্রয় করে তাকে মিশ্র গ্রহি বলা হয়। যেমন-অগ্ন্যাশয়।

■ ডিঅ্যামিনেশন: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিন মূলক (-NH₂) অপসারিত হয় তাকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো অ্যাসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো অ্যাসিড ও অ্যামিন মূলক তৈরি করে।

■ লাইপোজেনেসিস: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে লিপিড সৃষ্টি হয় তাকে লাইপোজেনেসিস বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে উহা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইডে (লিপিড) রূপান্তর করে।

■ গ্লাইকোজেনোলাইসিস: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যকৃতের সংগ্রহ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সংগ্রহ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়।

■ মেম্ব্রেন এনজাইম: অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা মেম্ব্রেনে ক্রতৃপক্ষে এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা মেম্ব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে মেম্ব্রেন এনজাইম বলে।

■ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হরমোন: খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিকোকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হরমোন বা জিআই হরমোন নামে পরিচিত।

■ স্থূলতা: স্থূলতা এক ধরনের স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাতে দেহের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত চর্বি সংগ্রহ হয়ে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবনকাল হাস করে মৃত্যুরুকি বাঢ়িয়ে দেয়।

- মুখ থেকে পায়ুছিদু পর্যন্ত মানব পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯ ফুট যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রায় 11.5 লিটার পরিপাককৃত খাদ্য, তরল ও পরিপাক রস প্রবাহিত হয়।
- খাদ্য পরিপাকের সাথে শতাধিক এনজাইম জড়িত। দেহে সঠিকভাবে পরিপাক এনজাইম উৎপাদিত না হলেই বদহজম দেখা দেয়।
- মানুষের পাকস্থলি প্রতিদিন প্রায় 2.5 লিটার গ্যাস্ট্রিক রস উৎপাদন করে। প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর মানব পাকস্থলির প্রাচীরের মিউকাস আবরণ নতুন করে সৃষ্টি হয়, তা না হলে পাকস্থলি নিজেই পরিপাক হয়ে যেতো।
- মানুষের ভক্ষণকৃত খাদ্যের পরিপাক ও শোষণের 95% ই সংঘটিত হয় অন্ত্রে।
- মানুষের যকৃতকে একটি দ্রুততম প্রসেসর সহ সুপার কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা যায়, কারণ এটি ধারাবাহিকভাবে 200 এর অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। একটি সুস্থ যকৃত প্রতিদিন প্রায় 720 লিটার রক্ত পরিশোধন করে।
- মানবদেহে অতি উচ্চ ক্যালরিয়ুক্ত খাবার হজম হতে সময় লাগে ৬ ঘণ্টা কিন্তু শর্করা জাতীয় খাদ্য হজম হতে সময় লাগে মাত্র 2 ঘণ্টা।
- মানব পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান হজমে সহায়তাকারী প্রায় 400 প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া মাত্রগর্ভে বিদ্যমান শিশুর পরিপাকতন্ত্রে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু শিশু জন্মের সময় কিংবা জন্মের পর এসব ব্যাকটেরিয়া মায়ের দেহ হতে এবং প্রকৃতি থেকে শিশুর দেহে অর্জিত হয়।

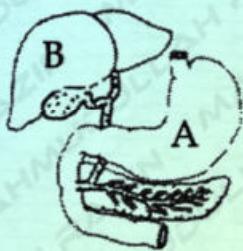
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

ক. যকৃত	খ. অগ্ন্যাশয়	গ. পিটুইটারি
ব. কোনটি অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত এনজাইম নয়?		ঘ. শ্রেণীকরণ
ক. লাইপেজ	খ. ট্রিপসিন	গ. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ
ব. পরিপাকে সাহায্যকারী উৎসেচক কোনটি?		ঘ. কোলাজিনেজ
ক. গ্লুকাগন	খ. এড্রিনালিন	গ. ইনসুলিন
ব. ল্যাকটিয়েল হলো এক ধরনের-		ঘ. সিক্রেটিন
ক. প্লাজমা	খ. মনোসাইট	গ. লসিকা
		ঘ. বেসোফিল

- | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| ৫. | উদ্বীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- | | | | | | | |
| ৬. রাজিবের ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১.২ মিটার। স্থূলতার কারণে সে শুধুমাত্র সজি দিয়ে ভাত খায়। কথাটি শুনে ডাঙ্কার বললেন মাঝে মধ্যে মাছ-মাংসও খেতে হবে, তাতে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে। | | | | | | | | |
| ৭. উদ্বীপকে উল্লিখিত ডাঙ্কারের নির্দেশিত খাবার সমূহ কীভাবে রাজিবের শরীর গঠনে সাহায্য করে? | | | | | | | | |
| ক. অ্যামাইনো এসিড সৃষ্টির মাধ্যমে | | গ. প্রচুর স্লেহযুক্ত খাবারের কারণে | | | | | | |
| খ. বেশি রক্ত উৎপাদনের মাধ্যমে | | ঘ. প্রচুর শর্করাযুক্ত খাবারের কারণে | | | | | | |
| ৮. | রাজিবের দেহজর সূচক (Body Mass Index) কোনটি? | | | | | | | |
| ক. ৩১ | | খ. ৩২ | | গ. ৩৩ | | | | |
| ৯. | স্কুদ্রান্ত্রের কোন স্তরে গবলেট কোষ থাকে? | | | | | | | |
| ক. সেরোসা | | খ. মিউকোসা | | গ. সাবমিউকোসা | | | | |
| ১০. | নিচের কোনটি হরমোন? | | | | | | | |
| ক. পেপসিন | | খ. ট্রিপসিন | | গ. ইনসুলিন | | | | |
| ১১. | শর্করা পরিপাকে যা ঘটে- | | | | | | | |
| i. জটিল শর্করা → মল্টেজ → গ্লুকোজ, ii. গ্লাইকোজেন → ডাইস্যাকারাইড → ফ্রাণ্টেজ, iii. ল্যাকটোজ + H ₂ O → গ্লুকোজ + গ্যালাট্রোজ,- নিচের কোনটি সঠিক? | | | | | | | | |
| ক. i ও ii | | খ. ii ও iii | | গ. i ও iii | | | | |
| মানবদেহের যে অঙ্কে আমরা কলিজা বলি তার প্রকৃত নাম যকৃত। এটি দেহের এটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। এটি ঠিকমতো কাজ না করলে মানুষের পেটের পীড়া দেখা দেয়। | | | | | | | | |
| -উদ্বীপকের আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- | | | | | | | | |
| ১২. | যকৃত থেকে নিঃসৃত রসের নাম কী? | | | | | | | |
| ক. পেপসিন | | খ. পিন্তুরস | | গ. গ্যাস্ট্রিক রস | | | | |
| ১৩. | যকৃতের কাজ- | | | | | | | |
| i. রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ যকৃতে গ্লাইকোজেনেরপে সঞ্চিত হয়, ii. যকৃত অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া সৃষ্টি করে, iii. যকৃত পিন্তুরস জমা করে - নিচের কোনটি সঠিক? | | | | | | | | |
| ক. i ও ii | | খ. ii ও iii | | গ. i ও iii | | | | |
| ১৪. | পিন্তুরস ক্ষরিত হয় কোনটি থেকে? | | | | | | | |
| ক. লালগ্রাহ্ণি | | খ. পাকস্থলি | | গ. যকৃত | | | | |
| ১৫. | কোনটি আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ? | | | | | | | |
| ক. টায়ালিন | | খ. অ্যামাইলেজ | | গ. ট্রিপসিন | | | | |
| ১৬. | টায়ালিন নিঃসৃত হয় কোনটি থেকে ? | | | | | | | |
| ক. পাকস্থলি | | খ. লালগ্রাহ্ণি | | গ. যকৃত | | | | |
| ১৭. | স্কুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি ? | | | | | | | |
| ক. ফার্ভাস | | খ. ডিওডেনাম | | গ. জেজুনাম | | | | |
| ১৮. | ঝুড়ান্ত্রের অংশ নয় কোনটি ? | | | | | | | |
| ক. ফার্ভাস | | খ. ডিওডেনাম | | গ. ইলিয়াম | | | | |



(ক) শর্করার খাদ্যসার কী?

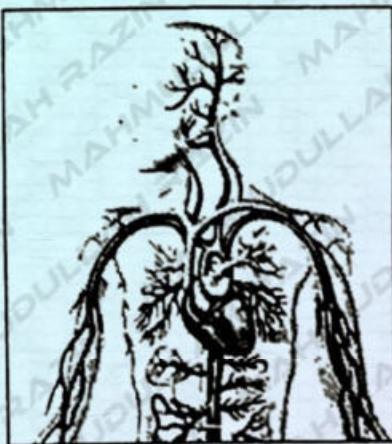
(খ) পরিপাক ও শোষণ বলতে কী বোঝ ?

(গ) উদ্দীপকের A চিহ্নিত অংশে খাদ্যের পরিণতি বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে B অংশ মানবদেহে কিভাবে সংযুক্ত ও বিপাকে ভূমিকা পালন করে বিশ্লেষণ করে।

অধ্যায় ৪

মানব শারীরতত্ত্ব: রক্ত ও সঞ্চালন



আমাদের দেহের ভেতর একটি বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধ কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। বৃটিশ বিজ্ঞানী William Harvey, 1628 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রাণিদেহে এ ধরনের একটি তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এর নাম রক্ত সংবহনতন্ত্র। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং এর কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words): রক্ত, প্রাজমা, লসিকা, রক্তসঞ্চালন, কার্ডিয়াক পেশি, হৃৎক্র, ব্যারোরিসেন্টর, সিস্টেমিক সংবহন, অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যটাক, হার্ট ফেইলিউর, পেস মেকার, করোনারি বাইপাস, অ্যানজিওপ্লাস্টি।

পি঱িয়ড সংখ্যা ১৪। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল) -

- রক্ত কণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যবহারিক: রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।
- হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।
- হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনিজি আঁশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেন্টর (baroreceptors) এবং আয়তন রিসেন্ট্রের (volume receptors) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে।
- হৃৎরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেস মেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মানবদেহে সংবহনতন্ত্র ক্রতগুলো অঙ্গ ও নালিকার সম্মত গঠিত একটি বিশাল তন্ত্র যা রক্ত, পুষ্টি পদার্থ, হরমোন, রেচন বর্জ্য, শ্বসন গ্যাস ইত্যাদির প্রবাহ অঙ্গুল রাখে এবং কোষ হতে কোষে বিভিন্ন বস্তু আদান-প্রদান করে। এ তন্ত্র ছাড়া দেহ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে যেমন কোন প্রতিরোধ গড়তে পারে না তেমনি দেহের অভ্যন্তরীন পরিবেশের তাপ ও pH নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সাম্যবস্থা (homeostasis) বজায় রাখতে পারে না। মানবদেহের সংবহনতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: রক্তসংবহনতন্ত্র (cardiovascular system) যা রক্ত পরিবহনের সাথে জড়িত এবং লসিকা তন্ত্র (lymphatic system) যা লসিকা পরিবহনের সাথে জড়িত। মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র বা কার্ডিওভাস্কুলার তন্ত্র প্রধানত হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহিকা নিয়ে গঠিত।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাইলফলক (Milestones of Cardiovascular system)

১৬শ খ্রিস্টপূর্ব: প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ইবার্স পেপাইরাস (Ebers Papyrus)-এ ধমনি ও হৃৎপিণ্ডের সংযোগ সম্পর্কিত বিবরণ উল্লেখ আছে।

৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব: ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক শুশ্রূতা (Sushruta) মানবদেহে জীবজ তরলের (vital fluids) প্রবাহ বর্ণনা করেন।

২য় প্রিস্টোড: গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন (Galen) রক্তনালি দ্বারা রক্ত প্রবাহ, শিরা ও ধামনিক রক্ত শনাক্তকরণ ও এদের ভিন্ন ধরনের কাজের বিবরণ দেন।

১৬২৮ প্রিস্টোড: ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভি (William Harvey) প্রথম মানবদেহের রক্ত সংবহনের বর্ণনা করেন।

১৭০৬ প্রিস্টোড: ফরাসি অ্যানাটমির অধ্যাপক রেমন্ড ডি ভিউসেন্স (Raymond de Vieussens) প্রথম হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ ও নালিকা সম্পর্কে বিবরণ দেন।

১৭৩৩ প্রিস্টোড: ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হেলস (Stephen Hales) প্রথম রক্তচাপ পরিমাপ করেন।

১৮১৬ প্রিস্টোড: ফরাসি চিকিৎসক রেন লিনেক (Rene Laennec) স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

১৯৫২ প্রিস্টোড: আমেরিকান শল্যচিকিৎসক জন লুইস (John Lewis) প্রথম সফলভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন করেন।

১৯৬৭ প্রিস্টোড: দক্ষিণ আফ্রিকার শল্যচিকিৎসক ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড (Christiaan Barnard) সফলভাবে একজনের দেহ হতে অন্যজনের দেহে হৃৎপিণ্ড সংস্থাপন করেন।

১৯৮২ প্রিস্টোড: আমেরিকান শল্যচিকিৎসক রবার্ট জারভিক (Robert Jarvik) প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করেন এবং শল্যচিকিৎসক উইলেম ডি ড্রিস (Willem DeVries) তা মানবদেহে সংস্থাপন করেন।

৮.১ রক্ত (Blood)

রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যৌজক কলা যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্লাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বক্স রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে পুষ্টি পদার্থ, খসন গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের অশ্বচ্ছ, দীর্ঘ ক্ষারীয়, ঘন, পানি অপেক্ষা ভালী, লবণ্যাক ও আঠালো চট্টটে তরল পদার্থ। এর pH 7.35-7.45, ঘনত্ব 1.06 g/ml, আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.05-1.06, তাপমাত্রা 36-37°C। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহে 5-6 লিটার এবং মহিলার দেহে 4.5 - 5.5 লিটার রক্ত থাকে যা মোট দেহিক ওজনের 7- 8%। রক্ত নিউটনের সান্দৰ্ভ সূত্র (Newton's Law of Viscosity) মেনে চলে না।

রক্তের কার্য্যবলি

১। খসন গ্যাস পরিবহন: রক্তের প্লাজমা এবং লোহিত কণিকা (RBC) দ্বারা O₂ ফুসফুস হতে কোষ-কলায় এবং CO₂ কোষ-কলা হতে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

২। খাদ্যবস্তু পরিবহন: বিভিন্ন খাদ্যসার যেমন- গ্রুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও প্রিসারল এবং ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানি অঙ্গ থেকে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছায়।

৩। বিবিধ কষ্ট পরিবহন: রেচন বর্জ্য, হরমোন, অ্যান্টিবিডি, খনিজলবণ, এনজাইম, প্লাজমাপ্রোটিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।

৪। তাপসাম্যতা রক্ষা: যকৃত ও পেশিকোষে খাদ্যসার জারণের মাধ্যমে দেহে প্রচুর পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়। এ তাপ রক্ত দ্বারা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে দেহের তাপ সাম্যতা রক্ষা করে।

৫। রোগ জীবাণু প্রতিরোধ: রক্তের শ্বেত কণিকা (WBC) বিভিন্ন রোগের জীবাণু ভক্ষণ করে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবিডি ও এনজাইম সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

৬। রক্তপাত প্রতিরোধ: রক্তের অণুচক্রিকা ও প্লাজমাপ্রোটিন সম্মিলিতভাবে ক্ষতস্থানে রক্ততঞ্চল ঘটিয়ে দেহের রক্তপাত প্রতিরোধ করে।

৭। উক্ততা প্রতিরোধ: রক্ত কোষ ও কলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করে দেহকে উক্ততা হতে রক্ষা করে।

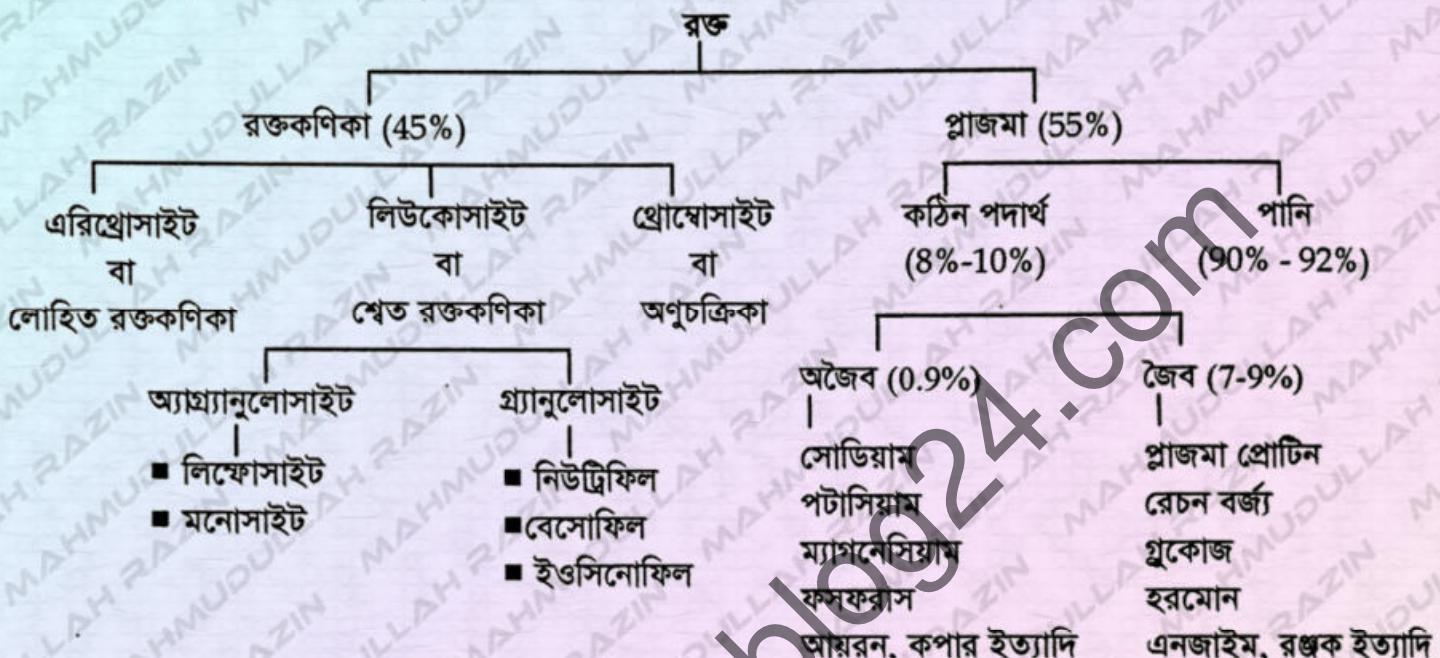
৮। হোমিওস্ট্যাসিস রক্ষা: রক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য (হোমিওস্ট্যাসিস) রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। pH নিয়ন্ত্রণ: রক্ত অম্ল ও ক্ষারের রাসায়নিক বাফার সৃষ্টি করে দেহতরলের pH নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। **রোগ নির্ণয়:** রোগ, সংক্রমণ বা অন্য কোন কারণে দেহের কোনরকম পরিবর্তন ঘটলে রক্তের উপাদানের পরিবর্তন দেখা যায়। একারণে রক্তের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় (clinical diagnosis) করা হয়।

রক্তের উপাদান

মানুষের রক্ত নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত-



রক্তের গঠন, রক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া, রক্ত সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখাকে হেমাটোলজি (Hematology) বলে। গ্রিক শব্দ *haima* =রক্ত হতে এ শব্দটির উৎপত্তি।

১। প্লাজমা বা রক্তরস (Plasma)

রক্তের দৈর্ঘ্য ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে। এটি একটি বহিঃকোষীয় তরল যেখানে বিপুল পরিমাণ আয়ন, জৈব ও অজেব বস্তুর সমাহার থাকে। রক্তরসের ঘনত্ব 1.025 g/ml এবং $\text{pH} = 7.4$ । রক্তের মোট আয়তনের 55% হলো রক্তরস। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় 3 লিটার প্লাজমা থাকে যা দেহের ওজনের 5%। রক্তরসের অধিকাংশই পানি (90%-92%)। এতে কষ্টিন পদার্থ (8%-10%) হিসেবে বিভিন্ন অজেব ও জৈব পদার্থ থাকে।

□ **অজেব পদার্থ (0.9%):** বিভিন্ন লবণের আয়ন (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , P^{3+} , Fe^{2+} , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , Mn^{2+} , Cl^- , Zn^{2+}), কপার, আয়োজিন ইত্যাদি।

□ **জৈব পদার্থ (7-9%):** রক্তরসে বিদ্যমান জৈব পদার্থগুলো হলো:

(ক) **দ্রবীভূত প্রোটিন:** মানুষের রক্তরসে প্রায় 7 g/dL ঘনত্বে প্রোটিন অণু দ্রবীভূত থাকে। এদের প্লাজমা প্রোটিন বলে। রক্তরসে দ্রবীভূত উল্লেখযোগ্য প্রোটিন হলো-(প্রোথিবিন, ফাইব্রিনোজেন, অ্যালবুমিন, প্রোবিউলিন, ইমিউনোগ্লোবিন, সাইটোক্রোম সি ইত্যাদি।

(খ) **নাইট্রোজেনঘাতিত বর্জ্য:** ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

(গ) **অন্যান্য যৌগ:** হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, এনজাইম, বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন, ক্রিয়েটিন, ফাট, কোলেস্টেরল, গ্লুকোজ ইত্যাদি।

রক্তরসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন কলায় রক্তরসের উপাদানের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায় যা যকৃত ও বৃক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সিমুলেটেড বডি ফ্লুইড (Simulated body fluid - SBF) একটি বিশেষ ধরনের দ্রবণ যার আয়ণিক উপাদান অনেকটা রক্তরসের মতো।

কাজ:

১। প্লাজমা রক্ত কণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্য রক্ষা করে।

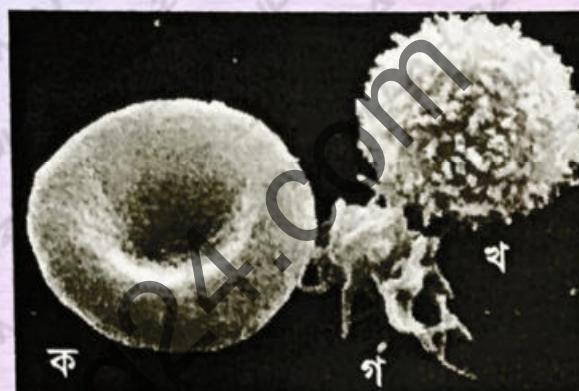
- ২। এটি অঙ্গ থেকে খাদ্যসার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি ইত্যাদি পরিবহন করে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছে দেয়। এছাড়া এটি শ্বসন গ্যাস, রেচন বর্জন, হরমোন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি পরিবহন করে।
- ৩। এটি রক্তে অঙ্গ-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, রক্ততন্ত্রে এবং দেহের তাপ সাম্যতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- ৪। এটি দেহের প্রোটিন আধার হিসেবে কাজ করে।
- ৫। এটি আন্তঃকোষীয় আয়ণিক সাম্যতা রক্ষার মাধ্যমে দেহকে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ও রোগের হাত হতে সুরক্ষা করে।

২। রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলা হয়। এগুলো হেমাটোপোয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এগুলো অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়। রক্তের 45% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা-

- (ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা
- (খ) লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা
- (গ) থ্রোমোসাইট বা অণুচক্রিকা

(ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা



চিত্র ৪.৩ ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃশ্যমান মানুষের রক্তকণিকা:

(ক) লোহিত রক্তকণিকা, (খ) শ্বেত রক্তকণিকা, (গ) অণুচক্রিকা

রক্তকণিকার আযুক্তাল 120 দিন। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে 20 লক্ষের অধিক লোহিত রক্তকণিকার মৃত্যু হয় এবং সম্পরিমাণ সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর লোহিত কণিকাগুলো যকৃত ও পুরীভূত হয়। এদের লৌহ অংশ ফেরিটিন (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা হয়ে (এগুলো নতুন RBC সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে) দেহে থেকে যায়, কিন্তু পিগমেন্টগুলো বিলিভিন বা বিলিভার্ডিন হিসেবে দেহ হতে পিণ্ডের সাথে রেচন প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশিত হয়।

মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা প্রতি 60 সেকেন্ডে বা 1 মিনিটে একবার সময় দেহ পরিভ্রমণ করে। একজন পরিণত সুস্থ মানুষের দেহে সর্বদা প্রায় 20-30 ট্রিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা বিদ্যমান থাকে যা সংখ্যার দিক থেকে দেহের সকল কোষের প্রায় 70%।

রাসায়নিকভাবে লোহিত রক্তকণিকার 60-70% পানি এবং 30-40% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় 90%ই হিমোগ্লোবিন। অবশিষ্ট 10% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

লোহিত রক্তকণিকার কাজ:

- ১। লোহিত রক্তকণিকা অঙ্গহিমোগ্লোবিন হিসেবে ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 পরিবহন করে।
- ২। এরা পটাসিয়াম বাইকার্বনেট হিসেবে কোষ-কলা থেকে ফুসফুসে সামান্য পরিমাণে CO_2 পরিবহন করে।
- ৩। এরা রক্তের সান্দুতা (viscosity) রক্ষা করে।
- ৪। এদের হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অতঙ্কোষীয় বস্তু বাফারজাপে (as buffer) রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা রক্ষা করে।
- ৫। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন যকৃতে ভেঙ্গে পিউরোজক বিলিভিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।
- ৬। এদের প্লাজমা আবরণীতে বিদ্যমান অ্যান্টিজেন প্রোটিন মানুষের রক্তের গ্রহণ নির্ধারণ করে।
- ৭। লোহিত রক্তকণিকা এনজাইমসমূহ নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করতে পারে যা এন্ডোথেলিয়াল কোষের *L-arginine* এর মতো ব্যবহৃত হয়।
- ৮। এরা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন করতে পারে যা রক্তনালির সংকোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে।
- ৯। এরা অনেকসময় দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান (immune response) করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে এক ধরনের মুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয় যা জীবাণুর কোষ প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে উহাকে ধ্রংস করে।

(খ) লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা

(Leucocytes or White Blood Cells or WBC; Gr. *leucos* = colourless, *kytos* = cell)

রক্তরস এবং লসিকায় বিদ্যমান স্বচ্ছ, নিউক্লিয়াসযুক্ত, অ্যামিবয়েড, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার গঠন বিশিষ্ট রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা বলে। এদেরকে দেহের আম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক (mobile defensive units) বলা হয়।

শ্বেত রক্তকণিকা অ্যামিবয়েড প্রকৃতির হওয়ায় এরা রক্তবাহিকার ভেতর থেকে বের হয়ে সহজেই ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করতে পারে। এরা মানুষের অনাক্রম্য তন্ত্রেও অংশ। শ্বেত রক্তকণিকার ক্যানসারকে লিউকেমিয়া (leukemia) বলে। অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ (hematopoietic stem cells) হতে মায়েলোপয়সিস (myelopoiesis) প্রক্রিয়ায় শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। এছাড়া পুরীভূত হতেও কিছু শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। শ্বেত রক্তকণিকার মৃত্যুর পর অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকা দ্বারা ভক্ষিত হয়।

কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এদের শ্বেত রক্তকণিকা নামে ডাকা হয় (প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন)। আকারে এরা লোহিত রক্তকণিকা হতে বড় এবং এদের গড় ব্যাস 7.5-20 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। এদের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আকৃতির



চিত্র ৪.২ লোহিত রক্তকণিকা (ক) পৃষ্ঠদৃশ্য (খ) পার্শদৃশ্য

নিউক্লিয়াস থাকে। রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম। প্রাণ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে ৬-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে অর্থাৎ $RBC:WBC=600:1$ । আয়তনের দিক দিয়ে শ্বেত রক্তকণিকা পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র ১%।

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক থাকলে তাকে লিউকোসাইটোসিস (leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে লিউকোপেনিয়া (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। লিউকেমিয়া (leukemia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন কলায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান কুপার কোষ (Kupffer cells) এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অনাক্রম্যতত্ত্বের অংশ হিসেবে কাজ করে।

রাসায়নিকভাবে শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিউপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাস্কুলিবিক অ্যাসিড ও প্রোটিন বিশেষ এনজাইম সমূহ। অস্থিমজ্জা, প্রীহা ও লসিকাফ্টস্টি থেকে লিউকোসাইট উৎপন্ন হয়।

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ

কোষের আকৃতি, নিউক্লিয়াসের গঠন প্রকৃতি ও সাইটোপ্লাজমের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত দুই প্রকার, যথা-

১। গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার লিউকোসাইট (Granulocytes)

২। অ্যাগ্র্যানুলোসাইট বা অদানাদার লিউকোসাইট (Agranular leucocytes):

১। গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার লিউকোসাইট (Granulocytes): এ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং নিউক্লিয়াস ছোট ও খণ্ডায়িত। বর্ণ ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে এরা তিন ধরনের-

(ক) নিউট্রোফিল (Neutrophils): শ্বেত রক্তকণিকার সর্বাধিকই (60-70%) নিউট্রোফিল ধরনের। এদের সাইটোপ্লাজমে বর্ণ নিরপেক্ষ দানা থাকে যেগুলো ইওসিন রঞ্জকে বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। নিউক্লিয়াস 2-7 খণ্ড বিশিষ্ট যেগুলো সরু ফিতা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে এদের সংখ্যা 3000-6000 টি। এদের জীবনকাল 12 ঘণ্টা থেকে 3 দিন। এরা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

(খ) বেসোফিল (Basophils): শ্বেত রক্তকণিকার সবচেয়ে কম অংশ (0.5%) বেসোফিল ধরনের। এদের সাইটোপ্লাজমে ক্ষারাসক্ত দানা থাকে যারা ইওসিন রঞ্জকে নীল বর্ণ ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস বিভিন্নভাবে খণ্ডায়িত থাকে। প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 25-200টি। এদের জীবনকাল 9-18 মাস। এরা হেপারিন (heparin) ও হিস্টামিন (histamine) নামক দুই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। অধিক রক্ত প্রবাহের জন্য হিস্টামিন রক্তনালিকে প্রসারিত করে। হেপারিন রক্তনালিতে রক্তকে জয়াট বাঁধতে দেয় না।



চিত্র ৪.৩ বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা

(গ) ইউসিনোফিল (Eosinophils): শ্বেত রক্তকণিকার ২-৪% ইউসিনোফিল ধরনের। এদের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান অস্থাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে। নিউক্লিয়াস 2-3 খণ্ড বিশিষ্ট। প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 100-400টি। এদের জীবনকাল 3-5 দিন। এরা দেহের অ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যালার্জি, পরজীবীর সংক্রমণ, প্রীহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইউসিনোফিল সংখ্যা বেড়ে যায়।

২। অ্যাগ্র্যানুলোসাইট বা অদানাদার লিউকোসাইট (Agranular leucocytes): এ ধরনের লিউকোসাইটের সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন এবং নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও অখণ্ডায়িত। এরা দুই ধরনের-

(ক) মনোসাইট (Monocytes): এগুলো অস্থিমজ্জায় সৃষ্টি অনিয়তাকার ও 20-25 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট শ্বেত রক্ত কণিকা। এদের নিউক্লিয়াস ছোট ও বৃক্ষ আকৃতির, সাইটোপ্লাজম বেশি। প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 100-700টি। এদের জীবনকাল 10-12 দিন। এরা কলার ম্যাক্রোফেজ হিসেবে মৃতকোষ ভক্ষণ করে।

(খ) লিফ্ফোসাইট (Lymphocytes): এগুলো লসিকাতন্ত্রে সৃষ্টি হয়। এরা গোলাকার ও 7-20 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। এদের নিউক্লিয়াস বড় এবং সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশই দখল করে রাখে। শ্বেত রক্তকণিকার 25%ই লিফ্ফোসাইট। এদের জীবনকাল 100-120 দিন। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে।

মানব রক্তে তিনি ধরনের লিফ্সোসাইট থাকে, যথা- T কোষ, B কোষ এবং NK কোষ।

■ **T কোষ:** থাইমাস প্রস্তরির থাইমোসাইটস থেকে সৃষ্টি হয় বলে এদের **T কোষ** বা **T লিফ্সোসাইটস** বলে। এরা কোষ মাধ্যম অন্তর্ক্রিয়তায় (cell-mediated immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **B কোষ :** অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ (HSCs) হতে B কোষ বা B লিঙ্গোসাইট সৃষ্টি হয়। এরা রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (humoral immunity) শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **NK কোষ:** NK কোষ বা Natural killer কোষ বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অন্য কোষের জন্য বিষাক্ত এবং অনাক্রম্যত্বের জন্য বিপদজনক। এরা ভাইরাসের সংক্রমণে খুব দ্রুত সাড়া প্রদান করে এবং সংক্রমণের ৩ দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। এরপর এরা দেহে টিউমার সৃষ্টি করে।

লিউকোসাইট বা শ্রেত মুক্ত কণিকার কাজ

১। মনোসাইট ও নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটেসিস পদ্ধতিতে রোগের জীবাণু ভক্ষণ করে।

২। লিফ্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে, এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক (microscopic soldier) বলে।

৩। বেসোফিল হেপারিন (heparin) তৈরি করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তত্বন রোধ করে।

৪। দানাদার লিউকোসাইট হিস্টামিন (histamine) সৃষ্টি করে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে।

୬। ଇଉସିନୋଫିଲ ବ୍ରକ୍ତେ ପ୍ରସେଶକତ କମିର ଲାଭ୍ୟ ଏବଂ ଆଲାର୍ଜିକ ଅୟାନ୍ତିବଡ଼ି ଧବ୍ସ କରେ ।

(গ) থ্রোবোস্টেট বা অণচক্রিকা (Thrombocytes or Blood platelets):

রক্তে বিদ্যমান বণহীন, স্ফুদ, নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার রক্তকণিকাকে থ্রোমোসাইট বা অণুচক্রিকা বলে। এগুলো স্ফুদ, গোলাকার বা ডিম্বাকার রক্তকণিকা; এদের ব্যাস 2-4 মাইক্রোমিটার। প্রাণবয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে 2.5-5 লক্ষ থ্রোমোসাইট থাকে। এগুলো অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট (megakaryocytes) কোষ থেকে সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ও প্লেহায় ধৰ্মসপ্রাপ্ত হয়। এদের আয়ুস্কাল 2.5-9 দিন। প্লেহা ব্যতিত দেহের অন্য কোথাও অণুচক্রিকা সঞ্চিত থাকে না। লোহিত রক্ত কণিকার মতো এদের কোনো নিউক্লিয়াস নেই এবং এরা বিভাজিত হতে পারে না।

ଚିତ୍ର ୪.୪ ଅଣ୍ଟକ୍ରିକା

এদের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন ও ফসফেলিপিড। এদের সাইটোপ্লাজমে অ্যাকচিন, মায়োসিন, গ্লাইকোজেন, লাইসোসোম এবং ডেঙ্গ ও আলফা দানা থাকে। কোলাজেন ও ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন ধারণ করার জন্য এদের প্লাজমা আবরণী চরমভাবে ভাঁজযুক্ত। এরা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত তক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রিথোকাইনেজ (thrombokinase) এনজাইম সৃষ্টি করে।

অণচত্রিন্কার কাজः

১। অণুচক্রিকা ক্ষতস্থানে রক্ত তন্ত্বন ঘটায় এবং হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ (hemostatic plug=blood platelets+plasma proteins) গঠন করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

୧। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତନାଲିର କ୍ଷତିଥିଲୁ ଏବେଥେଲିଯାଳ ଆବରଣ ପୁନଗଠିନ କରେ ।

৩। এরা সেরাটোনিন নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত্রাস করে।

৪। এবা ফ্লাগেস্টাইলেসিস পদ্ধতিতে কার্বন কণা, ইমিউন কমপ্লেক্স ও ভাইয়াসকে ভক্ষণ করে।

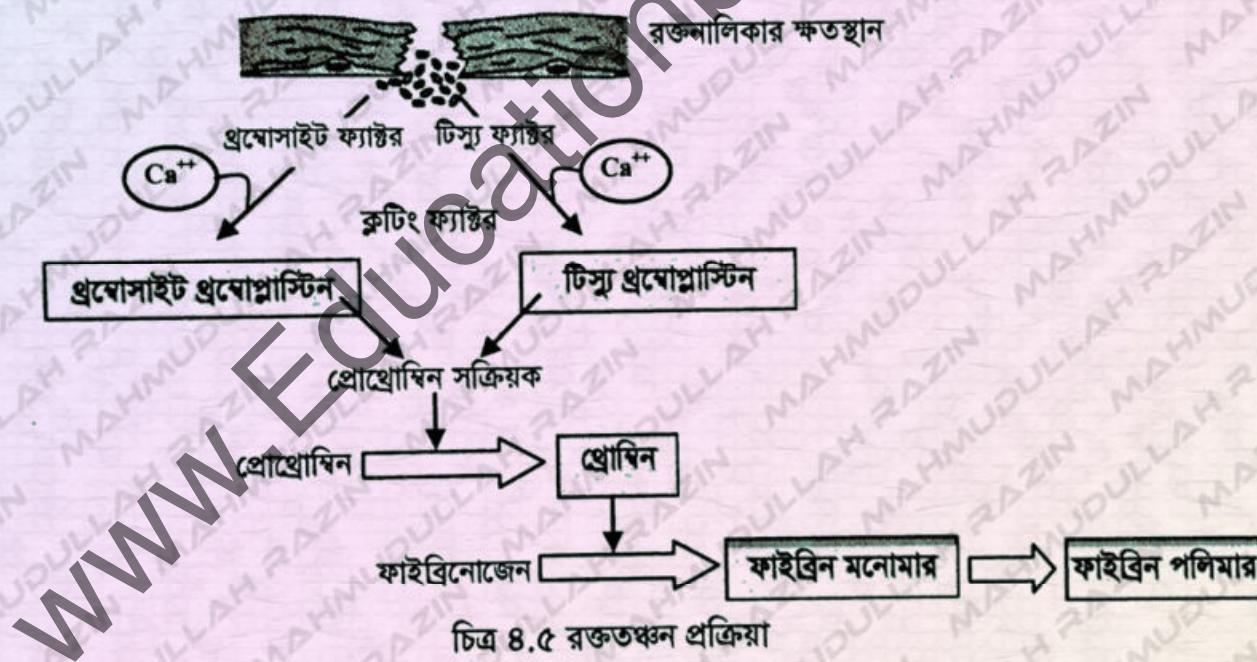
৫। এবা টিস্টোমিন ও 5HT (5-hydroxytryptamine) সংরক্ষণ করে যেগুলো অণচক্রিকা ভাঙ্গণের সময় মুক্ত হয়।

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ততন্ত্রন (Blood coagulation)

যে প্রক্রিয়ায় রক্ত তার তারলাতা হারিয়ে অর্ধ তরল পিণ্ড বা ক্লট (clott) পরিণত হয় তাকে রক্ততন্ত্রন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে। দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হলে সে স্থান হতে রক্তপাত ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাস্থিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততন্ত্রন প্রক্রিয়া বলে। রক্তের প্রাজমায় বিদ্যমান ফাইব্রিনোজেন নামক দ্রবণীয় প্রোটিন অদ্ববণীয় ফাইব্রিন জালকে পরিণত হয়ে রক্ততন্ত্রন ঘটায়। রক্ততন্ত্রন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এতে প্রায় 13টি রক্ততন্ত্রন ফ্যাক্টর (coagulation factors) বা উপাদান অংশগ্রহণ করে। এ ফ্যাক্টরগুলো রক্তকণিকা ও প্রাজমায় বিদ্যমান থাকে। রক্ততন্ত্রনের ফ্যাক্টরগুলো টেবিল-১ এ উল্লেখ করা হলো:

টেবিল-১: রক্ততন্ত্রন ফ্যাক্টরের তালিকা

Factor I	: Fibrinogen	Factor VIII	: Antihaemophilic factor A
Factor II	: Prothrombin	Factor IX	: Christmas factor
Factor III	: Thromboplastin	Factor X	: Antihaemophilic factor B
Factor IV	: Calcium ion	Factor XI	: Antihaemophilic factor C
Factor V	: Proaccelerin	Factor XII	: Hageman factor
Factor VI	: Does not exist	Factor XIII	: Fibrin stabilizing factor
Factor VII	: Proconvertin		



চিত্র ৪.৬ ফাইব্রিন পলিমার সৃষ্টি



চিত্র ৪.৭ ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আবদ্ধ

রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়া

ফ্যাট্টরগুলোর ধারাবাহিক কার্যকারিতায় ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। নিম্নে রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

১। আঘাত প্রাণির পর ক্ষতস্থানে রক্তনালি সঙ্কোচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয়। রক্তের অণুচক্রিকা রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

২। ক্ষতস্থানের অণুচক্রিকা এবং টিস্যু উভয়েই বিভিন্ন টিস্যু ফ্যাট্টর ও Ca^{++} উপস্থিতিতে থ্রোমোপ্লাস্টিন (thromboplastin) নামক এনজাইম নিঃসরণ করে।

৩। থ্রোমোপ্লাস্টিন, Ca^{++} এবং ফ্যাট্টর VII, VIII, IX, X-এর উপস্থিতিতে প্লাজমায় বিদ্যমান নিক্রিয় প্রোথ্রোমিনকে সক্রিয় থ্রোমিন (active thrombin) এ পরিণত করে। এরা ক্ষতস্থানে অস্থায়ীভাবে রক্ত জমাট করে।

৪। এ থ্রোমিন প্লাজমায় দ্রবীভূত থাকা প্রোটিন ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen) এর সাথে বিজ্ঞিয়া করে সেগুলোকে অদ্বৰ্যীয় আঁশের মতো ফাইব্রিন মনোমার (fibrin monomer) বা হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ-এ পরিণত করে।

৫। ফাইব্রিন মনোমারগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ফাইব্রিন পলিমার গঠন করে এবং পরশেরে ফাইব্রিন বা ফাইব্রিল (fibrin or fibrils) জালকের সৃষ্টি করে। ফ্যাট্টর XIII ফাইব্রিন জালক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৬। ফাইব্রিন বা ফাইব্রিল জালকে রক্তকণিকা আটকে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

উপরোক্ত ধারাবাহিক রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। মানুষের রক্ততন্ত্রের স্বাভাবিক সময় 4-5 মিনিট অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণকাল 4-5 মিনিট।

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

১। রক্ত প্রচঙ্গ গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকে।

২। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য কলাতে প্রায় 50 ধরনের উপাদান বা ফ্যাট্টর আছে যেগুলো রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এদেরকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যথ-

(ক) প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাট্টর- এরা রক্ততন্ত্রকে উদ্বৃত্তি করে এবং (খ) অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাট্টর-এরা রক্ততন্ত্রকে প্রতিরোধ করে। রক্ততন্ত্র নির্ভর করে দেহে প্রোকোয়াগুলেন্ট ও অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট উপাদানসমূহের ভারসাম্যের উপর। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রোকোয়াগুলেন্টের উপর প্রকট। ফলে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

৩। রক্তনালির এভোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।

৪। রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাট্টর হেপারিন থাকায়।

৫। সক্রিয় কোয়াগুলেন্ট ফ্যাট্টরগুলোকে যকৃত কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়।

রক্তনালির কোনো স্থান কেটে গেলে বা ক্ষত সৃষ্টি হলে সে স্থানের প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাট্টরগুলো অধিক সক্রিয় হয়ে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ক্ষয়তাকে অতিক্রম করে এবং সেখানে রক্ততন্ত্র প্রক্রিয়া শুরু হয়। রক্ততন্ত্রের পর এর জমাট পদার্থগুলোকে অপসারণ করলে যে জলীয় পদার্থ থাকে তাকে সিরাম (serum) বলে। সিরামের গঠন প্লাজমার মতোই তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও তন্ত্র ফ্যাট্টর II, V ও VIII থাকে না এবং এতে সেরোটোনিন ঘনত্ব বেশি। সেরোটোনিন রক্তনালির সঙ্কোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হাস করে। রক্ত সিরাম নিয়ে অধ্যয়নের বিষয়কে সেরোলজি (serology) বলা হয়।

ব্যবহারিক: রক্তের স্লাইড পর্যবেক্ষণ

রক্তের প্রস্তুতি তৈরি করা (Preparation of Blood Smear)

প্রয়োজনীয় উপকরণ: জীবাণুমুক্ত সৃঁচ, পরিষ্কার স্লাইড, রক্ত, 70% অ্যালকোহল, পাতিত পানি, ড্রপার, তুলা, স্পিরিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং Leishman's blue অথবা Wright's stain.

কার্যপ্রণালী:

১। পরিষ্কার তুলায় স্পিরিট লাগিয়ে বাম হাতের অনামিকা আঙুলের অগ্রভাগ জীবাণুমুক্ত কর।

২। জীবাণুমুক্ত সৃঁচ দ্বারা খোঁচা দিয়ে আঙুল থেকে রক্ত বের কর।

৩। একটি পরিষ্কার শুক স্লাইডের এক প্রান্তের নিকটে এক বা দই ফোটা রক্ত নাও।

৪। অতঃপর অন্য একটি পরিষ্কার স্লাইডকে রক্ত স্লাইডের মসৃণ তলে স্থিরভাবে স্থাপন করে রক্তের সংস্পর্শে আন এবং 30° - 45° কোণে ৪.৮ নং চিত্রের অনুরূপভাবে সামনের দিকে ঠেলে দাও।

৫। এতে ১ম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ তৈরি হবে।

৬। রক্ত প্রলেপের স্লাইডটি বাতাসে শুকাও এবং এরপর ৭০% অ্যালকোহলে ধূয়ে স্লাইডটি পুনরায় বাতাসে শুকাও।

৭। অতঃপর স্লাইডের রক্ত প্রলেপের উপর কয়েক ফোটা Leishman's blue অথবা Wright's stain দিয়ে রঞ্জিত কর। এক বা দুই মিনিট পর পাতি পানি দিয়ে স্লাইডটি পানি দিয়ে ধূয়ে অতিরিক্ত রং ধূয়ে ফেল। রক্ত প্রলেপটি গোলাপী বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত বার বার ধূতে হবে।

৮। স্লাইডটি বাতাসে শুকিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পর্যবেক্ষণ কর।

সতর্কতা:

১। সৃষ্টি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

২। একজনের ব্যবহৃত সৃষ্টি অন্যজনে ব্যবহার করা যাবে না।

৩। আঙুলে দেয়া স্পিরিট সম্পর্কলপে শুকানোর পর রক্ত নিতে

হবে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

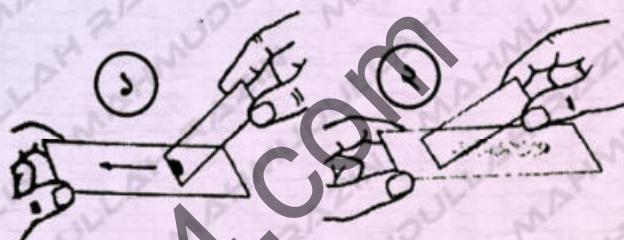
১। রক্তে প্লাজমা ও তিন ধরনের রক্তকণিকা বিদ্যমান।

২। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকা হতে অনেক কম।

৩। লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসরিহীন, দ্বিঅবতল ও গোলাকৃতির।

৪। শ্বেত রক্তকণিকা বৃহৎ, অনিয়তাকার ও ধৰ্মিত নিউক্লিয়াসযুক্ত।

৫। অনুচক্রিকা স্ফুর্দ্রাকৃতির ও নিউক্লিয়াস বিহীন।



চিত্র ৪.৮ রক্তের প্রলেপ তৈরিকরণ



চিত্র ৪.৯ মানুষের রক্তের স্লাইড

৪.২ লসিকা (Lymph)

লসিকা (Lymph; Lt. *lympha* = water goddess) এক ধরনের পরিবর্তিত কলারস যা কৈশিক নালিকার প্রাচীর ভেদ করে বের হয়ে আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থান করে দেহকোষকে স্ফীত রাখে। লসিকা বা লসিকা রস ঈষৎ ক্ষারধর্মী, স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ যা প্লাজমা প্রাচীর বিশিষ্ট লসিকাজালিকা, লসিকানালি এবং লসিকা-গঞ্জের (lymph node) সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতন্ত্রের মাঝ্যমে দেহে একমুখী প্রবাহে প্রবাহিত হয়। মানবদেহে লিফ্ফের পরিমাণ প্রায় রক্তের দ্বিগুণ, 10-12 লিটার। লসিকার pH 7.4 - 9, আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.01-1.016।

লসিকা গঠন প্রক্রিয়া

দেহ কোষের চারপাশে বিদ্যমান ইন্টারস্টিশিয়াল তরল (interstitial fluid) থেকে লসিকা সৃষ্টি হয়। ধামনিক রক্ত কৈশিক ধমনিতে পৌছালে এর অধিকাংশই কৈশিক শিরাতে প্রবাহিত হয়। প্রায় 10% রক্তরস বা প্লাজমা কৈশিকনালিকা থেকে বের হয়ে দেহ কোষের চারদিকে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা গঠন প্রক্রিয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লিফ্ফোজেনেসিস (lymphogenesis) বলা হয়।



চিত্র ৪.১০ লসিকানালির উৎপত্তিস্থল

লসিকার উপাদান

- ১। পানি: প্রায় 94%
- ২। কোষ: লসিকাতে লিফ্ফোসাইট- $500-75000/\text{ml}^3$ (T-Lymphocytes and B-Lymphocytes) বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়া কিছু অণুচক্রিকাও থাকে। লোহিত রক্তকণিকা অনুপস্থিত।

৩। কঠিন পদার্থ: প্রায় 6%

- লিপিড: প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড বিদ্যমান।
- প্রোটিন: প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, তঞ্চল ফ্যাট্রু, টিস্যু প্রোটিন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।
- রেচন বর্জ্য: ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন।
- খনিজ: সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট ইত্যাদির আয়ন।
- অন্যান্য বস্তু: গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ; লসিকাতে অধিক পরিমাণে CO_2 দ্রবীভূত থাকে।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। অধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল (chyle) বলে।

লসিকার কাজ

১। লসিকা দেহে একটি মধ্যস্থতাকারী (mediator) তরল হিসেবে কাজ করে। এটি রক্ত থেকে অক্সিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি কোষে পরিবহন করে এবং কোষ থেকে CO_2 ও বিপাকীয় বর্জ্য রক্তে নিয়ে আসে।

২। লসিকা antigen-presenting cells (APCs) পরিবহন করে লসিকা গ্রহণ করে নিয়ে যায় যেখানে অন্তর্ক্রম্যতা সাড়াদানের সূচনা ঘটে।

৩। লসিকা লিফ্ফ নোড ও অস্থিমজ্জার মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকা আদান-প্রদান করে।

৪। লসিকায় বিদ্যমান শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধর্মস করে এবং অ্যান্টিজেন উৎপাদন করে দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

৫। লসিকা অস্ত্র থেকে চর্বি ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণ করে।

৬। যেসব লিপিড কণা, প্লাজমা প্রোটিন ও হরমোন অণু কৈশিকনালিকার সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রম করতে পারে না সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৭। কোন কারণে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে লসিকাতন্ত্র থেকে লসিকা দ্রুত রক্তনালিতে প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ঠিক রাখে।

৮। আন্তঃকোষীয় উন্মুক্ত স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন অণু লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।

৯। দেহের যেসব কলায় রক্ত পৌছাতে অক্ষম লসিকার মাধ্যমে সেসব কলায় পুষ্টি ও অক্সিজেন পরিবাহিত হয়।

১০। লসিকা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কলার গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System)

লসিকানালি ও লসিকা গ্রহণ সম্বয়ে গঠিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা দেহে লসিকা রস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী Olaus Rudbeck এবং Thomas Bartholin, 1760 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মানুষের লসিকাতন্ত্রের বিবরণ দেন। লসিকাতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা-লসিকা নালি ও লসিকা গ্রহণ।

যে সব বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমস্যা দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকানালি (lymph vessels) বলে। অঙ্গের প্রাচীরে সুবিকশিত লসিকানালিকে ল্যাক্টিয়েল (lacteals) বলে।

লসিকানালিতে কিছুটা পর পর এক ধরনের গোলাকার বা বৃক্কাকৃতি ক্ষীতি বা গ্রহণ থাকে। এদের লসিকা গ্রহণ বা লসিকা গুলি (Lymph glands or lymph nodes) বলে। মানবদেহে এদের সংখ্যা অনেক, প্রায় 400-700।



চিত্র ৪.১১ মানুষের লসিকাতন্ত্র

পুরী (spleen), টনসিল (tonsil), অ্যাডেনয়েড (adenoid) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকার্থস্থি। এরা যান্ত্রিক ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে এবং লিফ্ফোসাইট নামক শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। মানবদেহের ঘাড় (neck), বগল (armpit) ও কুঁচকিতে (groin) অধিক সংখ্যক লসিকার্থস্থি থাকে।

মানুষ ফাইলেরিয়া কৃমি *Wuchereria bancrofti* দ্বারা আক্রান্ত হলে লসিকানালি ও লসিকা গ্রিহিণীলোতে লসিকা প্রবাহ দাখিল হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের লসিকানালি ও গ্রিহিণী অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। এরোগকে গোদ রোগ বা ফাইলেরিয়া বা এলিফ্যান্থিয়াসিস বলে।

পুরী (Spleen): পুরী মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকা এস্থি। দেহতরলের ভারসাম্য রক্ষায় এটি একটি শুরুত্তপূর্ণ অঙ্গ হলেও মানুষ এটি ছাড়াও বাঁচতে পারে। পুরী পাঁজরের নিচে এবং পাকস্থলির উপরে, উদরের বাম উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে। পরিণত মানুষের পুরী প্রায় 5 ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট এবং ওজনে প্রায় 150 গ্রাম। কালচে বর্ণের নরম পুরীকে রক্তের রিজার্ভ বা ব্লাড ব্যাংক বলা হয় এবং এটি প্রায় 300 মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে। পুরী রক্তের প্রধান ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ লোহিত রক্তকণিকা পুরীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে একে লোহিত রক্তকণিকার ক্ষেত্রে অবস্থান বলা হয়। এটি জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধে অংশ প্রযুক্তি করে।

টনসিল (Tonsil): মুখ হা করলে গলার ভেতরে ডান ও বাম দিকে ছোট বলের মতো যে গঠন দেখা যায় তার নাম টনসিল। টনসিল এক ধরনের লিফ্ফ নোড বা লসিকা এস্থি। এরা জীবাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম সারির প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরা প্রচুর পরিমাণে লিফ্ফোসাইট সৃষ্টি করে যারা মুখে প্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে অনেকসময় টনসিল নিজে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ফুলে যায়। একে টনসিলাইটিস (tonsillitis) বা টনসিলের প্রদাহ বলে।

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

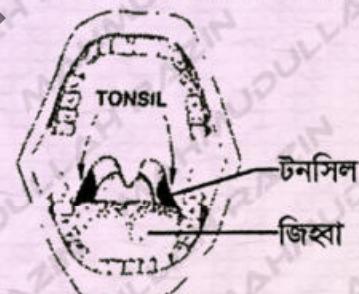
রক্ত	লসিকা
১। রক্ত লাল বর্ণের পরিবহন কলা।	১। লসিকা সাদা বর্ণের পরিবহন কলা।
২। রক্ত রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	২। লসিকা লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩। রক্ত প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	৩। লসিকা প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪। রক্তে হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	৪। লসিকাতে হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫। রক্ত অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	৫। লসিকা অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও অমিষ) পরিবাহিত হয়।	৬। লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

প্লাজমা (রক্তরস) ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

প্লাজমা (রক্তরস)	লসিকা
১। এটি রক্তের কোষবিহীন তরল যাতে খনিজ লবণের আয়ন, দ্রুভীভূত প্রোটিন ও জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব উপাদান বিদ্যমান থাকে।	১। লসিকা সাদা বর্ণের তরল যাতে শ্বেত রক্তকণিকা, খনিজ লবণের আয়ন, সামান্য প্রোটিন, বর্জ্য পদার্থ ও লিপিড কণা থাকে।
২। রক্ত বাহিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।	২। লসিকা নালিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।
৩। জমাট বাধতে পারে।	৩। জমাট বাধতে পারে না।
৪। বিভিন্ন বস্তু পরিবহনের মাধ্যমে পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন কাজে এবং অ্যান্টিবাডি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করে।	৪। দেহের যেসব কলায় রক্ত পৌছাতে অক্ষম লসিকা সেসব কলায় পুষ্টি ও অ্যান্টিজেন সরবরাহ করে, চর্বি শোষণ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করে।



চিত্র ৪.১২: পুরীর অবস্থান



চিত্র ৪.১৩: টনসিলের অবস্থান

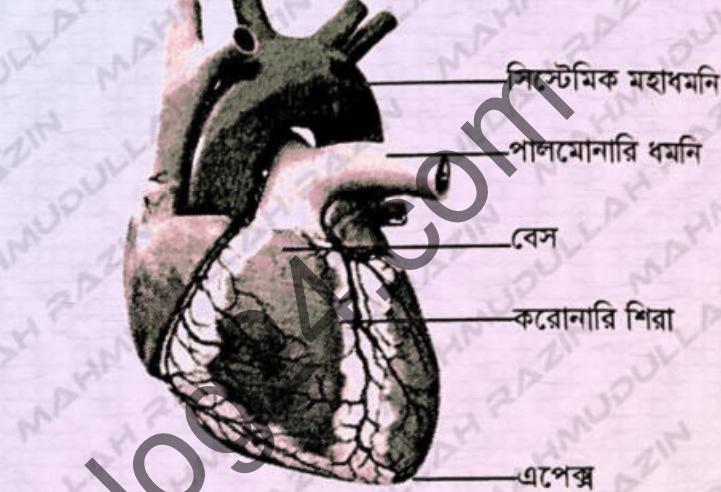
৪.৩ মানব হৃৎপিণ্ড (Human Heart)

মানুষের রক্ত সংবহনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় পাস্প যত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এটি সর্বদা একটি ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে আসা রক্ত গ্রহণ করে এবং পুনরায় সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে।

১। অবস্থান (Position): বক্ষ গহ্বরের মধ্য মিডিয়াস্টিনাম অঞ্চলের কিঞ্চিং বাম দিকে, বক্ষ কশেরকা T5-T8 বরাবর ডায়াফ্রামের উপরে দুই ফুসফুসের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ডটি সামান্য বাম দিকে হেলানো অবস্থায় অবস্থিত।

২। আকার ও আকৃতি (Shape and Size): লালচে-খয়েরী বর্ণের হৃৎপিণ্ড ত্রিকোণাকৃতির মোচার মতো। এর চওড়া উর্ধ্মমুখী অংশকে বেস (base) এবং ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশকে এপেক্স (apex) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য 12 সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ 9 সেন্টিমিটার। এর ওজন প্রায় 250 -350 গ্রাম।

৩। আবরণ (Covering): হৃৎপিণ্ডটি মসৃণ, পাতলা ও দ্বিতীয় একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। একে পেরিকার্ডিয়াম (pericardium) বলে। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের স্তরকে প্যারাইটাল স্তর (parietal layer) এবং ভেতরের স্তরকে ভিসেরাল স্তর (visceral layer) বলে।



চিত্র ৪.১৪ মানুষের হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

প্যারাইটাল স্তরটি হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত প্রসারিত হতে বাধা দেয়। এ দুই স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল তরল (pericardial fluid) থাকে যা হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণের আঘাত হতে রক্ষা করে।

৪। প্রাচীর (Wall): হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক কলা দ্বারা গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক কলা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তর তিনটি হলো-

(ক) এপিকার্ডিয়াম (Epicardium): এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

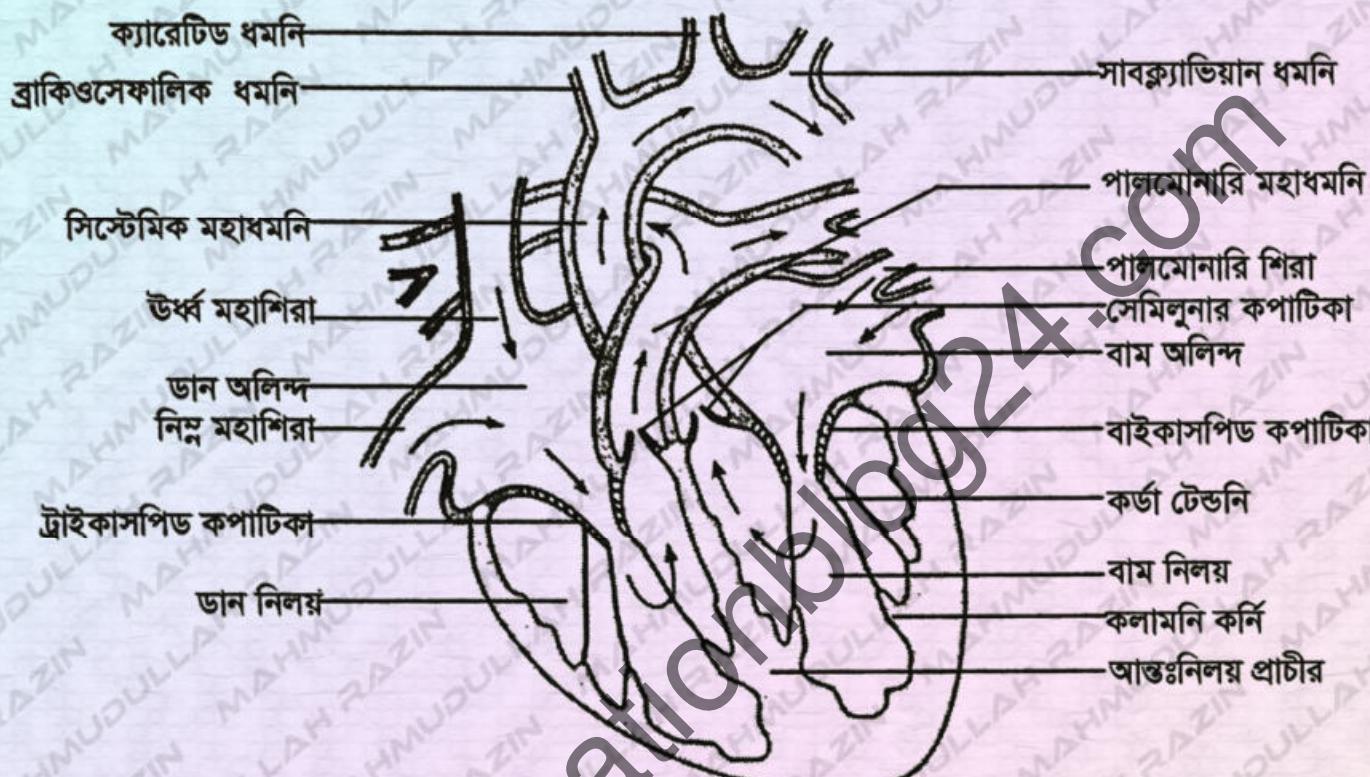
(খ) মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium): এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। কার্ডিয়াক পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(গ) এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium): এটি যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎক্ষাটিকাসমূহ দেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

৫। প্রকোষ্ঠ (Chambers): মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এদের দুটি উপরে এবং দুটি নিচের দিকে অবস্থিত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে বাম ও ডান অলিন্দ (left and right auricle) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে বাম ও ডান নিলয় (left and right ventricle) বলে। হৃৎপিণ্ডের এ বিভাজন বাইরের দিক থেকে করোনারি সালকাস (coronary sulcus) নামক খাঁজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

(ক) অলিন্দ (Auricle): পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট অলিন্দ আন্তঃঅলিন্দ পর্দা দ্বারা ডান ও বাম অংশে পৃথক থাকে। বাম অলিন্দ চারটি পালমোনারি শিরা থেকে অক্সিজেনসমৃক্ত রক্ত গ্রহণ করে যেগুলো অলিন্দের উপরের দিকে কপাটিকা বিহীন ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়। বাম অলিন্দ একটি বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা বাম নিলয়ে উন্মুক্ত হয়। ডান অলিন্দ উপরের দিকে একটি উর্ধ্ব মহাশিরা বা সুপেরিয়র ডেনোক্যাভা (superior vena cava), নিচের দিকে একটি নিম্ন মহাশিরা বা ইনফেরিয়র ডেনোক্যাভা (inferior vena cava) এবং মাঝের দিকে একটি করোনারি সাইনাস (coronary sinus) থেকে অক্সিজেনারিক রক্ত গ্রহণ করে। ডান অলিন্দ একটি ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা ডান নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

(খ) নিলয় (Ventricle): হৃৎপিণ্ডের নিচের দিকে একটি আন্তঃনিলয় প্রাচীর দ্বারা বাম ও ডান নিলয় পরস্পর হতে পৃথক থাকে। এদের প্রাচীর অলিন্দের প্রাচীর অপেক্ষা পুরু ও মাংসল। এমনকি বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ পুরু। নিলয় প্রাচীরের অঙ্গীক্র হতে কতগুলো মাংসল পেশি নিলয় প্রকোষ্ঠে অভিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে। এদের কলামনি কর্ণি (columnae cornae) বলে। ডান নিলয়ের সমূখ্যভাগে একটি পালমোনারি মহাধমনি এবং বাম নিলয়ের সমূখ্যভাগে একটি সিস্টেমিক মহাধমনি যুক্ত থাকে।



চিত্র ৪.১৫ মানব হৃৎপিণ্ডের লক্ষণে (সরলচিত্র) তীব্র চিহ্ন দ্বারা রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে

হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা পুরু কেন?

হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে রক্ত প্রেরিত হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের খুব নিকটে অবস্থিত বলে খুব কম শক্তি প্রয়োগ করে রক্ত পাঠানো যায়। অন্যদিকে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ফলে সম্ম পরিমাণ রক্ত প্রেরণ করলেও ডান নিলয় থেকে বাম নিলয়ের বেশি কাজ করতে হয়। এ কর্মদক্ষতার তারতম্যের কারণে বাম নিলয়ের প্রাচীরের অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা অধিক পুরু হয়।

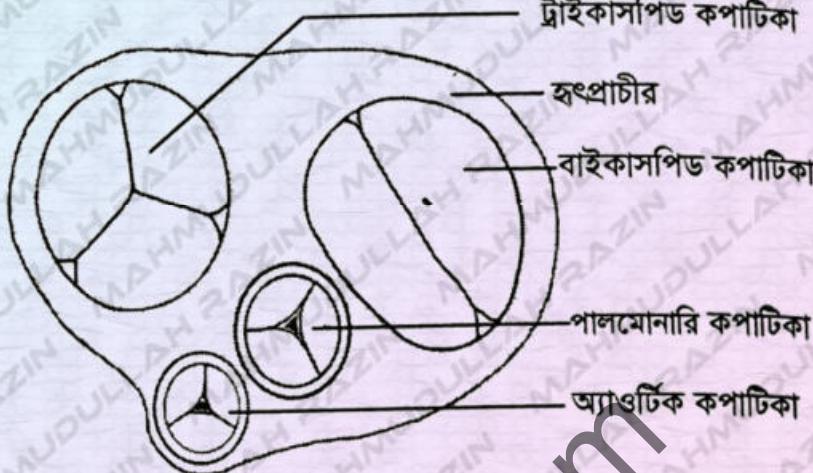
৬। হৃৎকপাটিকা (Cardiac valves): মানব হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথ ভাল বা কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের এন্ডোকার্ডিয়াম ত্বর ভাঁজ হয়ে এসব কপাটিকা গঠন করে। হৃৎপিণ্ডের সকল কপাটিকা একমুখী রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। মানব হৃৎপিণ্ডে নিম্নের চার ধরনের কপাটিকা পাওয়া যায়:

(ক) বাইকাসপিড বা মিট্রাল কপাটিকা (Bicuspid or mitral valve): হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে সংযুক্ত ছিদ্রপথ দ্বি-পর্দা (dual-flap) সমন্বিত একটি বাইকাসপিড কপাটিকা বা মিট্রাল কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পরিণত মানুষের মিট্রাল কপাটিকার আয়তন ৪–৬ বর্গসেন্টিমিটার। এ কপাটিকা কর্ডা টেন্ডনি (chordae tendineae) নামক তন্তু দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্ণির সাথে যুক্ত থাকে।

(খ) ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid valve): হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যে সংযুক্ত ছিদ্রপথ ত্রি-পর্দা (tri-flap) সমন্বিত একটি ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পরিণত মানুষের মিট্রাল কপাটিকার আয়তন ৭–৯ বর্গ সেন্টিমিটার। এটিও কর্ডা টেন্ডনি তন্তু দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্ণির সাথে যুক্ত থাকে।

(গ) আওর্টিক কপাটিকা (aortic valves): বাম নিলয় ও সিস্টেমিক মহাধমনির মাঝের ছিদ্রপথ একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির (semilunar) আওর্টিক কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। অধিকাংশ মানুষের আওর্টিক কপাটিকা ত্রি-পর্দা (tri-flap) বিশিষ্ট কিন্তু 1–2% মানুষের ক্ষেত্রে এটি দ্বি-পর্দা (dual-flap) বিশিষ্ট।

(ঘ) পালমোনারি কপাটিকা (pulmonary valves): ডান নিলয় ও পালমোনারি ধমনির মাঝের ছিদ্রপথ একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির ত্রি-পর্দা বিশিষ্ট পালমোনারি কপাটিকা (pulmonary valves) দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।



চিত্র ৪.১৬ হৎপিণ্ডের কপটিকাসমূহ (প্রস্তুচ্ছেদে)

উপরোক্ত চার ধরনের কপাটিকা ছাড়াও হৎপিণ্ডের সাথে জড়িত আরো দুধরনের কপাটিকা থাকে, যেমন-

□ ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা (The Eustachian valves): নিম্ন মহাশিরা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা থাকে। তবে গর্ভকালীন সময় ব্যতিত এ কপাটিকার বিশেষ কোন কাজ থাকে না। ইতালিয়ান চিকিৎসক Bartolomeo Eustachi এ কপাটিকা আবিষ্কার করেন।

□ থিবেসিয়ান কপাটিকা (The Thebesian valve): করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির থিবেসিয়ান কপাটিকা থাকে। এটি জ্বণীয় সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, তবে অনেকক্ষেত্রে এ কপাটিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

৭। হৎপেশি (Muscles of Heart): হৎপিণ্ডের প্রাচীরের মায়োকার্ডিয়াল স্তর বিশেষ ধরনের অনৈচিক পেশি দ্বারা গঠিত। এদের কার্ডিয়াক পেশি বা হৎপেশি বলে। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য কঙ্কালপেশি বা অন্যান্য পেশির মতো হলো এরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য পেশি হতে আলাদা।

- এদের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচিক।
- এদের তন্ত্রগুলো সরল চোঙাকৃতির নয় বরং এগুলো দ্বিবিভক্ত হয়ে পাশেরটির সাথে মিশে ত্রৈমাত্রিক নেটওয়ার্ক গঠন করে যা অপ্রকৃত সিনসাইসিয়ামের (syncytium) মতো দেখায়।
- এদের কোষের কেন্দ্রের দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
- এদের কোষের সারকোপ্লাজমে সমান্তরালে সজ্জিত মায়োফাইব্রিল (myofibrils) নামক সূক্ষ্ম তন্ত্র থাকে।
- হৎপেশির দুটি কোষের সংযোগস্থলের সারকোলেমা মিলিত হয়ে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (intercalated disc) গঠন করে।
- হৎপেশি হৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে।
- হৎপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয় যার ব্যত্যয় ঘটলে নানাবিধ সমস্যা এমনকি পেশির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।
- হৎপেশির কোষগুলোতে (cardiomyocytes) মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্যতা দেখা যায় যা কোষের অবিরাম অবাত শ্বসনের সুযোগ প্রদান করে।
- অধিকাংশ হৎপেশি হৎপিণ্ড থেকে রক্ত রক্তনালিতে প্রেরণের কাজে নিয়োজিত থাকে।

৮। সংযোগকারী কলা (Junctional tissues of heart): হৎপেশিতে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে যারা হৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৎপিণ্ডের সংযোগকারী কলা বলে। এগুলো হলো:

- (ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node = SAN)
- (খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node = AVN)
- (গ) বান্ডল অব হিজ (Bundle of His = BH)
- (ঘ) বান্ডল অব হিজের ডান ও বাম শাখা (Right & left branches of BH)
- (ঙ) পারকিন্জি ফাইবার (Purkinje fibres)

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন

হৃৎপিণ্ড বক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ কেন্দ্র। এর পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে রক্ত সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়। মানব হৃৎপিণ্ডের প্রতিদিন প্রায় 2000 গ্যালন রক্ত পাস্প করে এবং প্রায় 100,000 বার সঙ্কোচিত-প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। হৃৎপিণ্ডের সকল অংশ একসাথে সঙ্কোচিত বা প্রসারিত হয় না। এবং অলিন্দস্বয় সঙ্কোচনের সময় নিলয়স্বয় প্রসারিত হয় এবং নিলয়স্বয় সঙ্কোচনের সময় অলিন্দস্বয় প্রসারিত হয়। এভাবে একটি ছদ্মোময় পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত পরিচালিত হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে দ্বি-বর্তনী সংবহন (double circuit circulation) ঘটে। যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দুবার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী সংবহন তন্ত্র বলে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী এবং সকল পাখিদের দেহে এই ধরনের রক্ত সংবহন থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো পরিলক্ষিত হয়-

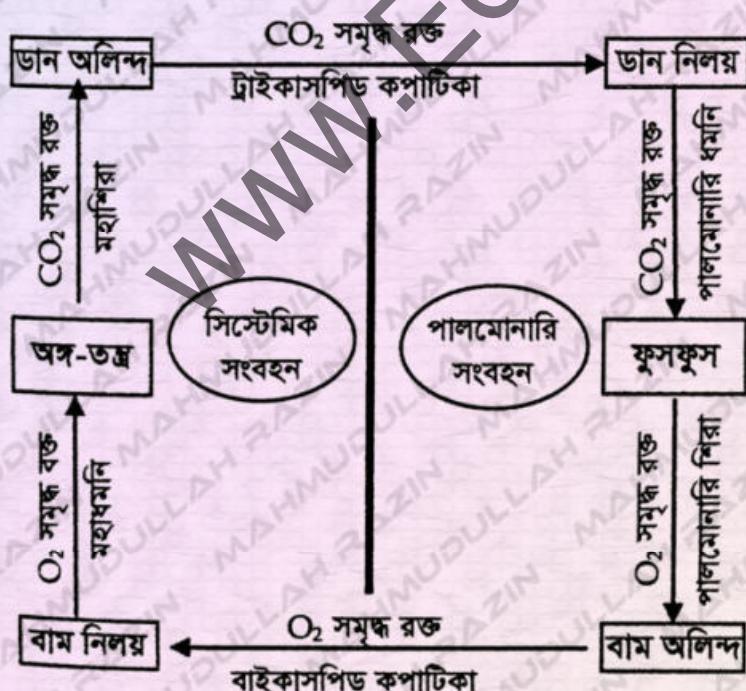
১। একটি সুপিরিয়র ও একটি ইনফিয়ার ভেনাকেভার (উর্দ্ধ ও নিম্ন মহাশিরা) মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এবং একই সময়ে দুটি পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

২। অলিন্দস্বয়ের যুগপৎ সঙ্কোচনের ফলে এর অভ্যন্তরে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রে বিদ্যমান কপাটিকাসমূহ (ট্রাইকাসপিড ও মিট্রাল কপাটিকা) খুলে গিয়ে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র পথে ডান অলিন্দ থেকে রক্ত ডান নিলয়ে এবং একই সাথে বাম অলিন্দ থেকে রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে।

৩। নিলয়স্বয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এদের সঙ্কোচন ত্রিয়া শুরু হয়। এসময় ট্রাইকাসপিড ও মিট্রাল কপাটিকা বক্ষ হয়ে যায়। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি কপাটিকার মাধ্যমে পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টিক কপাটিকার মাধ্যমে সিস্টেমিক অ্যাওর্টাতে (মহাধমনি) প্রবেশ করে।

৪। পালমোনারি ধমনির CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে গিয়ে পরিশেষিত হয়ে O_2 সমৃদ্ধ হয় এবং পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসে।

৫। সিস্টেমিক অ্যাওর্ট থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কলা ও তন্ত্রের কৈশিক জালিকাতে প্রবেশ করে এবং O_2 বিমুক্ত করে CO_2 সমৃদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে পরিশেষে দুটি ভেনাক্যাভা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের ক্রম সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া বিরামহীনভাবে চলতে থাকে।



চিত্র ৪.১৭ মানব হৃৎপিণ্ডের দ্বি-বর্তনী সংবহন



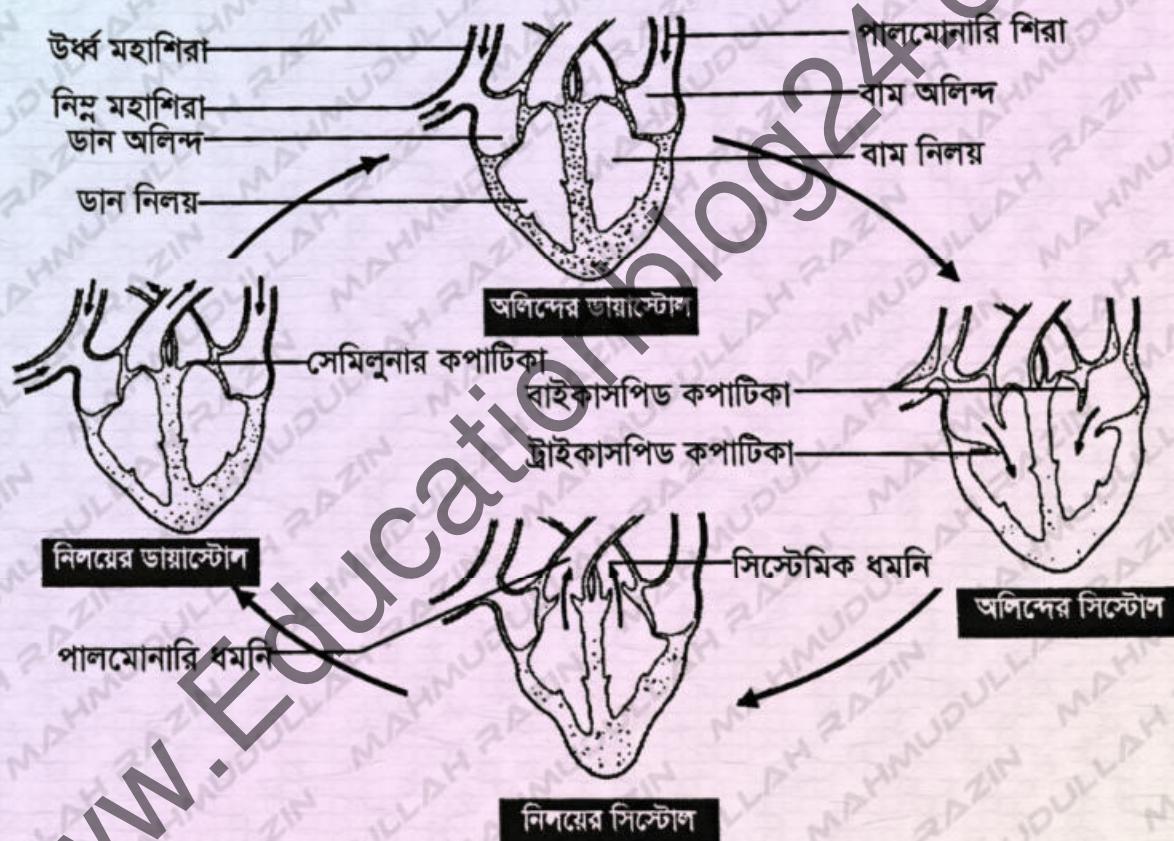
চিত্র ৪.১৮ মানব হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তপ্রবাহ

৪.৫ হৃৎক্র (Cardiac cycle) বা হার্টবিটের দশাসমূহ

হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সক্ষেচন ও প্রসারণকে হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে কতঙ্গুলো ধারাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে হৃৎক্র (cardiac cyricle) বলে। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে 72-75 বার। সে হিসেবে একটি হৃৎক্রের স্থিতিকাল 0.8 সেকেন্ড; মানুষের হৃৎপিণ্ডে হৃৎক্র চারটি ধাপে সংঘটিত হয়। ধাপগুলো হলো-

১। অলিন্দের ডায়াস্টোল (Atrial diastole): ডান ও বাম অলিন্দ একইসাথে প্রসারিত হয়। এসময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। 0.7 সেকেন্ডে অলিন্দস্বয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে অলিন্দের সিস্টোল শুরু হয়।

২। অলিন্দের সিস্টোল (Atrial systole): এর শুরুতে ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ডান ও বাম অলিন্দ একত্রে দ্রুত সক্ষেচিত হয় এবং এতে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। এ ধাপে সময় লাগে মাত্র 0.1 সেকেন্ড।



চিত্র ৪.১৯ কার্ডিয়াক চক্রের বিভিন্ন ধাপে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা

৩। নিলয়ের সিস্টোল (Ventricular systole): অলিন্দের সিস্টোলের সময় নিলয়স্বয় রক্তপূর্ণ হয় এবং সাথে সাথে নিলয়স্বয়ের সক্ষেচন ঘটে। এতে নিলয়ের অভ্যন্তরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এসময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং পালমোনারি ও সিস্টেমিক ধমনির গোড়ায় অবস্থিত সেমিলুনার কপাটিকা খুলে গিয়ে রক্ত ধমনিস্বয়ে প্রবেশ করে। এ ধাপে সময় লাগে 0.3 সেকেন্ড।

৪। নিলয়ের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole): নিলয়ের সিস্টোল শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে অলিন্দ থেকে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার কপাটিকাগুলো সজোড়ে বন্ধ হয়ে ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাত্মুখী রক্তপ্রবাহ রোধ করে। এ ধাপে সময় লাগে 0.5 সেকেন্ড নিলয়ের সিস্টোলের সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা সজোড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে লাব (lub) এবং নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় সেমিলুনার কপাটিকাসমূহ বন্ধ হওয়ার সময় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে ডাব (dub) বলে।

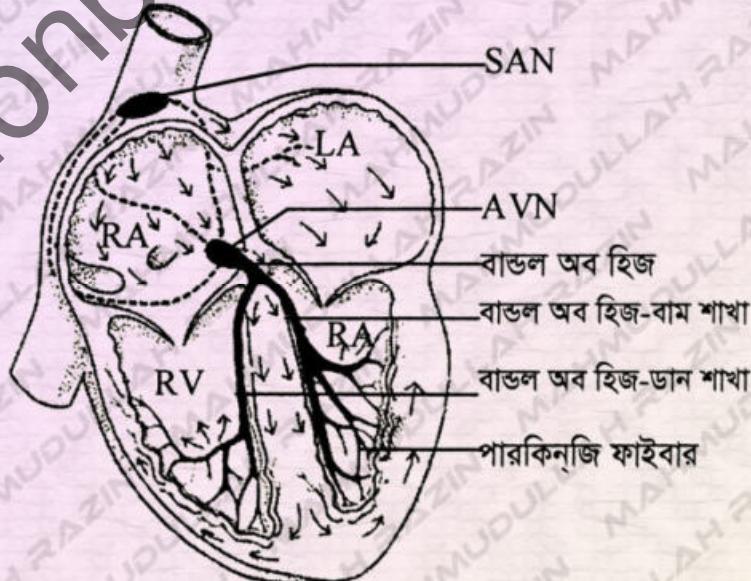
একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোল-এর সমষ্টিয়ে প্রতি 0.8 (0.7 + 0.1 or 0.3 + 0.5) সেকেন্ডে একটি হৃৎস্পন্দন বা কার্ডিয়াক চক্র সম্পন্ন হয়। হৃৎস্পন্দনের সময় যে শব্দ শুনা যায় তাকে লাব-ডাব (lub-dub) বলে।

হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের (Purkinji fibers) ভূমিকা

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকোচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত পরিচালনা করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে 72-75 বার হৃৎক্রম সম্পন্ন হয়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোনো উদ্বৃদ্ধিপন্থা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (myogenic control) বলে। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান বিশেষ চার ধরনের সংযোগী কলা দ্বারা হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো হলো:

(ক) **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node = SAN):** ডান অলিন্দের প্রাচীরে উর্ধ্ব মহাশিরার প্রবেশ পথের পাশে অবস্থিত সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডকে প্রাকৃতিক পেসমেকার (natural pacemaker) বলা হয়, কারণ এখান থেকে সৃষ্টি আক্ষণ পটেনশিয়াল (action potential) বা বৈদ্যুতিক সংকেত (electrical signal) বা হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সংকোচন ঘটায়। মার্টিন ফ্লাক (Martin Flack), 1907 সালে এটি আবিষ্কার করেন। SAN একটি কলা আকৃতির (banana-shaped) গঠন। একটি সুস্থ হৃৎপিণ্ডে এর দৈর্ঘ্য 10-30 mm, প্রস্থ 5-7 mm এবং পুরুষ 1-2 mm। ঘড়ির মতো প্রতি সেকেন্ডে SAN একবার সংকোচিত হয়। দেহ হতে হৃৎপিণ্ড বিছিন্ন করা হলেও এ সংকোচন চলতে থাকে। এ কারণেই সংস্থাপনের সময়ও হৃৎপিণ্ড সচল থাকে। SAN থেকে পাঠানো হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সংকোচন ঘটানোর ফলে নিলয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টোল ঘটে। SAN এর কার্যকারিতা কমে গেলে ক্রান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হয় যাকে ইশকেমিয়া (ischaemia) বলে।

(খ) **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node = AVN):** ডান অলিন্দ-নিলয় প্রাচীরে করোনারি সাইনাসের নিকটে বিদ্যমান Atrio-Ventricular Node বা AVN কলা অলিন্দের প্রাচীর থেকে হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা নিলয়ের প্রাচীরে প্রেরণ করে। এটি তুলনামূলক আকারে ছোট ($\sim 1 \times 3 \times 5$ mm)। AVN-কে সংরক্ষিত পেসমেকার বলে। কারণ কোনো কারণে Sino-Atrial Node বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে AVN উহা সৃষ্টি করে। AVN হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনার গতিকে মন্ত্র করে দেয় যাতে নিলয়ের সিস্টোল উন্নত হারে আগেই অলিন্দের সিস্টোল শেষ হতে পারে। হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা AVN থেকে নিলয়ের প্রাচীরে পৌছালে উহা দৃঢ় বিশেষ ধরনের তন্ত্র মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।



চিত্র ৪.২০ হৃৎপিণ্ডের সংযোগকারী কলা

(গ) **বাল্ব অব হিজ (Bundle of His = BH):** হৃৎপিণ্ডের আন্তঃনিলয় প্রাচীরের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত এটি একটি বিশেষ ধরনের তন্ত্র যা বাম ও ডান শাখায় বিভক্ত হয়ে পারকিনজি তন্ত্র সাথে মিলিত হয়। সুইস কার্ডিওলজিস্ট উইলহেল্ম হিজ (Wilhelm His) 1893 সালে এটি আবিষ্কার করেন। AVN থেকে প্রেরিত হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা Bundle of His কলা কর্তৃক গঁথীত হয়।

(ঘ) **পারকিনজি ফাইবার (Purkinje fibres):** বাল্ব অব হিজ থেকে সৃষ্টি এ তন্ত্রগুলো হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের প্রাচীরে জালিকার মতো বিস্তৃত থাকে। জন ইভানজেলিস্টা পারকিনজি (Jan Evangelista Purkyne) 1839 সালে এটি আবিষ্কার করেন। Bundle of His এর ডান ও বাম শাখা বরাবর প্রবাহিত হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা Purkinje fibres-এর মাধ্যমে নিলয়ের প্রাচীরে সঞ্চারিত হয়। এতে রক্তপূর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে। এ ঘটনাকে নিলয়ের সিস্টোল বলে। পারকিনজি ফাইবারের মাধ্যমে হৃৎউদ্বৃদ্ধিপনা সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরিভাবে সঞ্চারিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণের গতিপথ হলো:

SAN → AVN → Bundle of His → Purkinje fibres

৪.৬ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা

রক্তচাপ (Blood pressure)

হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবহমান রক্ত রক্তবাহিকার প্রাচীরে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি ধমনিতে রক্তচাপ সবচেয়ে বেশি এবং এ চাপ দূরবর্তী ধমনিতে ক্রমশ কমে যায়। শিরায় রক্তচাপ খুবই কম। দেহে রক্তের পরিমাণ, হৃৎপিণ্ড থেকে নিষ্কৃত রক্তের পরিমাণ, রক্তের সান্দুতা এবং ধমনির স্থিতিস্থাপকতা রক্তচাপকে প্রভাবিত করে। স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) নামক যন্ত্র দ্বারা মানুষের রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। রক্তচাপ দুই ধরনের, যথা-

□ সিস্টোলিক চাপ (Systolic pressure): হৃৎপিণ্ডের নিলয় সঙ্কোচিত থাকা অবস্থায় প্রবহমান রক্ত ধমনির প্রাচীরে যে উচ্চমাত্রার চাপ প্রয়োগ করে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। প্রাণবয়স্ক সুস্থ মানুষের এ রক্তচাপ 110-140 মি.মি পারদ।

□ ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic pressure): হৃৎপিণ্ডের নিলয় প্রসারিত থাকা অবস্থায় প্রবহমান রক্ত ধমনির প্রাচীরে যে নিম্নমাত্রার চাপ প্রয়োগ করে তাকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। প্রাণবয়স্ক সুস্থ মানুষের এ রক্তচাপ 60-90 মি.মি পারদ।

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাপের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে 140 ও 90 মিলিমিটার/পারদ-এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

ব্যারোরিসেপ্টর হলো রক্তনালিকার প্রাচীরে বিদ্যমান বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত (sensory nerve endings) যেগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। এগুলো মন্তিক্ষের ডেগাস স্নায়ু থেকে সৃষ্টি হয় এবং দেহে রক্তচাপের হোমিওস্টেসিস বা সাম্যবস্থা বজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ পরিলক্ষিত হলে এ উদ্দীপনা খুব দ্রুত ব্যারোরিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে ব্যারোরিফ্রেক্স (baroreflex) বলা হয়।

ব্যারোরিসেপ্টর দুধরনের হয়, যথা উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (high pressure baroreceptor) বা আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর (arterial baroreceptor) এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (low pressure baroreceptor) বা কার্ডিওপালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর (cardiopulmonary baroreceptor) বা ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর (volume baroreceptor)।

আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টরগুলো অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ক্যারোটিড সাইনাস নামক প্রধান ধমনিতে অবস্থান করে। এসব রক্তনালিতে সর্বদা উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে এগুলো খুব দ্রুত সাড়া দেয়।

রক্তচাপের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এদের সংকেত প্রদানের মাত্রা বেড়ে গিয়ে হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া কমে যায়। একসময় এদের সংকেত প্রদান বক্ষ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয় এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ব্যারোরিসেপ্টরগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়। দীর্ঘ সময় ব্যাপী রক্তচাপ উচ্চ মাত্রায় থাকলে এরা এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে মানিয়ে নেয়। এর ফলে স্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন সৃষ্টি হয়।



চিত্র ৪.২১ ব্যারোরিসেপ্টর

ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টরগুলো প্রধান সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি শিরা এবং হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্ড ও নিলয়ের প্রাচীরে অবস্থান করে। এরা রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে বলে এদেরকে ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর বলে। রক্তের আয়তন রক্তনালির বিশেষ করে শিরার গড় চাপ নির্ণয় করে। ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর রক্ত সংবহন ও রেচন উভয়ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এরা বৃক্ষের হরমোন উৎপাদনে পরিবর্তন এনে রক্তের পানি ও লবণ ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তের লবণ ও পানির মাত্রা রক্তচাপের উপর দীর্ঘঘেয়াদি প্রভাব ফেলে।

দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করে

রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে এরা মন্তিকে অসংখ্য স্নায় উদ্বীপনা প্রেরণ করে। এসব উদ্বীপনা মন্তিকের ভেসোমোটর কেন্দ্রের কাজের গতি হ্রাস করে। ফলে এ কেন্দ্র থেকে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিকায় প্রেরিত উদ্বীপনার হারও কমে যায়। ভেসোমোটর কেন্দ্রের উদ্বীপনা প্রেরণ কমে যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রেরণ ক্রিয়া এবং প্রাণীয় রক্তনালির প্রসারণ ক্রিয়া স্থিমিত হয়ে যায় এবং অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের মতো ঘটনা ঘটে। ব্যারোরিসেপ্টরের স্নায় উদ্বীপনা প্রেরণ কামে গেলে মন্তিকের ভেসোমোটর কেন্দ্রের কাজের গতি পুনরায় ফিরে আসে এবং ফলে এ কেন্দ্র থেকে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিকায় প্রেরিত উদ্বীপনার হারও বেড়ে যায়। ভেসোমোটর কেন্দ্রের উদ্বীপনা প্রেরণ বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রেরণ ক্রিয়া এবং প্রাণীয় রক্তনালির প্রসারণ ক্রিয়া পুনঃস্থাপিত হয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

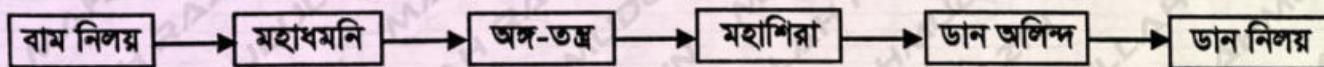
৪.৭ মানবদেহে রক্তসংবহন পদ্ধতি

মানবদেহের রক্তসংবহনতন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির অর্থাৎ রক্তনালিকার প্রান্তিভাগ মুক্ত নয় এবং রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পৌছায়। অঙ্গের বিভিন্ন কলায় ধমনিগুলো অতি ক্ষুদ্র শাখা ধমনিকায় (arterioles) বিভক্ত হয় যেগুলো পুনরায় অসংখ্য কৈশিকজালিকায় (capillaries) বিভক্ত হয়। কৈশিকজালিকা কলার ভেতরে ক্ষুদ্র শিরা (venules) গঠন করে যেগুলো বৃহৎ শিরা (veins) গঠনের মাধ্যমে কলা ত্যাগ করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হতে আগত শিরাগুলো মহাশিরায় (venae cavae) মিলিত হয়ে হৃৎপিণ্ড প্রবেশ করে।

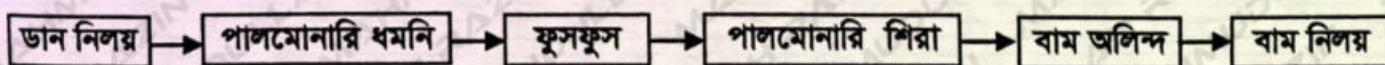
দেহে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বিভিন্ন কলার ভিন্নরকম হয়। যকৃতে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় (1350ml/min) রক্ত প্রবাহিত হয়। বৃক্ষ (1100 ml/min) ও মন্তিকে (700ml/min) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হয়।

মানবদেহে চার পদ্ধতিতে রক্ত সংবহন সংঘটিত হয়, যথা—(ক) সিস্টেমিক সংবহন; (খ) পালমোনারি সংবহন; (গ) করোনারি সংবহন ও (ঘ) পোর্টাল সংবহন।

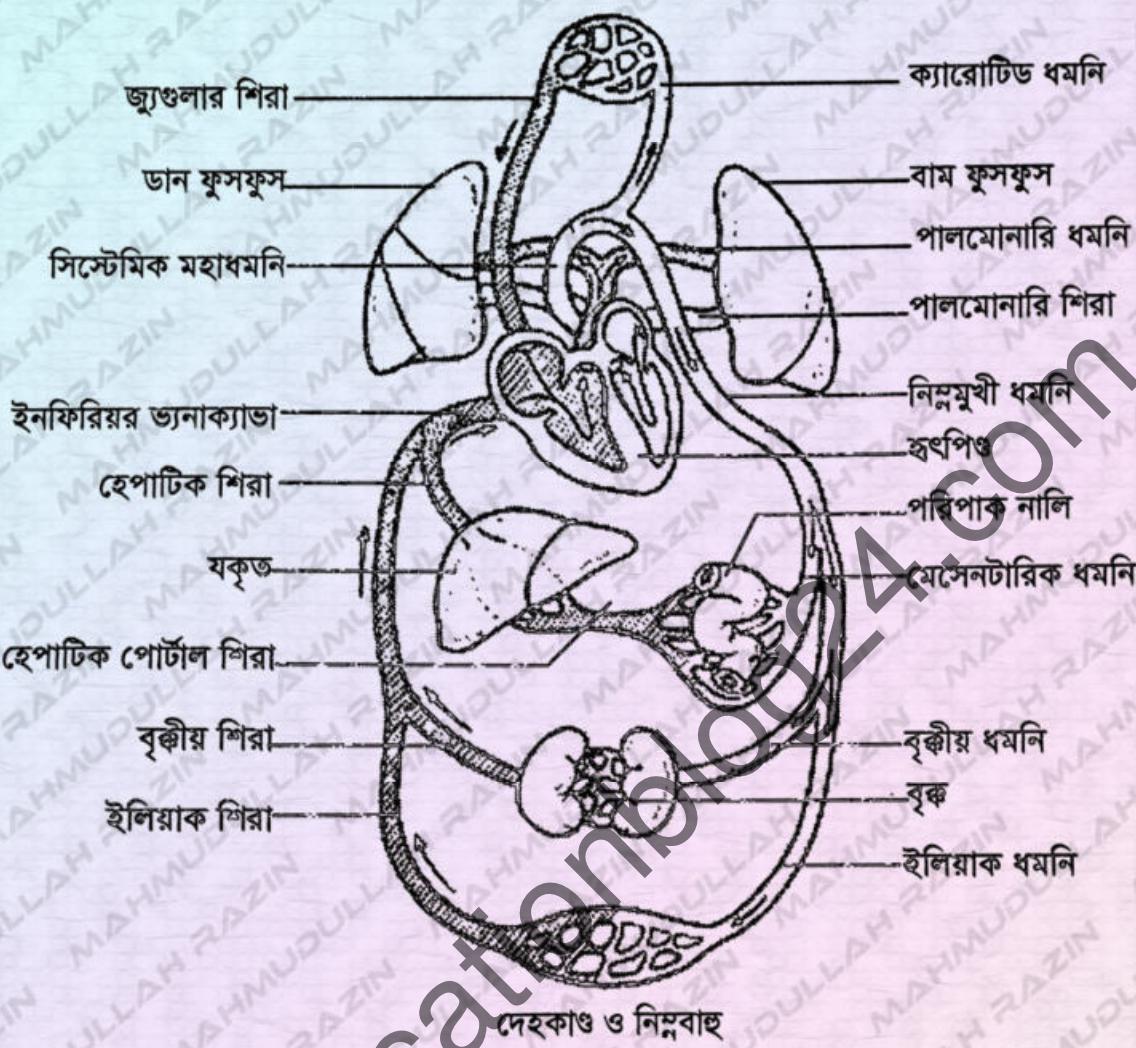
(ক) সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation): যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ড থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সমস্ত দেহে প্রেরিত হয় এবং দেহ হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এ রক্ত সংবহন সারা দেহের জন্য অক্সিজেন, খাদ্যসার ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে। এক্ষেত্রে একটি মহাধমনির (aorta) বা সিস্টেমিক ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত রক্ত বের হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় এবং বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংগৃহীত হয়ে দুটি মহাশিরার (venacava) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্ড হয়ে ডান নিলয়ে ফিরে আসে। সিস্টেমিক সংবহনের গতিপথ হলো:



(খ) পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation): যে পদ্ধতিতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হতে ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস হতে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনি দ্বারা ফুসফুসে নীত হয় এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্ডে ফিরে আসে। পালমোনারি সংবহনের গতিপথ হলো:

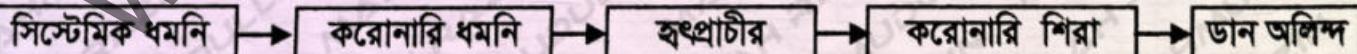


মাথা ও উর্ধ্ববাহ

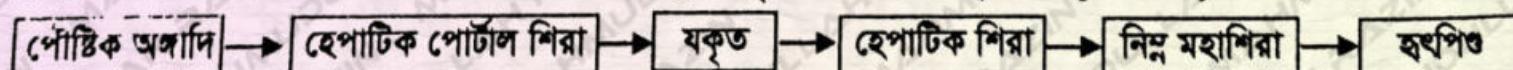


চিত্র ৪.২২ মানবদেহের রক্ত সংবহন

(গ) করোনারি সংবহন (Coronary circulation): হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সকল অঙ্গে রক্ত সংবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিজেই দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেহে অবিরাম রক্তপ্রবাহ বহাল রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের নিজেরও প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। আর রক্ত থেকেই এ শক্তি সংগৃহীত হয়। যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সংবাহিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্টি করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্ডে প্রবেশ করে।



(ঘ) পোর্টাল সংবহন (Portal circulation): কোনো কোনো অঙ্গে কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে। মানবদেহে কেবল হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র (hepatic portal system) বিদ্যমান। এক্ষেত্রে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র এবং প্লীহা থেকে জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পৌছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় জালিকার মতো সাইনুসয়েডে বিভক্ত হয়। এসব সাইনুসয়েড পরে একীভূত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত নিম্ন মহাশিরা বা ইনফেরিয়র ভেনাকাভায় পরিবাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌছে। মানুষের বৃক্ষীয় পোর্টালতন্ত্র (renal portal system) থাকে না।



৪.৮ হৃৎরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়

হৃৎরোগ কী?

মানব হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির কতিপয় সমস্যা বা রোগকে সমষ্টিগতভাবে হৃৎরোগ বা হার্ট ডিজিস বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস (Cardiovascular disease) বলে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এক নম্বর মরণ ব্যাধি হলো হৃৎরোগ। হৃৎরোগের বিশাল ছাতার নিচে অঙ্গৰুক্ত হলো হৃৎপিণ্ডের রোগ (হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী ধমনি, হৃৎপেশি ও কপাটিকার বিভিন্ন ধরনের রোগ), রক্তনালির রোগ (যেসব ধমনি ও শিরা হৃৎপিণ্ড হতে ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে তাদের রোগ) এবং জন্মগতভাবে হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি। বর্তমান পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর ৩০% হয়ে থাকে হৃৎরোগ জনিত কারণে, এজন্য একে বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি বলা হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতিবছর এক কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ এ রোগে মারা যায় যার মধ্যে ৮২% এর মৃত্যু হয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। এ মৃত্যু খুবই হতাশাজনক। কারণ হৃৎরোগ এবং স্ট্রোকসহ বিভিন্ন ক্রনিক রোগে যারা মারা যায় তাদের অর্ধেকেরই বয়স হয় জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম সময় এবং কর্মজীবনের ১৫-৩০ বছরের মধ্যে। কিছু নিয়ম যেমন-স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম করা এবং তামাকমুক্ত জীবন-যাপনের মাধ্যমে এ অকাল মৃত্যু অনেকাংশে এড়ানো সম্ভবপর হয়।

হৃৎরোগ প্রতিরোধের উপায়

হৃৎরোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে। যেমন-

(i) ধূমপান বন্ধ করতে হবে; (ii) ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে; (iii) রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা সর্বদা সঠিক রাখতে হবে; (iv) চর্বি জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করে নিম্ন ক্যালরিয়ুক্ত খাবার খেতে হবে; (v) নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করতে হবে, (vii) দেহের স্থূলতা দূর করতে হবে, (viii) অ্যালকোহল বা মদ্যপান বর্জন করতে হবে, (ix) খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া যাবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় মানব হৃৎপিণ্ডের রোগ, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে হৃৎবিজ্ঞান বা কার্ডিওলজি (Cardiology; Gr. *kardia*=heart+*logia*=study) বলে। হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গ ও দক্ষ চিকিৎসককে কার্ডিওলজিস্ট (Cardiologist) বলে।

নিম্নে কয়েকটি হৃৎরোগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো:

১। অ্যানজাইনা বা বুকে ব্যথা (Angina/Chest pain)

হৃৎপিণ্ড থেকে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ হয়। হৃৎপিণ্ড নিজেই একটি অঙ্গ হওয়ায় এরও রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন হয়। যে রক্ত নালি দ্বারা হৃৎপিণ্ড নিজে রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে তাকে করোনারি ধমনি (coronary artery) বলে। করোনারি ধমনি সংক্রান্ত একটি অতি পরিচিত উপসর্গ হলো অ্যানজাইনা। একে অনেকসময় অ্যানজাইনা পেকটোরিস (angina pectoris) বলা হয়। এর ফলে বুকে ব্যথা, বুক ভারী লাগা, বুকের চারদিকে চাপ, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি লাগা প্রভৃতি উপসর্গ অনুভূত হয়। অনেকসময় একে বদহজমজনিত ব্যথা বলে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়।

অ্যানজাইনার প্রকার: সাধারণত তিনি ধরনের অ্যানজাইনা হয়ে থাকে, যথা-

(ক) সুস্থিত অ্যানজাইনা (Stable angina): এক্ষেত্রে বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রাম নিলে এ ব্যথা চলে যায়।

(খ) অস্থিত অ্যানজাইনা (Unstable angina): বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনুভূত হলে তাকে অস্থিত অ্যানজাইনা বলা হয়। এ ব্যথা প্রায়শই হয়ে থাকে এবং অনেক সময় ব্যাপী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।

(গ) প্রিনজমেটাল অ্যানজাইনা (Prinzmetal angina): বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে এ ধরনের অ্যানজাইনা দেখা দেয়।

অ্যানজাইনা কারণ

■ করোনারি ধমনি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের পেশিতে রক্ত সরবরাহ করে গেলে পেশির কোষগুলো অক্সিজেন ও শর্করা (গ্লুকোজ) স্বল্পতায় পড়ে এবং শক্তি উৎপাদন বাধাঘস্থ হয়। কিন্তু দেহে অবিরাম রক্ত সরবরাহের জন্য হৃৎপেশিগুলোকে সর্বদা কার্যক্ষম থাকতে হয়। পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে হৃৎপেশির কোষগুলো অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিকল্প উৎস পাইরান্ডিক অ্যাসিড থেকে শক্তি উৎপাদন করে। এসময় উপজাত হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। অধিক পরিমাণ ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হলে তা পেশিতে জমা হয়, ফলে ব্যথা অনুভূত হয়।

■ করোনারি ধমনির সমস্যা ছাড়াও অ্যানজাইনা হতে পারে। অ্যানজাইনা আক্রান্ত মাত্র 30% মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (valve) সমস্যার কারণে করোনারি আর্টারিতে রক্ত প্রবাহ বিস্তৃত হয়।

■ অ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীরও অ্যানজাইনা দেখা দেয় কেননা তাদের রক্তে পরিমিত অক্সিজেন থাকে না।

■ যেসব মানুষের হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অতিমাত্রায় পুরু থাকে তাদেরও অ্যানজাইনা দেখা দেয়, কারণ তাদের হৃৎপ্রাচীর চাহিদার তুলনায় কম পরিমাণ অক্সিজেন পেয়ে থাকে।

বুকে ব্যথা বুঝার উপায়: সাধারণত যে কোনো ধরনের পরিশ্রম করলে বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে বা ব্যায়াম করলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এসব কাজ থেকে বিরত থাকলে বা পরিশ্রম কমিয়ে দিলে ব্যথা আস্তে আস্তে করে যায়। এ থেকে হার্টের ব্যথা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। এ ব্যথা বুকের বাম বা ডান যে কোনো পাশে হতে পারে। এ ব্যথা সাধারণত বুকে অনুভূত হলেও অনেকসময় এটি কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।

কারা বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হতে পারে: যাদের বয়স 40 এর উপরে, যারা ধূমপায়ী (ধূমপান রক্তনালির প্রাচীর পুরু করে রক্তনালির লুমেন সরু করে দেয়, ফলে রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে), যাদের অনিয়ন্ত্রিত বা বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিস আছে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে, যাদের রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল আছে এবং যারা কোনো কায়িক পরিশ্রম করে না তারা বুকের ব্যথায় বা অ্যানজাইনায় আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার: রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও ঔষধ সেবন করতে হবে। এছাড়া রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক অপারেশন অথবা এনজিওগ্রাম-এর পরামর্শ দিতে পারেন।

২। হার্ট অ্যাটাক (Heart attack)

প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় হার্ট অ্যাটাক বলতে কিছু নেই। সাধারণ মানুষের কাছে যা হার্ট অ্যাটাক নামে পরিচিত তা আসলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বা এম আই (myocardial infarction)। দীর্ঘ সময় ব্যাপী হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকলে এ অংশের পেশিগুলো অকার্যকর হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণ ভাষায় হার্ট অ্যাটাক (heart attack) বলে।

স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক

সাধারণ মানুষের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে পরিকার ধারণা নেই। অধিকাংশক্ষেত্রে দুটোকে এক করে দেখা হয়। এটা ঠিক যে উভয়ক্ষেত্রে রক্ত চলাচলে বিষ্ফুল ঘটে, তবে স্ট্রোক বলা হয় যখন এটা মন্তিক্ষে ঘটে এবং এর ফলে সাধারণত রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় কিংবা দেহের একদিকে প্যারালাইজড (paralized) হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হার্ট অ্যাটাক ঘটে হৃৎপিণ্ডে। হার্ট অ্যাটাকের ফলে রোগী সাধারণত অজ্ঞান হয় না কিংবা প্যারালাইজড হয় না।

হার্ট অ্যাটাকের কারণ

□ হার্ট অ্যাটাকের প্রধান পাঁচটি কারণ হলো ধূমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বির আধিক্য ও পজেটিভ ফেমিলি ইন্স্ট্রি।

□ অধিকাংশ হার্ট অ্যাটাক ঘটে হৃৎপিণ্ডের করোনারি আর্টারিতে রক্ত চলাচল বিষ্ফুল কারণে। এক্ষেত্রে রক্তের কোলেস্টেরল প্রধানত দায়ী। রক্তে অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকলে এগুলো করোনারি আর্টারির প্রাচীরে জমে শক্ত প্লাক (plaque) গঠন করে।

এ প্ল্যাকের সাথে রক্ত কণিকাগুলো যুক্ত হয়ে রক্ত জমাট বাঁধে। একে আর্থারোস্কেলেরোসিস (atherosclerosis) বলে। করোনারি আর্টারি হৃৎপ্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে এর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশির কোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মরে যায় এবং হার্ট অ্যাটাক ঘটে।

□ কোনো কারণে শারীরিক ক্রিয়া বেড়ে গেলে এটি ঘটতে পারে অথবা প্রচঙ্গ মানসিক চাপ বা বিষন্নতা কিংবা অসুস্থিতার কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

□ রক্তের অণুচ্রিকার কার্যকারিতা বেড়ে গেলে, রক্তের ফাইব্রিনোজেন ও ফ্যাটের VIII বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। হার্ট অ্যাটাক কখন ঘটবে তা কেউ জানে না। এটি যে কোনো সময় ঘটতে পারে। এটি বিশ্রাম বা ঘুমের সময়ও ঘটতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ:

- হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ হলো বুকের ব্যথা। এ ব্যথা সাধারণত বুকে অনুভূত হলেও অনেকসময় এটি কাঁধ, বাহু, খড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সব সময় বুকে ব্যথা নাও হতে পারে।

- পুরুষের হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা অনেকসময় বাম বাহুতে এবং নারীদের দু বাহুতে হতে পারে।

- অবিরাম কাশি বা বুকে শো শো শব্দ হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ হতে পারে।

- হার্ট অ্যাটাক হলে মাথা ঝিম ঝিম করা বা চেতনা লোপ পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্লান্সি ঘটতে পারে। এটি কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে।

- বমিভাব বা বমি হতে পারে, এছাড়া ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। দ্রুত বা অনিয়মিত নাড়ি স্পন্দন এবং সে সাথে দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে।

- হার্ট অ্যাটাকে একটি সাধারণ উপসর্গ হলো শীতল ঘাম হওয়া। হঠাতে করে শীতল ঘাম শরীর বেয়ে অবিরাম ঝড়তে থাকে যেমনটি কঠোর ব্যায়ামের পর হয়ে থাকে।

- হার্ট অ্যাটাকের কিছুদিনের মধ্যে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা বা উদরে পানি জমা হতে পারে।

- হার্ট অ্যাটাকের সময় কিংবা অ্যাটাকের কয়েক দিন পূর্ব হতে শরীর অস্বাভাবিকভাবে দুর্বল অনুভূত হবে।

- 75% ডায়াবেটিস রোগীর হার্ট অ্যাটাকের সময় বুকে ব্যথা হয়।

- শেষ রাতে ও সকাল ৭ টার পূর্ব পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের হার সবচেয়ে বেশি। তাই শেষ রাতে বা ভোরের বুকের ব্যথাকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

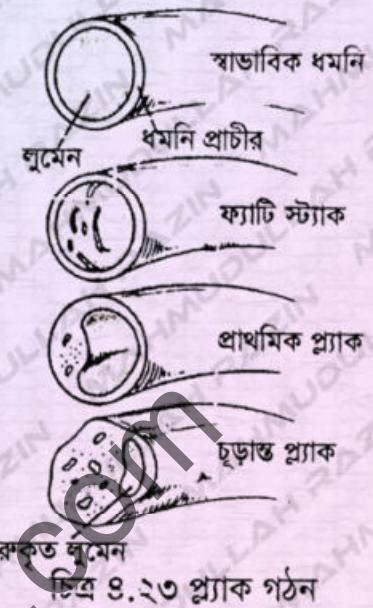
হার্ট অ্যাটাকের প্রতিকার

হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসার প্রধান পছন্দ হলো অ্যানজিওপ্লাস্টি। রক্তনালিকার ভেতরের রক্ত জমাট ভাঙতে রোগীকে ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেয়া হয়। বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ার ৩ ঘণ্টার মধ্যে এ ধরনের ওষুধ সেবন করতে হয়। এ চিকিৎসাকে প্রমোলাইটিক থেরাপি (thrombolytic therapy) বলে। অনেকক্ষেত্রে রোগীর বাইপাস ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়।

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ

নিয়মিত ওষুধ সেবন ও জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন করে হার্ট অ্যাটাক রোধ করা যায়। জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তনের বিশেষ দিক হলো:

- হৃৎবান্ধব স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করা
- রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা ঠিক রাখা
- নিয়মিত ব্যায়াম করা
- ধূমপান পরিত্যাগ করা
- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- মানসিক চাপ ও বিষন্নতা পরিহার করা
- স্তুলতা নিয়ন্ত্রণ করা
- অ্যালকোহল ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা
- প্রফুল্ল-আনন্দময় জীবন যপন করা
- চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা



৩। হার্ট ফেইলিউর (Heart failure)

হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সাথে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর (heart failure) বলে। এটি ধীরে ধীরে প্রকট অবস্থা লাভ করে। হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে অথবা ডান পাশে ঘটতে পারে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ: বিভিন্ন কারণে হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে। যেমন- (i) স্তুলতা ও উচ্চ রক্তচাপ; (ii) অতিরিক্ত খুমপান ও মদ্যপান; (iii) হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার রোগ; (iv) ইশকেমিক হার্ট ডিজিস; (v) কার্ডিও মায়োপ্যাথি বা ক্রনিক হার্ট মাসল ডিজিস; (vi) হৃৎপিণ্ডের ছন্দোপতন; (vii) হৃৎপিণ্ডে বংশগত রোগ; (viii) অন্তঃক্ষরা গ্রহিত অস্থাভাবিকতা; (ix) অতিমাত্রার রক্তশূণ্যতা ইত্যাদি।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ: হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে হলে একরকম এবং ডান পাশে হলে অন্যরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউর বাম পাশে হলে- ১। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায়; ২। কোনো কায়িক পরিশ্রমে শ্বাস কষ্ট হয়; ৩। শুক্র কফের সৃষ্টি হয় যা বের করা যায় না; ৪। ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্থ অনুভব করা; ৫। পেশির দুর্বলতা; ৬। দেহের ওজন কমে যায়।

হার্ট ফেইলিউর ডান পাশে হলে- ১। পা ফুলে যাওয়া (ওডেমা); ২। পায়ের নিচের অংশের তুক শুক হয়ে যায়; ৩। পায়ে একজিমার মতো লাল দাগ পড়ে যা পরে জটিল যা এ পরিণত হয়; ৪। উদর গহ্বর এবং তদস্থিত অঙ্গগুলোতে তরল পদার্থ জমে বিশেষ করে ফুসফুস ও যকৃতে তরল জমে ফুলে যায়।

প্রতিকার: হার্ট ফেইলিউর চিকিৎসারক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপনে অ্যাসপাইরিন, ডাইগোজিন, নাইট্রোগ্লিসারিন ও অন্যান্য নাইট্রেট, বিটা ব্লকারস, ACE ইনহেবিটর, ডাইইউরেটস, ওয়ারফারিন ইত্যাদি ওষুধ দিয়ে থাকেন। প্রযোজনে চিকিৎসকগণ বাইপাস সার্জারি কিংবা ভালু প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৪.৯ হৃৎরোগের চিকিৎসায় ধারণা

হৃৎরোগ রোগ নির্ণয়

- চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্থাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখে হৃৎরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
- বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
- ইসিজি (Electrocardiogram)- হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ে ইসিজি সাহায্য করে।
- ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
- রক্তের BNP (brain natriuretic peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
- হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানার জন্য MRI (magnetic resonance imaging) পরীক্ষা করা।
- উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা।

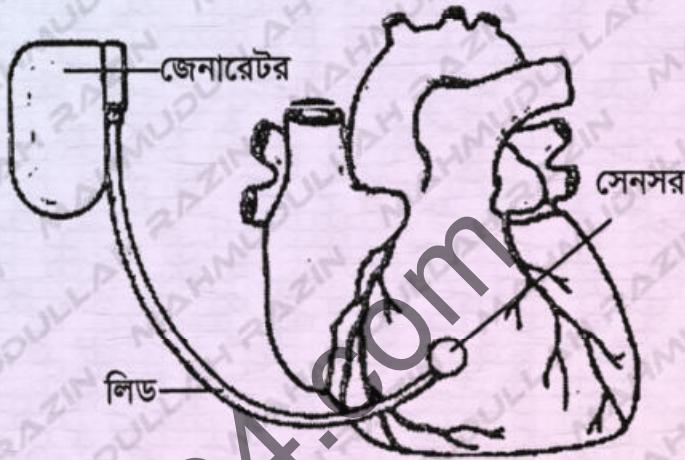
১। পেস মেকার কার্যক্রম

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেতিতে প্রসারিত হয়ে সমস্ত দেহে রক্ত পরিচালনা করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে 75 বার হৃৎক্র বা হার্টবিট সম্পন্ন হয়। এতে প্রচণ্ড গতিতে (ধমনিতে 40 cm/s, শিরায় 15 cm/s) দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে বিদ্যমান Sino-Atrial Node বা SAN নামক বিশেষ ধরনের কলা থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত বা ইলেক্ট্রিকেল সিগন্যাল সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হৃৎক্র সম্পন্ন হয়। Sino-Atrial Node বা SAN কে পেসমেকার (pacemaker) নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে বিদ্যমান এ পেসমেকার বিরামহীনভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখে। কোনো কারণে এ পেসমেকার কাজ না করলে ক্রটিযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয় এবং হার্টবিটের ছন্দোপতন ঘটে। একে অ্যারিদমিয়াস (arrhythmias) বলে। এসময় হার্ট বিট খুব দ্রুত গতিতে (tachycardia) বা খুব মস্তর (bradycardia)

গতিতে সংঘটিত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত রক্ত দেহে সরবরাহ করতে পারে না। এরকম ঘটনায় আমরা ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করি। তীব্র অ্যারিদমিয়াস দেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গের কলা ধ্বংস করে এবং অনেকসময় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করে।

দেহের Sino-Atrial Node বা পেসমেকার কাজ না করলে হৃৎপিণ্ডের সাথে কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করে অ্যারিদমিয়াস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হার্টবিট স্বাভাবিক করা যায়। কৃত্রিম পেসমেকার হলো একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হৃৎস্পন্দন এর সূচনা করে। এটি স্থাপিত হলে যাদের হৃৎস্পন্দনের সমস্যা আছে তারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রা করতে পারে। দুইজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, 1969 খ্রিস্টাব্দে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।



চিত্র ৪.২৪ পেসমেকার পরানো হৃৎপিণ্ড

পেসমেকার যা করে: এটি মহুর হৃৎস্পন্দনকে গতিশীল করে এবং দ্রুতশীল হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক করে। এটি হৃৎপিণ্ডের উপরের ও নিচের প্রকোষ্ঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতের সমন্বয় ঘটায়। এটি বিপদ্জনক হার্টবিট long QT syndrome (LQTS) নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিক পেসমেকার রক্তের তাপমাত্রা, শ্বাস হার এবং হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এছাড়া এগুলো মানুষের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সাথে হৃৎস্পন্দনের সমন্বয় করতে পারে। পেসমেকার স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী হতে পারে। যন্ত্র মেয়েদের হৃৎযন্ত্রের সমস্যা যেমন, হার্ট এটাক ঘটাতে পারে এমন ধীর হৃৎস্পন্দন কিংবা হার্ট সার্জারির সময় জরুরী ভিত্তিতে অস্থায়ী পেস মেকার ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি হৃৎযন্ত্রের অ্যারিদমিয়াস সমস্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী পেসমেকার ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে এধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে আরো আধুনিক যন্ত্র আইসিডি (ICD =implantable cardioverter defibrillator) ব্যবহার করা হয়।

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে: একটি পেসমেকার প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত-একটি জেনারেটর (generator) এবং একটি লিড (lead) বা তার। জেনারেটরটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি নিয়ন্ত্রিত একটি স্কুদ্র কম্পিউটার যেটি টিচিনিয়াম নির্মিত একটি বাক্সে আবদ্ধ থাকে। তারটি নমগীয় প্রতিরোধক আবরণযুক্ত যার এক প্রান্ত জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্তটি মুক্ত থাকে যা হৃৎপিণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়। তারের মুক্ত প্রান্তে সেনসর বা ক্যাথোড থাকে। তবে বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ পেসমেকারের দুটি তার থাকে যাদের একটি ডান অলিন্দে এবং অপরটি ডান নিলয়ে যুক্ত করা হয়।

স্থানীয় অ্যানেস্থেসিয়ার (অবশ) মাধ্যমে দেহে পেসমেকার স্থাপন করা হয়। এটি স্থাপন করতে 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় লাগে। এর জেনারেটরটি কর্ষাছি (collar bone/clavicle) সংলগ্ন তুকের নিচে স্থাপন করা হয়। লিড বা তারের ক্যাথোড প্রান্তটি উপযুক্ত শিরার ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত স্থানে সংযুক্ত করা হয়।

পেসমেকার হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এর ইলেক্ট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ শনাক্ত করে এবং তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। কোনো অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নির্ণীত হলেই জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক উদ্বৃত্তি তারের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পৌছায় এবং হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক করে।

২। ওপেন হার্ট সার্জারি

হৃৎপিণ্ডের অনেক জটিল সমস্যা দূর করতে অঙ্গোপচারের প্রয়োজন হয়। সাধারণত চিকিৎসকগণ বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে বুকের অস্থিকে চিরে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন। এধরনের অঙ্গোপচারকে ওপেন হার্ট সার্জারি (open heart surgery) বলা হয়। টেরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Wilfred G. Bigelow, 1950 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

যেসব ক্ষেত্রে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়-

- ১। করোনারি রক্তনালিতে ব্লক হলে দেহের অন্য কোনো রক্তনালি দিয়ে বন্ধ রক্তনালিতে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করা।
- ২। হৃৎপিণ্ডের কোনো কপাটিকার (valve) মেরামত বা প্রতিস্থাপনের করা।
- ৩। হৃৎপ্রাচীরের কোনো নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা।
- ৪। হৃৎপিণ্ড কোনো যন্ত্র বসানো।
- ৫। হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে কোনো দাতার হৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

যেভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়

ওপেন হার্ট সার্জারিতে একদল দক্ষ বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের (surgeon) প্রয়োজন হয়। ওপেন হার্ট সার্জারির শর্করে রোগীকে সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়ার (general anesthesia) মাধ্যমে অজ্ঞান করা হয়। এরপর বুকের স্টাৰ্টাম বরাবর 8-10 ইঞ্জিন কেটে ভেতরের হৃৎপিণ্ড উন্মুক্ত করা হয়। ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিম্নলিখিত তিনি উপায়ে করা হয়:

১। অন-পাম্প সার্জারি (On-pump surgery): একে কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (Cardiopulmonary bypass) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে পুরোপুরি থামিয়ে দিয়ে সার্জারি করা। এসময় একটি হার্ট-লাং মেশিনের (Heart-Lung machine) সাহায্যে দেহের রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখা হয়। এটি একটি প্রচলিত ধরনের ওপেন হার্ট সার্জারি।

২। অফ-পাম্প বা বিটিং হার্ট সার্জারি (Off-pump or beating heart surgery): এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে সচল রেখে সার্জারি করা হয়। এসময় কোন হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে নেয়া হয় না।

৩। মিনিমালি ইনভেসিভ বা রোবট সহযোগী সার্জারি (Minimally invasive or Robot-assisted surgery): এক্ষেত্রে বুকের খুব অল্প অংশ কাটা হয় এবং শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাতের সাহায্যে অঙ্গোপচার করেন। এটি একটি আধুনিক ও নিখুত ওপেন হার্ট সার্জারি।

সতর্কতা

ওপের হার্ট সার্জারির রোগীদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন-ওপেন হার্ট সার্জারির পর রোগীকে হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে (intensive care unit-ICU) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। ওপের হার্ট সার্জারির পর ধূমপান সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। চর্বিমুক্ত খাবার খেতে হবে। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়মিত নিয়মমাফিক হাঁটাচলা করতে হবে। কোনরকম শারীরিক অসুবিধা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং ওষুধ সেবন করতে হবে।

বাংলাদেশে ওপের হার্ট সার্জারির অবস্থা

ওপেন হার্ট চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকে খুব ভয় পায়। ওপেন হার্ট সার্জারি একসময় অনেক ব্যয়বহুল ও দুর্লভ ছিল। এ ধরনের চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমন ছাড়া রোগীদের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে এখন বাইরের তুলনায় অনেক কম খরচে স্ফুলতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এটি এখন অন্যান্য অনেক সাধারণ সার্জারির মতো চিকিৎসা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রতি মাসে বাংলাদেশে প্রায় 500 ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। এতে মৃত্যু হারও এখন মাত্র 0.4%। এর প্রতি মানুষের ভয়ও অনেকটা কেটে গেছে। সকালে অপারেশন হলে রোগী বিকালে চা খেতে পারে। আর দেড় থেকে দুমাসের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

৩। করোনারি বাইপাস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় করোনারি বাইপাস (Coronary bypass) বলতে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট বা সিএবিজি (Coronary Artery Bypass Graft-CABG) সার্জারি বুঝায়। হার্টে ইশকেমিক হার্ট ডিজিস অর্থাৎ এব ধমনিতে ব্লক হলে তা যদি স্টেন্ট বা রিং পড়িয়ে বা এনজিওপ্লাস্টি করে ভালো করার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সিএবিজি বা করোনারি বাইপাস অপারেশন করাতে হয়। করোনারি বাইপাসের সময় রোগীর ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়। এসময় রোগীর বুকের হাড়টিকে ইলেকট্রিক করাত দিয়ে কাটা হয় এবং হার্টের ধমনির যেসব জায়গায় ব্লক আছে তাব পৰবর্তী স্থান

আরেকটি রক্তনালি (গ্রাফট) লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে ঝরের সামনে ও পেছনের ধমনিতে স্বাভাবিক হারে রক্ত প্রবাহ চলমান থাকে। পায়ের বা হাতের মোটা শিরা দিয়ে এ নতুন রক্তনালি তৈরী করা হয়। এজন্য সিএবিজি অপারেশনের রোগীর পা এবং হাতে কাটা দাগ থেকে যায়।

ধৈর্যে করোনারি বাইপাস করা হয়

করোনারি বাইপাস হার্ট স্পন্দিত অবস্থায় বা বিটিং হার্টে (beating heart) করা যায়। একে অবক্যাব (opcab) সার্জারি বলে। তবে বর্তমানে হৎস্পন্দন বন্ধ করেই (arrested heart) অধিকাংশ সিএবিজি সার্জারি করা হয়। এক্ষেত্রে হার্টকে পুরোপুরি থামিয়ে দেয়া হয় এবং অপারেশনের সময় হার্ট-লাং মেশিন (heart-lung machine) হৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালিয়ে নেয়। বুকের মাঝখানে কাটা ছাড়াও বামপাশে ছেট করে কেটে সিএবিজি অপারেশন করা যায়। একে বলা হয় মিডক্যাব (MIDCAB) সার্জারি। বর্তমানে রোবট (robot) দিয়েও সিএবিজি সার্জারি (robotic surgery) করা হচ্ছে।

এর ফলে হার্টের সার্জন একদেশে বসে অন্যদেশের রোগীর সিএবিজি সার্জারি করতে পারে। রোবটিক সার্জারিতে রোগীর গায়ে খুবই সামান্য একটি কাটা দাগ থাকে এবং খুব দ্রুত রোগী বাড়ি চলে যেতে পারে। করোনারি বাইপাস সার্জারি এখন আর কোনো ভৌতিক সার্জারি নয়, এমনকি পুরোপুরি অজ্ঞান না করেও এ অপারেশন করা যায়। এর উন্নরণের সাফল্যে মানুষের হৃদরোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে।

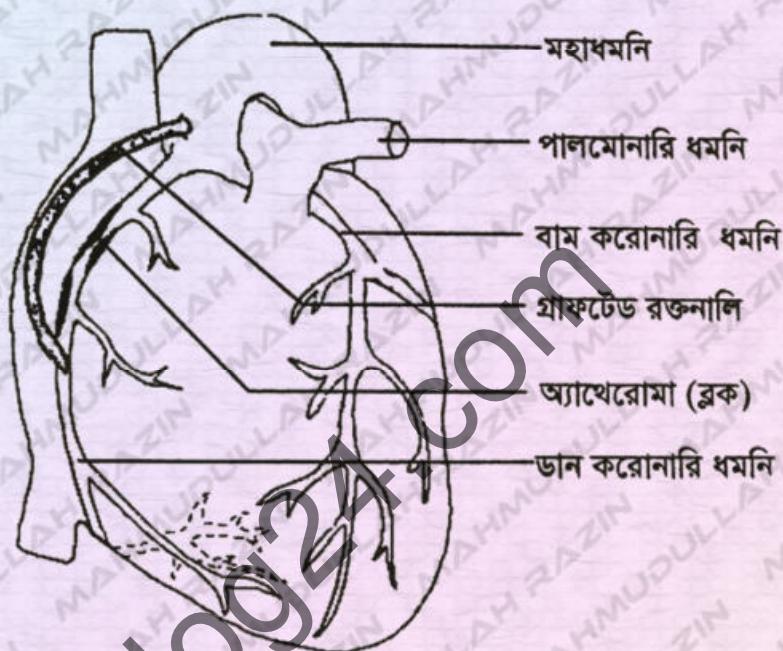
করোনারি বাইপাসের সফলতার হার

প্রায় 90% করোনারি বাইপাসের রোগী অপারেশনের পর তাৎপর্যপূর্ণ ভালো অবস্থা অনুভব করে। 70% রোগীর কোনো বুকের ব্যথা থাকে না এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, 20% রোগী আংশিকভাবে সৃষ্ট্যতা অনুভব করে এবং মাত্র 5-10% রোগীর একবছরের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কম বয়সী রোগী তুলনামূলক বেশি সৃষ্ট্যতা ফিরে পায়। 70 বছর অধিক বয়সের রোগীদের কিছুটা সমস্যা থেকেই যায়। হৃরোগ প্রতিরোধের সাধারণ নিয়মগুলো যারা মেনে চলে না তারা করোনারি বাইপাসের দীর্ঘমেয়াদী সুফল পায় না। করোনারি বাইপাসের পর 90% রোগী কমপক্ষে 5 বছর, 80% রোগী 10 বছর, 55% রোগী 15 বছর এবং 40% রোগী 20 বছরের অধিককাল বেঁচে থাকে।

৮। অ্যানজিওপ্লাস্টি

অ্যানজিওপ্লাস্টি (angioplasty) বা করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি (coronary angioplasty) হলো এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে হৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশকে প্রশস্ত করা হয়। একে পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন (percutaneous coronary intervention=PCI) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৎপিণ্ডের বড় ধরনের অঙ্গোপচারের প্রয়োজন পড়ে না, কেবল করোনারি ধমনির ভেতর একটি ক্যাথেটার (catheter) প্রবেশ করিয়ে ধমনিকে প্রশস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি করোনারি স্টেন্ট (coronary stent) স্থাপন করা হয়। অ্যানজাইনা ও হার্ট অ্যাটাকের হৃরোগীদের করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করাতে হয়। অ্যানজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৎপিণ্ড সচল থাকে।

যে কারণে করোনারি ধমনি সরু হয়ে যায় তাকে অ্যাথারোমা (atheroma) বলে। করোনারি ধমনির প্রাচীরে একটু একটু করে দীর্ঘদিনব্যাপী কোলেস্টেরল জাতীয় চর্বি ক্রমে জমা হয়ে প্ল্যাক (plaques) গঠন করে। এ প্ল্যাক ক্রমে পুরু হয়ে



চিত্র ৪.২৫ করোনারি বাইপাস করা হৎপিণ্ড

অ্যাথারোমা গঠন করে যাকে সাধারণত করোনারির ব্লক বলা হয়। করোনারি আর্টারিতে একসাথে একাধিক অ্যাথারোমা গঠিত হতে পারে।

করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি যেভাবে করা হয়

➤ কুঁচকির অথবা বাহুর (groin or arm) প্রধান রক্তনালিতে একটি মোটা সুইয়ের দ্বারা একটি গাইড ক্যাথেটার (guide catheter) প্রবেশ করানো হয়। এসময় যাতে ব্যথা না লাগে সেজন্য তৃকে লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার প্রয়োজন হয়।

➤ ডাক্তার ক্যাথেটারটিকে খুব ধীরে ধীরে ঠেলে হৎপিণ্ডের দিকে নিতে থাকে। একাজটি X-ray মেশিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রোগী নিজেও এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

➤ গাইড ক্যাথেটারের প্রান্তটি শেষ পর্যন্ত করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা গঠিত সরু অংশে প্রবেশ করানো হয়। এরপর রক্তনালিতে গাইড ক্যাথেটারের মাধ্যমে একটি বেলুন ক্যাথেটার (balloon catheter) পাঠানো হয়। এর পাস্তে থাকে একটি বেলুন ও একটি স্ট্যান্ট।



চিত্র ৪.২৬ করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টির বিভিন্ন ধাপ (ক্যাথেটারাইজেশন)

➤ করোনারি আর্টারির অ্যাথারোমা অংশে বেলুন ও স্ট্যান্ট প্রবেশ করানোর পর 30-60 সেকেন্ডের মধ্যে বেলুনটিকে ফেলানো হয়। ফলে অ্যাথারোমার চর্বিগুলো চেপে গিয়ে সরু ধমনিকে প্রশস্ত করে। এসময় কিছুক্ষণের জন্য বুকে অ্যানজাইনার মতো তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

➤ সাধারণত বেলুন দ্বারা প্রশস্তকৃত অংশে স্ট্যান্টটি স্থাপন করা হয়। এটি ধাতুর তৈরি তারের জালিকাকার গঠন বিশিষ্ট কয়েক সেন্টিমিটার লম্বাকৃতির নল বিশেষ। এটি সুতার তৈরিও হতে পারে। স্ট্যান্টে কিছু ওষুধের প্রলেপ থাকে সেগুলো সর্বদা ধমনিতে মুক্ত হয়। এধরনের ওষুধ থাকার ফলে ধমনিতে পুনরায় ব্লক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। করোনারি ধমনির এক বা একাধিক স্থানে একই প্রক্রিয়ায় স্ট্যান্ট স্থাপন করা হতে পারে।

একটি স্থানে অ্যানজিওপ্লাস্টি করাতে 30-40 মিনিটের মতো সময় লাগে। একাধিক স্থানের অ্যানজিওপ্লাস্টি করাতে আরো অধিক সময় লাগে। অ্যানজিওপ্লাস্টি করানোর পর রোগীকে একদিন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। অনেকসময় ধমনির সরু স্থান বেলুনের চাপে প্রসারিত হয় না। এক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টি সম্ভব হয় না এবং চিকিৎসকগণ রোগীকে সিএবিজি সার্জারির পরামর্শ দেন।

অ্যানজিওপ্লাস্টির ঝুঁকি: অধিকাংশক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টির তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ যেমন, এ প্রক্রিয়ার কারণে অনেকসময় করোনারি ধমনি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দ্রুত সিএবিজি সার্জারির প্রয়োজন হয়। হার্ট অ্যাটাকের ঘটনাও ঘটতে পারে। ক্যাথেটার প্রবেশের সময় ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো স্ট্রোকের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। স্টেন্টের ভেতরে কয়েক মাস বা এক বছরের মধ্যে নতুন করে অ্যাথারোমা সৃষ্টি হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- **রক্ত:** রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যোজক কলা যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্লাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বন্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়।
 - : রক্তের দৈর্ঘ্য ক্ষারধৰ্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে। প্লাজমা রক্ত কণিকাসমূহ ধারণ করে এবং বক্তৃব তারল্যতা রক্ষা করে।
 - **রক্তকণিকা:** রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলা হয়। এগুলো অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়।
 - **এরিথ্রোসাইট:** রক্তরসে বিদ্যমান লালবর্ণের, বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন, চাকতির মতো গঠন বিশিষ্ট রক্তকণিকাকে এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা বা হিমাটিড বলে।
 - **লিউকোসাইট:** রক্তে বিদ্যমান স্বচ্ছ, নিউক্লিয়াসযুক্ত, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার গঠন বিশিষ্ট রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা বলে।
 - **থ্রোমোসাইট:** রক্তে বিদ্যমান বণহীন, ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিস্কাকার বা দণ্ডাকার রক্তকণিকাকে থ্রোমোসাইট বা অণুচক্রিকা বা ব্লাড প্লাটিলেট বলে।
 - **লসিকা:** লসিকা জালিকা, লসিকা-নালি এবং লসিকা-গড়ের সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতত্ত্বের মধ্যে যে তরল দেখা যায় তার নাম লসিকা।
 - **রক্ততঞ্চল:** যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ করে তাকে রক্ততঞ্চল প্রক্রিয়া বলে।
 - **হৃৎপিণ্ড:** মানুষের রক্ত সংবহনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় পদ্ধতি যন্ত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এটি সর্বদা একটি ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে আসা রক্ত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে।
 - **হৃৎস্পন্দন:** হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণকে (শুঁইন) হৃৎস্পন্দন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে কতগুলো ধারাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হয়।
 - **উচ্চ রক্তচাপ:** নির্দিষ্ট বয়সের মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাপের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে 140 ও 90 মিলিমিটার/পারদ-এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।
 - **হার্ট ফেইলিউর:** হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সাথে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর বলে।
 - **অ্যানজিওপ্লাস্টি:** অ্যানজিওপ্লাস্টি বা করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি হলো এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধরনির সরঁ হয়ে যাওয়া অংশকে প্রশস্ত করা হয়। একে পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন বলা হয়।
- প্রতি 60 সেকেন্ডে দেহের সমস্ত রক্ত একবার সমগ্র মানবদেহে পরিভ্রমণ করে।
 - মানবদেহের সকল ধরনি, শিরা ও কৈশিক জালিকার সর্বমোট দৈর্ঘ্য 60,000 মাইলের অধিক যা দিয়ে পৃথিবীকে দুইবার পাঁচানো যাবে।
 - মানুষের একফোটা রক্তের অর্ধেক ফোটা প্লাজমা, 5 মিলিয়ন লোহিত রক্ত কণিকা, 10 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা এবং 250 হাজার অণুচক্রিকা।
 - প্রতি মিনিটে মানব হৃৎস্পন্দন ঘটে 72 বার যা সারাদিনে 100,000 বার, বছরে 3,600,000 বার এবং 70 বছর বয়স্ক একজন মানুষের সারাজীবনে 2.5 বিলিয়ন বার।
 - হৃৎপিণ্ড সক্রিয় রাখতে প্রতি মিনিটে 1-5 ওয়াট বিদ্যুৎ সম্পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়।
 - একজন সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড দিয়ে প্রতিদিন গড়ে 2000 গ্যালন রক্ত প্রবাহিত হয়।
 - গর্ভধারণের চার সপ্তাহ পর থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এটি অবিরাম চলতে থাকে। একটি সদ্যোপ্রসৃত শিশুর দেহে 90 মিলিলিটার/কেজি মাত্রায় রক্ত থাকে।

- অলস ও নিক্রিয় ব্যক্তিরা নিয়মিত ব্যায়ামকারী ও কায়িক পরিশ্রমি ব্যক্তি থেকে হৃদরোগের দ্বিগুণ ঝুঁকিতে থাকে।
- প্রিকদের বিশ্বাস হৃৎপিণ্ড সকল প্রেরণার উৎস, চাইনিজরা মনে করে সকল সুখের কেন্দ্র হলো হৃৎপিণ্ড এবং মিশরীয়দের বিশ্বাস মানুষের আবেগ ও বৃক্ষিমত্তা হৃৎপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১. কোন রক্তকণিকা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে?

ক. নিউট্রোফিল	খ. বেসোফিল	গ. ইওসিনোফিল	ঘ. লিফ্রোসাইট
---------------	------------	--------------	---------------
২. রক্ততঝনে কোন ধাতব আয়ন অংশগ্রহণ করে?

ক. Ca^{++}	খ. Mg^{++}	গ. Cu^{++}	ঘ. Fe^{++}
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------
৩. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে না, কারণ-
 - i. রক্ত প্রচঙ্গ গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকায়, ii. রক্তে অ্যান্টিকোয়াগ্যুলেন্ট ফ্যাট্টির হেপারিন থাকায়, iii. সক্রিয় কোয়াগ্যুলেন্ট ফ্যাট্টেরগুলোকে যকৃত কর্তৃক সর্বদা অপসারণ হওয়ায়, -নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii	গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii
-----------	------------	-------------	----------------

নিচের উদ্দীপক চিত্রের আলোকে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
৪. পুরুষের প্রতি ঘনমিলিলিটার রক্তে চিত্রের রক্ত কণিকাটি কি পরিমাণে থাকে?

ক. ৪.৪ মিলিয়ন	গ. ৭.৪ মিলিয়ন
খ. ৬.৪ মিলিয়ন	ঘ. ৫.৪ মিলিয়ন
৫. উদ্দীপকের রক্তকণিকার কাজ-
 - i. রক্তনালির ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন করে, ii. ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমাণে CO_2 পরিবহন করে, iii. বিলিউবিন ও বিলিবার্জিন উৎপন্ন করে, -নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii	গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii
-----------	------------	-------------	----------------
৬. পেসমেকার ব্যবহারের কারণ হলো-
 - i. হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত প্রবাহে বাধাগ্রস্থ হলে, ii. রক্তবাহিকায় প্লাক জমার কারণে, iii. সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড ক্ষতিগ্রস্থ হলে -নিচের কোনটি সঠিক?

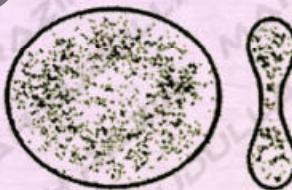
ক. i ও ii	খ. i ও iii	গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii
-----------	------------	-------------	----------------

নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-

মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে মহাধমনির মাধ্যমে O_2 যুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যায় এবং CO_2 যুক্ত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এজন্য হৃৎপিণ্ডকে সজীব পাস্পযন্ত্র বলা হয়।
৭. উদ্দীপকে বর্ণিত ধৰ্মনি হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপন্নি লাভ করে?

ক. ডান অ্যাট্রিয়াম	খ. বাম অ্যাট্রিয়াম	গ. ডান ভেন্ট্রিকল	ঘ. বাম ভেন্ট্রিকল
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------
৮. উদ্দীপকে উল্লেখিত পাস্পযন্ত্রটির পেশিতে রক্ত সংক্ষেপে কোন ধরনের রক্ত সংবহনতত্ত্ব বলে?

ক. সিস্টেমিক	খ. করোনারি	গ. পোর্টাল	ঘ. পালমোনারি
--------------	------------	------------	--------------



সূজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। কামাল সাহেবের কয়েকদিন যাবৎ প্রচঙ্গ বুকে ব্যথা। এ ব্যথা প্রায়শই কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের ডাক্তার ব্যথা নাশক ও মুখ দিয়ে ছিল। কিন্তু ব্যথা না কমায় ঢাকা নিয়ে এলে ডাক্তার একে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা বলে চিকিৎসা শুরু করেন।
 - (ক) পেরিকার্ডিয়াম কী?
 - (খ) করোনারি সংবহন বলতে কী বোঝ ?
 - (গ) উদ্দীপকে কামাল সাহেবের বুকে ব্যথার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - (ঘ) উদ্দীপকে কামাল সাহেবের রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে।

অধ্যায় ৫

মানব শারীরতত্ত্ব: শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া



মানবদেহের প্রতিটি কোষে সর্বদা বিভিন্ন রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর মধ্যে কিছু বিক্রিয়াতে শর্করা জারিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। শর্করা জারণের সময় প্রয়োজন হয় অনেক অক্সিজেন। আর জারণের ফলে সৃষ্টি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড। এ বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন দেহে উৎপন্ন হয় না। আবার সৃষ্টি কার্বন ডাই অক্সাইড দেহ ধারণ করতে পারে না। যেসব বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে শর্করা জারণ বিক্রিয়া ও এন্ডুটি গ্যাসের আদান-প্রদান ও পরিবহন সম্পন্ন হয় তাদের সমষ্টিগতভাবে শ্বসন বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words): শ্বসনতত্ত্ব, ট্রাকিয়া, ব্রেঙ্গ, ব্রাকিয়াল বৃক্ষ, হিমোগ্রেবিন, হ্যামবাজার বিক্রিয়া, সাইনুসাইটিস, ওটিস মিডিয়া, CPR.

পি঱িয়ড সংখ্যা ১০। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল) -

- মানুষের শ্বসনতত্ত্বের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ব্যবহারিক: ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।
- মানুষের প্রশ্বাস-নিশ্বাস কার্যক্রম (ventilation mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
- রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন (transport) ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একজন ধূমপার্যী ও একজন অধূমপার্যী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মৃত্যু হতে মুক্ত সাহায্যে কৃতিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

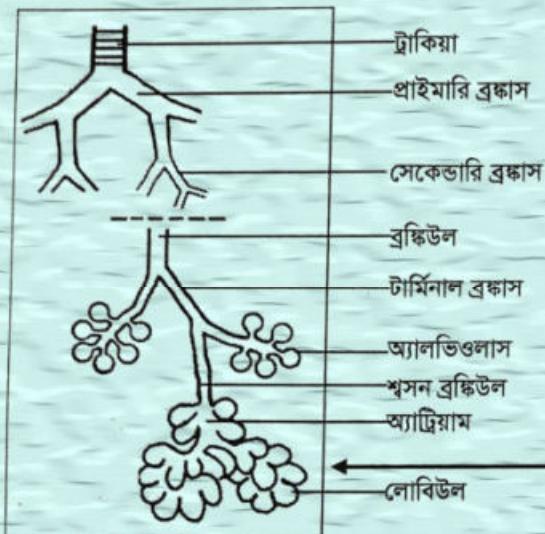
যে প্রক্রিয়ায় আণী বায়ু হতে অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ করে সেই অক্সিজেনের সাহায্যে কোষস্থিত সরল খাদ্যকে জারিত করে খাদ্যস্থিত হিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তর করে এবং এতে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডকে (CO_2) দেহ হতে বহিকার করে তাকে শ্বসন বলে। মানবদেহে অবিবাম শ্বসন ক্রিয়া চলে। শ্বসন একটি জটিল প্রক্রিয়া। মানুষের রক্ত দ্বারা শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় বলে শ্বসনের দুটি পর্যায় থাকে, যথা- বহিশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন।

■ **বহিশ্বসন (External respiration):** যে প্রক্রিয়ায় শ্বসন অঙ্গের রক্ত ও পরিবেশের মধ্যে শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে তাকে বহিশ্বসন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া যাতে দেহ প্রকৃতি থেকে মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং প্রকৃতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড অর্পণ করে।

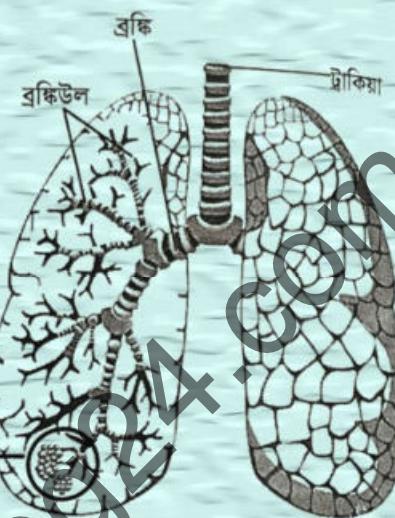
■ **অন্তঃশ্বসন (Internal respiration):** শ্বসনের যে পর্যায়ে কোষে খাদ্যবস্তুর জৈবিক জারণ (biological oxidation) ঘটে সম্পন্ন হয় এবং রক্ত দ্বারা শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।

জৈবিক জারণ প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ জারণ প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি জটিল জারণ-বিজারণ (oxidation-reduction) প্রক্রিয়া যা কতগুলো এনজাইম ও কো-এনজাইম সহযোগে কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। এতে নিম্নের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে-





চিত্র ৫.৩ ব্রাকিয়াল বৃক্ষ



চিত্র ৫.২ মানুষের ফুসফুস

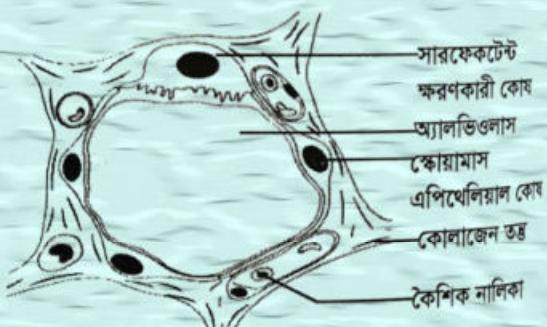
অ্যালভিওলাস (Alveolus)

ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক হলো অ্যালভিওলাস। প্রতিটি অ্যালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদ্বুদ সদৃশ বায়ুকূঠুরী বিশেষ। এদের প্রতিটির ব্যাস ০.২ মিলিমিটার এবং প্রাচীর মাত্র ০.১ মিলিমিটার পুরু। এদের প্রাচীরে কৈশিকজালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। অ্যালভিওলাসের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির ক্ষেত্রে আপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া এদের প্রাচীরে কিছু ইতিহাপ্রকোলাজেন তন্ত্র থাকে। এসব তন্ত্র থাকার কারণে অ্যালভিওলাসের সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটে।

অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিদ্যমান এপিথেলিয়াম, টাইপ-১ কোষ থেকে প্রাচীরের ভেতরের দিকে প্রোটিন ও লিপিড গঠিত পালমোনারি সারফেক্টেন্ট (pulmonary surfactant) নামক ডিটারিজিন্ট জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। পাঁচ মাস (২৩ সপ্তাহ) বয়সের মানব জনে এটি পাওয়া যায়। এ পদার্থ অ্যালভিওলাসে তরলের পৃষ্ঠাটান করিয়ে গ্যাসীয় বিনিময় সহজ করে। এছাড়া এটি ফুসফুসে আগত জীবাণুকে ধ্বনি করে। ফুসফুসে অ্যালভিওলাসের সংখ্যা বয়সের সাথে সম্পর্কিত। একজন পূর্ববয়স্ক সুস্থ মানুষের দুটি ফুসফুসে গড়ে প্রায় 480 মিলিয়ন অ্যালভিওলাই থাকে (পরিমাণ 274-790 মিলিয়ন) এবং এগুলো প্রায় 11,800 বেগ মিলিমিটার শ্বসনতল সৃষ্টি করে।

ফুসফুসের কাজ :

- ১। ফুসফুস মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ, তবে এটি শ্বসন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজ সম্পাদন করে।
- ২। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বসন গ্যাসের বিনিময় সংঘটিত হয়।
- ৩। ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষ ঘটে।
- ৪। ফুসফুস দেহ হতে শ্বসন বর্জ্য CO_2 নিষ্কাশন করে।
- ৫। এটি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, পানিসাম্যতা রক্ষা ও শব্দ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।
- ৬। ফুসফুসীয় কলা সেরোটোনিন ও হিস্টামিন সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে।
- ৭। এটি নরঅ্যাড্রেনালিন (noradrenaline) ও অ্যাড্রেনালিনকে (adrenaline) নিষ্কাশন করে।
- ৮। এটি ইমিউনোগ্রেবিন ক্ষরণ করে, এটি অ্যানজিওটেনসিন I কে অ্যানজিওটেনসিন II এ রূপান্তরিত করে।



চিত্র ৫.৪ একটি অ্যালভিওলাসের প্রস্তুতি

৯। ফুসফুসীয় কলা ত্রাডিকিনিন ও প্রোস্টাগ্লাডিন সংশোধ ও দেহ হতে অপসারণ করে।

৫.২ ব্যবহারিক: ফুসফুসের অণুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

মানুষের ফুসফুসের অণুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড অণুবীক্ষণযন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলে নিচের চিত্রের মতো গঠন দেখা যাবে। চিত্রটি তোমার ব্যবহারিক খাতায় অংকন কর।

নমুনার শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

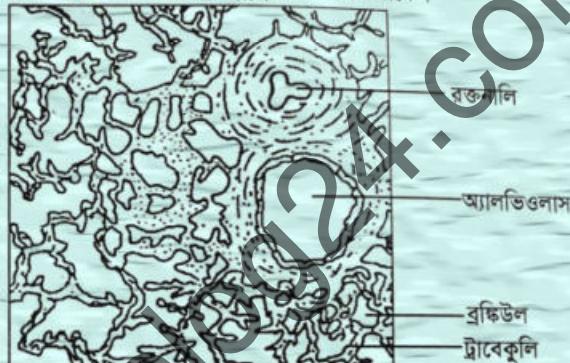
১। ট্রাবেকুল নামক ব্যবধায়ক পর্দা দ্বারা বিচ্ছিন্ন অসংখ্য অ্যালভিওলাই বা বায়ুকুর্তুরী বিদ্যমান থাকে।

২। অ্যালভিওলাইয়ের প্রাচীর সিলিয়াযুক্ত অপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রাচীরের বাইরে কৈশিকজালিকা থাকে।

৩। এতে অসংখ্য সিলিয়াযুক্ত ব্রিকিউল থাকে।

৪। এতে অসংখ্য ফুসফুসীয় রক্তনালি বিদ্যমান।

৫। অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে ৫ ধরনের কোষ বিদ্যমান, যথা- টাইপ I অ্যালভিওলার কোষ, টাইপ II অ্যালভিওলার কোষ, ম্যাক্রোফেজ, এন্ডোথেলিয়াল কোষ এবং লোহিত কণিকা।



চিত্ৰ ৫.৫ মানুষের ফুসফুসের অণুচ্ছেদ

৫.৩ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ (Ventilation mechanism and control)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন সমৃক্ষ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃক্ষ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে শ্বাসক্রিয়া (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রহ্মশন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হাস-বৃক্ষির ফলে ফুসফুসের আয়তন সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুধূরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তনের হাস-বৃক্ষি ঘটে। পেশিগুলো হলো:

- (১) বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত ডায়াফ্রাম (diaphragm) এবং
- (২) পর্তকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত ইন্টারকোস্টাল পেশি (intercostal muscle)।

শ্বাসক্রিয়া দুটি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা-

□ প্রশ্বাস বা শ্বাস হঠাৎ (Inspiration): ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশির মুগপৎ সংকোচনের মাধ্যমে প্রশ্বাস কার্য শুরু হয়। ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচনে পর্তকাগুলো উপর ও বাইরের দিকে প্রসারিত হয়। এতে বক্ষের আয়তন বৃক্ষি পায়। অন্যদিকে ডায়াফ্রাম ধূনুক অবস্থা হতে সংকেচিত হয়ে সমতল আকার ধারণ করে, ফলে উহা সামান্য নিচে নেমে গিয়ে বক্ষগহ্বরের আয়তনকে লম্বালভিডাবে বৃক্ষি করে। এভাবে বক্ষগহ্বর প্রসারণের ফলে অন্তঃপ্রিউরাল (intrapleural) ও অন্তঃবক্ষীয় (intrathoracic) চাপ হাস পায় এবং ফুসফুস প্রসারিত হয়। ফুসফুস প্রসারণের ফলে অন্তঃফুসফুসীয় বায়ুচাপ অন্তর্বক্ষীয় (intrathoracic) চাপ হাস পায় এবং ফুসফুস থেকে প্রশ্বাস বায়ু ($20.9\% O_2$ এবং $0.04\% CO_2$) নাসিকা ও শ্বাসনালির মধ্য দিয়ে দ্রুত সূত্রে দ্রুত প্রবেশ করে। ফুসফুসে প্রবেশকৃত প্রশ্বাস বায়ুতে এবং রক্তে বিদ্যমান শ্বেষন গ্যাসের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে মাধ্যমে গ্যাসে বিনিময় ঘটে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম এ প্রক্রিয়াকে ত্বরিত করে। এভাবে প্রশ্বাস বা শ্বাসহণ সম্পন্ন হয়।

□ নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ (Expiration): প্রশ্বাসের পরপরই নিঃশ্বাস ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এটি একটি নিক্রিয় ও প্রশ্বাসের বিপরীত প্রক্রিয়া। এসময় ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশি নিখিল হয়ে আসে এবং বক্ষপ্রাচীর প্রসারিত হয়ে ফুসফুসের উপর অবসন্নভাবে ঢলে পড়ে। এতে অন্তঃফুসফুসীয় বায়ুচাপ বাইরের বায়ুচাপ হতে অনেক বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বায়ু ($13.7\% O_2$ এবং $5.2\% CO_2$) দ্রুতবেগে বের হয়ে যায়। এভাবে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ সম্পন্ন হয়।

স্বাভাবিক বা বিশ্রাম অবস্থায় একজন প্রাণ্বয়ক মানুষের প্রতি মিনিটে 16-18 বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস ফুসফুসের বায়ু

■ **টাইডাল ভলিউম:** প্রতিবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে চুকে কিংবা ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে টাইডাল ভলিউম (tidal volume) বা বায়ুমাত্রা বলে। বিশ্বাম অবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের টাইডাল ভলিউম ~500 মিলিলিটার।

■ **রেসিড্যুয়াল ভলিউম:** নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস কখনো খালি হয় না। কিছু পরিমাণ বায়ু সবসময় ফুসফুসে থেকে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝখালে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে থেকে যায় তাকে রেসিড্যুয়াল ভলিউম (residual volume) বা অবশিষ্ট ঘনমাত্রা বলা হয়। প্রাণবয়স্ক সুস্থ মানুষে এর পরিমাণ ~1500 মিলিলিটার।

■ **ভাইটাল ক্যাপাসিটি:** প্রশ্বাসের সময় ~500 মিলিলিটার বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। কিন্তু ফুসফুসের সর্বধূরণ ক্ষমতা আরও অনেক বেশি। ফুসফুসের সর্বমোট বায়ুধূরণ ক্ষমতাকে ভাইটাল ক্যাপাসিটি (vital capacity) বা বায়ুধূরণ ক্ষমতা বলে। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের বায়ুধূরণ ক্ষমতা প্রায় ~4500 মিলিলিটার। ব্যায়াম ও শরীরচর্চার মাধ্যমে এ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। দৌড়বিদদের এ ক্ষমতা প্রায় ~6000 মিলিলিটার।



চিত্র ৫.৬ প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকালে ফুসফুসের অবস্থা

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Control of breathing)

মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দুভাগ্রে নিয়ন্ত্রিত হয়, যথা স্নায়ুবিক নিয়ন্ত্রণ ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ।

ক, শ্বাস ক্রিয়ার স্নায়ুবিক নিয়ন্ত্রণ মতিক্ষেত্রে করেক্ট স্নায়ুকেন্দ্র, বিভিন্ন শ্বসন অঙ্গে বিদ্যমান প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি স্নায়ুবিক উদ্বীপনা শাস্তি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

১। **স্নায়ুকেন্দ্র:** মতিক্ষেত্রে বিদ্যমান চারটি কেন্দ্র থেকে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। মতিক্ষেত্রে পনসের (pons) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র এবং মেডুলা অবলংগ্যাটার (medulla oblongata) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। এদেরকে শ্বাসকেন্দ্র (respiratory center) বলে। পনসের পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের যথাক্রমে নিউমোট্যাক্সিক ও অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র (pneumotaxic and apneustic center) নামে পরিচিত। অন্যদিকে মতিক্ষেত্রে নিউমোট্যাক্সিক ও অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র (inspiratory/dorsal respiratory group (DRG) of neurons) ও মেডুলার পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের প্রশ্বাসকেন্দ্র (inspiratory/dorsal respiratory group (DRG) of neurons) ও নিঃশ্বাসকেন্দ্র (expiratory center/Ventral respiratory group (VRG) of neurons) নামে পরিচিত। এসব শ্বাসকেন্দ্র শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঙ্গের সাথে স্নায়ুজালক দ্বারা যুক্ত থাকে। এছাড়া স্নায়ুকেন্দ্রগুলো রজে CO_2 ও H^+ আয়ের শাস্তির প্রদর্শন করে। স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের ক্রিয়া বিপরীতযুক্তি। মাত্রার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এদের একটি উদ্বীপিত হলে অপরটি অবদমিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই ছন্দোময় প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

২। **রজে CO_2** এর উপস্থিতিতে অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র উদ্বীপিত হয়। এ উদ্বীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে পৌছায় এবং তাৎক্ষণিক প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। একই সময়ে স্নায়ু উদ্বীপনা প্রশ্বাস কেন্দ্র হতে

নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। নিউমোট্যাকসিক কোষের স্নায় উদ্বীপনা এবং ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে ফুসফুসে বায়ুস্থৰ্ত্ত্বের উদ্বীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌছালে উহা প্রশ্বামিত হয়ে পড়ে।

এর ফলে প্রশ্বাসকেন্দ্রে স্নায় উদ্বীপনা প্রেরণ বন্ধ হয় এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে স্নায় উদ্বীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রেও পৌছায়, ফলে নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে একই সাথে স্নায় উদ্বীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্রে ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রে পৌছানোতে একই সময়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়া চলাকালে ফুসফুস সংকোচনজনিত কোনো উদ্বীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌছায় না বলে উহার অবদমন ক্রিয়া অপসৃত হয় এবং অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র পুনরায় উদ্বীপিত হয়ে স্নায় উদ্বীপনা প্রশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ফলে পুনরায় প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action): শ্বসনত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গে সংঘটিত কয়েকটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন-

□ প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ফুসফুস বায়ু দ্বারা পূর্ণ হলে ফুসফুসের প্রাচীরে বিদ্যমান টান গ্রাহক কোষ উদ্বীপিত হয়। এ উদ্বীপনা ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছায়ে উহার কার্যকারিতা প্রশ্বামিত করে, ফলে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়। নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুস সংকোচিত থাকে বলে টান গ্রাহক কোষসমূহ উদ্বীপিত হয়ে না।

ফলে ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কেনো স্নায় উদ্বীপনা পরিবাহিত হয় না। এতে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র কার্যকারিতা ফিরে পেয়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। শ্বসনত্ত্বের ফুসফুসের একল প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে সৃষ্টি প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Hering-Breuer reflex) বলে। এ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দোময় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

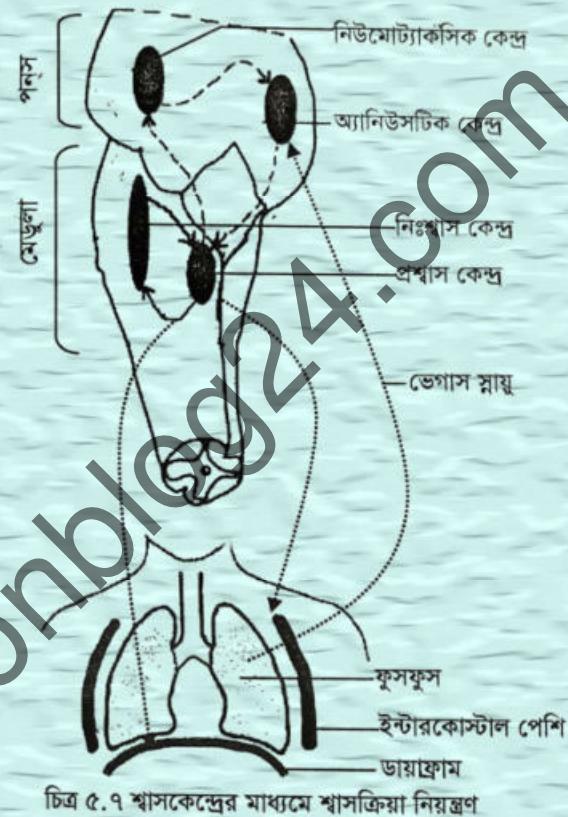
□ নাসিকা গহ্বরের প্রাচীরের মিউকাস পদার্থ উদ্বীপনা জনিত স্নায় উদ্বীপনা অলফ্যাট্রি স্নায়ুর মাধ্যমে হাঁচি (sneezing) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উভয় ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।

□ শ্বাসক্রিয়া বা ট্রাকিয়াতে কোনো বিজাতীয় বা অস্থাভাবিক পদার্থ প্রবেশ করলে উহার মিউকাস পদা উদ্বীপিত হয়ে ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কাশি (coughing) ক্রিয়ার উভয় ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।

□ খাদ্য গলাধপ্তকরণ বাধাপ্রস্তুত হলে গলবিল প্রাচীরের স্নায় উদ্বীপনা হাইপোথ্যালামাসের স্নায়ুর মাধ্যমে গ্যাগ প্রতিবর্ত (gag reflex) ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

□ অনেকসময় দেহের ত্তক, ডিসেরা, পেশি, অস্থিসঞ্চি ইত্যাদি হতে উত্তৃত স্নায় উদ্বীপনা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। অন্যান্য স্নায়ুবিক উদ্বীপনা: সেবিত্রাল কর্টেক্সের যেসব কেন্দ্র কথা বলা, আগ গ্রহণ, খাদ্য চর্বন ও গলাধকরণের সাথে জড়িত সেসব স্নায়ুকেন্দ্র অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, কথা বলার সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পর পরই দ্রুত প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। হাইপোথ্যালামাসের আবেগজনিত স্নায় উদ্বীপনা শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। দেহের কোনো স্থান হতে যন্ত্রণাদায়ক উদ্বীপনা শ্বাস ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে। অধিক যন্ত্রণাজনিত উদ্বীপনা অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে।



চিত্র ৫.৭ শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ

৪. শ্বাস ক্রিয়ার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

রক্তে CO_2 এর মাত্রা বৃদ্ধি, O_2 সংগ্রহ, H^+ আয়নের আধিক্যতা ইত্যাদি কারণে ক্যারোটিড ও অ্যাগোর্টিক রক্তনালির কেমোরিসেন্টের কোষগুলো উদ্বৃত্তি হয়ে স্নায় উদ্বৃত্তি মাধ্যমে শ্বাসকেন্দ্রগুলোকে উদ্বৃত্তি করে। আবার এসব উদ্বৃত্তি রক্ত হতে শ্বাসকেন্দ্র সরাসরি গ্রহণ করে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৫.৪ শ্বসনের শারীরবৃত্ত

মানবদেহে অবিরাম শ্বসন ক্রিয়া চলে। শ্বসন একটি জটিল প্রক্রিয়া। মানুষের রক্ত দ্বারা শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় বলে শ্বসনের দুটি পর্যায় থাকে, যথা- বহিশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন।

(ক) বহিশ্বসন (External Respiration): যে প্রক্রিয়ায় শ্বসন অঙ্গে শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে তাকে বহিশ্বসন বলে।

(খ) অন্তঃশ্বসন (Internal Respiration): শ্বসনের যে পর্যায়ে রক্ত দ্বারা শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় এবং কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।

বহিশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বহিশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১। প্রকৃতি	এটি একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২। ক্রিয়াস্থল	এটি ফুসফুসে সংঘটিত হয়।	এটি কোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়।
৩। এনজাইমের ভূমিকা	এতে এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।	এতে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক।
৪। প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৫। শক্তি	এতে কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না।	এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

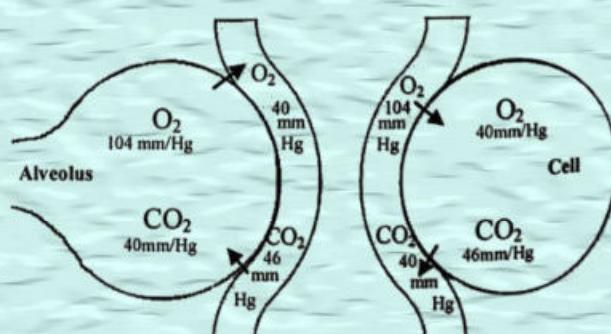
১। শ্বসন গ্যাসের বিনিময়/ বহিশ্বসন

ফুসফুসের অ্যালভিওলাইসমূহে শ্বসন গ্যাস O_2 ও CO_2 -এর বিনিময় ঘটে। গ্যাস বিনিময়ের সাধারণ সূত্রানুযায়ী একাজ সম্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় প্রবেশকৃত O_2 সমৃদ্ধ বায়ু অ্যালভিওলাসে পৌছালে উহার ভেতরের বায়ুর O_2 চাপ হয় 104 মিলিমিটার/পারদ। অন্যদিকে অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিদ্যমান কৈশিকজালিকার রক্তের O_2 চাপ থাকে 40 মিলিমিটার/পারদ। এ চাপের পার্থক্যের কারণে O_2 অ্যালভিওলাস থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়া রক্তে প্রবেশ করে। আবার কৈশিকজালিকার রক্তে CO_2 -এর চাপ থাকে 46 মিলিমিটার/পারদ এবং অ্যালভিওলাসের বায়ুতে CO_2 -এর চাপ থাকে 40 মিলিমিটার/পারদ। এ চাপের পার্থক্যের কারণে CO_2 রক্ত হতে ব্যাপন প্রক্রিয়া অ্যালভিওলাসে চলে আসে এবং নিঃশ্বাসের সাথে বের হয়ে যায়।

গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্তঃশ্বসনে বহিশ্বসনের বিপরীত ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে রক্তে O_2 ও CO_2 -এর চাপ যথাক্রমে 104 মিলিমিটার/পারদ ও 40 মিলিমিটার/পারদ এবং কলার O_2 ও CO_2 -এর চাপ যথাক্রমে 40 মিলিমিটার/পারদ ও 46 মিলিমিটার/পারদ।

চারটি প্রভাবক শ্বসন গ্যাস বিনিময়কে প্রভাবিত করে, যেমন-

- শ্বসনক্ষেত্রের আয়তন, পুরুষ, ও গঠন।
- অ্যালভিওলাসে O_2 ও CO_2 -এর চাপ।
- O_2 ও CO_2 -এর দ্রাবণ ও ব্যাপন ক্ষমতা এবং
- অ্যালভিওলাস ও রক্তে বিদ্যমান গ্যাসের শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক।



চিত্র ৫.৮ অ্যালভিওলাস ও কোষে গ্যাস বিনিময়

২। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস পরিবহন

O_2 পরিবহন কোষীয় শ্বসনে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু (গ্লুকোজ) জারিত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে। এ জারণ কার্য সম্পাদনের জন্য কোষে প্রচুর পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন হয়। এ O_2 ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল হতে গৃহীত হয় এবং রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দেহকোষে পৌছায়। প্রতি মিলিলিটার রক্তে 0.2 মিলিলিটার O_2 পরিবাহিত হয়। রক্ত দ্বারা O_2 দুভাবে পরিবাহিত হয়, যেমন-

(i) ভৌত দ্রবণক্রপে: প্রায় 2% O_2 রক্তের প্রাজমায় দ্রবীভূত হয়ে ভৌত দ্রবণক্রপে পরিবাহিত হয়।

(ii) রাসায়নিক ঘোগক্রপে: প্রায় 98% O_2 রাসায়নিক ঘোগক্রপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। ফুসফুসের অ্যাজিভিলেট থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে O_2 কেশিকজালিকায় প্রবেশ করে। সেখানে রক্তে O_2 এর টান কর থাকায় উহা সহজেই লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন নামক অনুবন্ধ প্রোটিনের সাথে মিশে যায়। হিমোগ্লোবিনের সাথে O_2 বিক্রিয়া করে অক্সিহিমোগ্লোবিন ঘোগ গঠন করে। রক্তের pH মান বেশি থাকলে অক্সিজেনের প্রতি হিমোগ্লোবিনের আকর্ষণ বেশি থাকে। ধারণাক রক্তের সাথে অক্সিহিমোগ্লোবিন শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয় এবং যেসব কলারসে অক্সিজেনের টান কর থাকে সেসব স্থানে O_2 মুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত অক্সিজেন কলারস হতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

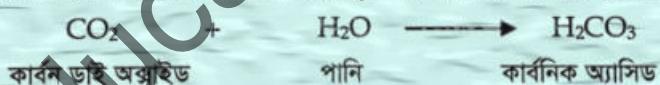
হিমোগ্লোবিন O_2 পরিবহন করে বলে এদের শ্বাসরঞ্জক (respiratory pigments) বলা হয়। আয়রন ও প্রোটিনের সমন্বয়ে হিমোগ্লোবিন গঠিত। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রক্তে গ্যাসের টানের মাত্রামূল্যায় এটি বিভিন্ন পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। অক্সিজেনের সাথে হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া উভয়মুভী।



CO_2 পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এ CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস হতে বায়ুতে মুক্ত হয়। রক্তে সাধারণত 23-29 mEq/L (milliequivalents per liter) CO_2 থাকে। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়, যেমন-

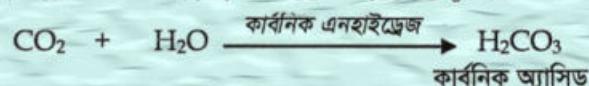
(i) ভৌত দ্রবণক্রপে: 5% CO_2 রক্তের প্রাজমায় পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিডক্রপে পরিবাহিত হয়।



(ii) কার্বামিনো ঘোগক্রপে: 10% CO_2 লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের অ্যামিন ($-\text{NH}_2$) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন ঘোগক্রপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।

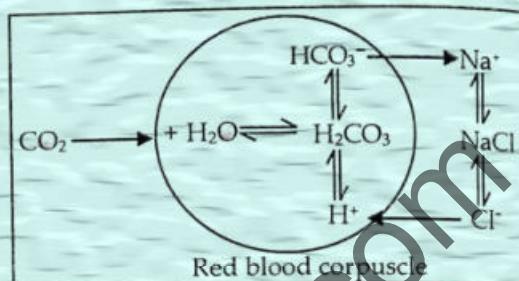
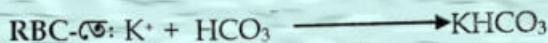


(iii) বাইকার্বনেট ঘোগক্রপে: 85% CO_2 বাইকার্বনেট ঘোগক্রপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক অ্যাসিডের অধিকাংশই ভেঙ্গে H^+ এবং HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়।



HCO_3^- লোহিত রক্তকণিকায় K^+ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে পটাসিয়াম বাইকার্বনেট (KHCO_3) গঠন করে। কিছু HCO_3^- লোহিত রক্তকণিকা থেকে বের হয়ে রক্তরসে চলে আসে এবং Na^+ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট (NaHCO_3) গঠন করে। এভাবে সৃষ্টি KHCO_3 ও NaHCO_3 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO_3^- রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা হ্যামবার্জার বিক্রিয়া (Chloride shift reaction or Hamburger's reaction) বলা হয়।

লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাইকার্বনেট আয়ন রক্তরসে প্রবেশ করার ফলে তারসাম্য রক্ষার জন্য ক্লোরাইড আয়ন রক্তরস থেকে লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে। এর ফলে রক্তের অল্কু-ফ্যার ($pH = 7.4$) ভারসাম্য বজায় থাকে।

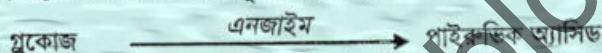


চিত্র ৫.৯ ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া

৩। কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ

কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সাধারণত শর্করা জাতীয় খাদ্যের জারণ বেশি হয়। অক্সিজেনের উপরিতে গ্লুকোজ (শর্করা) জারিত হয়ে CO_2 ও শক্তি উৎপাদন করে। এ প্রক্রিয়া নিম্নের চারটি ধাপে সংঘটিত হয়:

(i) গ্লাইকোলাইসিস: এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ তেমে দুই অণু পাইরভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। কোষের সাইটোপ্লাজমে এর বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হয়।

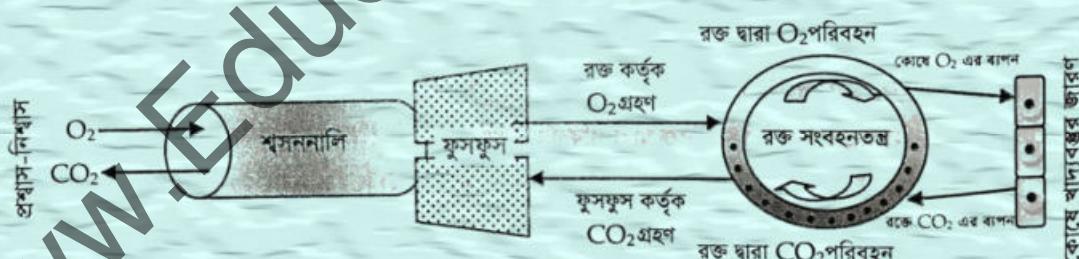


(ii) পাইরভেট অক্সিডেশন: এক্ষেত্রে পাইরভিক অ্যাসিড বেঁচে এনজাইমের সাথে সংযুক্ত হয়ে অ্যাসেটিল CoA গঠন করে। কোষের সাইটোপ্লাজমে এর বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হয়।



(iii) ক্রেবস চক্র: এ চক্রে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসেটিল CoA ও অক্সালো অ্যাসিটেট হতে ATP ও H^+ সৃষ্টি হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে বিক্রিয়াসমূহ সংযোগিত হয়।

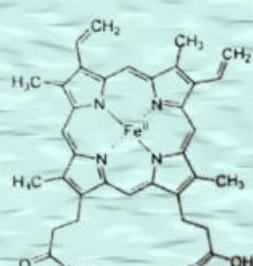
(iv) ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (ট্যাইট): এক্ষেত্রে H^+ থেকে ATP ও পানি সৃষ্টি হয়। খাদ্যবস্তু জারণের সময় প্রচুর পরিমাণে O_2 ব্যবহৃত হয় এবং CO_2 সৃষ্টি হয়।



চিত্র ৫.১০ মানব শ্বসনের সার্বিক ঘটনা

৫.৫ শ্বাস রঞ্জক

রক্তের যে অংশ দ্বারা শ্বসন গ্যাস, বিশেষ করে অক্সিজেন পরিবাহিত হয় তাকে শ্বাস রঞ্জক (respiratory pigment) বলে। প্রাণিগতের প্রধান চার ধরনের শ্বসন রঞ্জক হলো: মেরুদণ্ডীদের হিমোগ্লোবিন (hemoglobin), মৌলাঙ্কা ও আর্থোপোডদের হিমোসায়ানিন (haemocyanin), ব্রাকিওপোড ও সাইপানকুলিডদের হিমিইরিথ্রিন (haemerythrin) এবং পলিকিটদের ক্লোরোক্রুরিন (chlorocruorin)।



চিত্র ৫.১১ হিমোগ্লোবিন: গঠনিক সংকেত

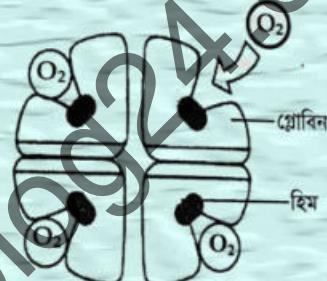
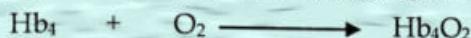
রক্তে হিম ও গ্লোবিন 1 : 25 অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। হিমের 33.33% লোহ (Fe)। হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক সংকেত হলো-
(C₇₁H₁₁₃O₂₄N₂₁₄S₂Fe)₄। এর আণবিক ওজন 64,450 ডাচ্টন। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্যই রক্ত-লাল দেখায়।
হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস অক্সিজেন পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে এটি কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন
করে।

হিমোগ্লোবিন দ্বারা O₂ পরিবহন

হিমোগ্লোবিনের প্রতিটি হিম অংশে এক অণু করে ফেরাস আয়রন (Fe⁺⁺) থাকে। এটি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে
ফেরাস অক্সাইড (FeO) গঠন করে। প্রতিটি হিমোগ্লোবিনে চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু অক্সিজেন
যুক্ত করতে পারে। সাধারণভাবে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযুক্তিকে নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয়-



কিন্তু যেহেতু হিমোগ্লোবিনে চারটি হিম অংশ থাকে সেহেতু
একে Hb₄ লেখাই যুক্তিসঙ্গত এবং প্রকৃতপক্ষে নিম্ন উপায়ে এটি
চার অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে Hb₄O₈ গঠন করে :



চিত্র ৫.১২ হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবর্ধন

এ বিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় এবং এতে 0.01 সেকেন্ডের কম সময় লাগে। তাপমাত্রা, pH ও লোহিত
রক্তকণিকার ডাইফসফোগ্লিসারেট এ বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

হিমোগ্লোবিন দ্বারা CO₂ পরিবহন

10% CO₂ লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের আমিন (-NH₂) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো-
হিমোগ্লোবিন ঘোগ্নুপে রক্ত দ্বারা পরিবহিত হয়।



৫.৪ শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার

ফুসফুস, শ্বাসনালি, গলা বা সাইনাসের যেকোন ধরনের সংক্রমণকে শ্বসননালির সংক্রমণ (Respiratory tract infections-RTI) বলে। সাধারণত ভাইরাসের কারণে এ ধরনের সংক্রমণ ঘটলেও অনেকস্থেতে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ সংক্রমণ ঘটতে
পারে। সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা সবচেয়ে বড় ধরণের RTI জটিলতা। শ্বসননালির সংক্রমণ ব্যক্ত মানুষ অপেক্ষা শিশুদের বেশ হয়
ক্রিয়া তাদের অন্তর্ক্রম্যত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয় না। চিকিৎসকগণ RTI কে দুভাবে চিহ্নিত করেছেন, যথা-

■ উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ: এতে নাক, কান, সাইনাস ও গলা আক্রান্ত হয়। সাধারণ ঠাণ্ডা, টনসিলাইটিস (টনসিলের
সংক্রমণ), সাইনুসাইটিস (সাইনাসের সংক্রমণ), ল্যারিনজাইটিস (প্রয়ান্ত্রের সংক্রমণ), ওটিডিস মিডিয়া (কানের সংক্রমণ)
ইত্যাদি উর্ধ্ব শ্বসন নালির সংক্রমণ। এ ধরনের সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো কাশি। এছাড়া মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি ঝরা,
গলাব্যথা, হাঁচি ও পেশির ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

■ নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ-এতে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়। ফু (শ্বাসনালির সংক্রমণ), ব্রাইটিস (শ্বাসনালির
সংক্রমণ), নিউমোনিয়া (ফুসফুসের সংক্রমণ), যক্ষা বা টিউবারকুলোসিস (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ) ইত্যাদি
নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ। উর্ধ্ব শ্বসন নালির মতো এ ধরনের সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো কাশি।

নিম্নে উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ সাইনুসাইটিস ও ওটিডিস মিডিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মুখমণ্ডলের হাড়ের ভেতরে কতগুলো বায়ুপূর্ণ গহ্বর আছে যেগুলো নাসিকা গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এদের সাইনাস (sinuses) বলে মানুষের মুখমণ্ডলে চার জোড়া সাইনাস আছে। এগুলো হলো-

- ম্যাক্সিলারি সাইনাস (maxillary sinuses)- গালের উপরে অবস্থিত।
- ফ্রন্টাল সাইনাস (frontal sinuses)- কপালের সামনে অবস্থিত।
- এথময়েড সাইনাস (ethmoid sinuses)- নাকের উপরে অবস্থিত।
- ফেনয়েড সাইনাস (sphenoid sinuses)- কপালের পাশে অবস্থিত।

এসব সাইনাস মিউকাস পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং পিছিল মিউকাস সৃষ্টির মাধ্যমে নাসিকা পথকে সিক্ত ও জীবাণুমুক্ত রাখে। কোনো কারণে সাইনাসগুলোর মধ্যে ঘা বা প্রদাহ হলে তখন তাকে সাইনোসাইটিস (Sinusitis) বলে। সাইনোসাইটিস দুর্ধরনের হয়ে থাকে, যথা-

১। আকিউট সাইনোসাইটিস (acute sinusitis): সাইনোসাইটিস চার সঙ্গাহের কম সময় থাকলে তাকে আকিউট সাইনোসাইটিস (acute sinusitis) বলে। নাক দিকে পানি দ্বারা, গরম বাতাস বের হওয়া এবং মুখমণ্ডলে ব্যথা অনুভব করা আকিউট সাইনোসাইটিসের লক্ষণ।

২। ক্রনিক সাইনোসাইটিস (chronic sinusitis): সাইনোসাইটিস আট সঙ্গাহের অধিককাল থাকলে তাকে ক্রনিক সাইনোসাইটিস (chronic sinusitis) বলে।

রোগের কারণ

১। সাইনাসগুলো ভাইরাস (rhinoviruses, coronaviruses and influenza viruses), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*) বা ছচাক (*Aspergillus* and *Mucor* species) দ্বারা আক্রান্ত হলে সাইনোসাইটিস হয়।

২। নাকের এলার্জি থাকলে, নাকের হাড় বাকা থাকলে, নাকের ভেতরে বাইরের কিছু চুকলে এবং নাকের পেছনের টনসিল বড় হলে।

৩। দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে ইনফেকশন হয়।

৪। কোনো কারকণ সাইনাসের হাড় ফেটে গেলে, ময়লা পানিতে ঝাপ দিলে এ পানি নাকের ভেতর দিয়ে সাইনাসে চুকেও এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

৫। এ হাড় ও অপৃষ্ঠি, পরিবেশ দৃশ্য ও ঠাণ্ডা স্যান্তস্যাতে পরিবেশের কারণে এরোগ হয়।

৬। বেশির মানুষ সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) রোগে আক্রান্ত হয় তাদেরও সাইনোসাইটিস হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

১। নাকে সর্দি হওয়া বা নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া; বিশেষত ঠাণ্ডায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাত দিনের বেশি সময়ে সেবে না ওঠা।

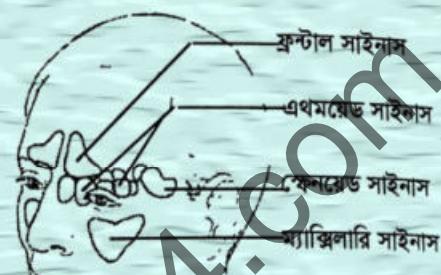
২। কপালে কিংবা চোখে বা চোখের চারপাশ জুড়ে চাপ বা বন্ধনা কিংবা ব্যথা অনুভব করা। সকালে এ ব্যথা কম থাকে, দুপুরের দিকে ব্যথার তাৎক্ষণ্য বৃদ্ধি দেখা আবাব বিকালের দিকে সামান্য কমে যায়।

৩। মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাটি.ল বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।

৪। জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কানে কিছু শব্দই ভালো লাগে না এবং অল্পতেই ক্রান্ত হয়ে যায়।

৫। নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়, পরীক্ষা করলে নাকের ভেতর পুঁজ পাওয়া যেতে পারে।

৬। সাইনাসের এক্সবে ক্ষণে ২-৩০-২৫ মালাতে দেখায়।



চিত্র ৫.১৩ মানুষের বিভিন্ন ধরনের সাইনাস

সাইনেসাইটিসের জটিলতা

সাইনেসাইটিসের চোখ ও মন্ডিকের পাশে থাকে বলে সাইনাসের ইনফেকশন হলে তা চোখ এবং মন্ডিকের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। সাইনেসাইটিসের কারণে চোখের ভেতরে ইনফেকশন তুকে চোখ নষ্ট করে দিতে পারে, আবার মাথার ভেতর ইনফেকশন তুকে মেনিনজাইটিস এমনকি ব্রেইন অ্যাবসেসের মতো মারাত্মক জটিল রোগের জন্ম দিতে পারে।

প্রতিকরণ

- ১। সাইনেসাইটিসের কারণে মাথাব্যথা হয়েছে বলে মনে হলে যতদ্রুত স্বত্ব একজন নাক, কান, গলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
- ২। প্রাথমিক পর্যায়ে এরোগের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামিন, শাকের ড্রপ এবং ব্যাথানশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
- ৩। যদি ওষুধপত্রে এরোগ নিরাময় না হয় তবে সাইনাসের ওয়াশ বা অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে।
- ৪। প্রতিদিন আট থেকে দশ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।
- ৫। জমাটিবন্ধ সাইনাসের কষ্ট থেকে স্বচ্ছ পেতে মেনথল যুক্ত বাচ্পের সামনে নাক নিয়ে শসন নেয়া যেতে পারে।
- ৬। নাকে লবণাক্ত পানি ছিটকে দিয়ে ধূয়ে নিলে মিউকাস ও ব্যাকটেরিয়া ধূয়ে যাবে।

২। ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media)

মধ্যকর্ণের সংক্রমণকে ওটিটিস মিডিয়া (otitis media/acute otitis media-AOM) বা মধ্যকর্ণের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বলে। কানের পর্দা ও অস্তকর্ণের মাঝে বিদ্যমান ইউস্টেশিয়ান নালিতে (eustachian tube) ওটিটিস মিডিয়া হয়। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এরোগে বেশি আক্রমিত হয়। এরোগের কারণে সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী কানে না শোনা কিংবা কানের পর্দা ফুটো হয়ে যেতে পারে।

রোগের কারণ

১। প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা জ্বরকের সংক্রমণে এরোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV) এবং *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়া অধিক সংক্রমণ ঘটায়।

২। মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগগুলি (eustachian tubes) ফুলে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে।

৩। অ্যাডিনলয়েড (adenoids) ফুলে গেলে।

৪। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

ওটিটিস মিডিয়া কানের বেশি হয়

যাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো:

১। চার মাস থেকে চার বছর বয়সী শিশুদের।

২। তেক্ষণে সেন্টারালগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।

৩। সেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুয়িয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।

৪। যেসব শিশুরা ধূমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।

৫। পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।



চিত্র ৫.১৪ মধ্যকর্ণ

শিশুদের ক্ষেত্রে: কানে ব্যথা হয়, কান টানতে থাকে, শিশু স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি কান্না করে, ঘুমাতে অসুবিধা হয়, শিশু বা আওয়াজে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, বিরক্ত করে, 38° সে. এর উপর জ্বর থাকে, কান থেকে তরল নিঃসৃত হয় এবং মাথা ব্যথা হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে: কানে ব্যথা হয়, 38° সে. এর উপর জ্বর থাকে, কান বন্ধ হয়ে যায়, মাথা বিম বিম করে এবং সাময়িকভাবে কানে কম শুনা যায়।

জটিলতা: কানের সংক্রমণজনিত জটিলতা খুব কম। তবে সংক্রমণ বেশি হলে প্রধান দু ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন-

- **ম্যাস্টোডাইটিস (Mastoiditis):** সংক্রমণ কানের নিচে বিদ্যমান ম্যাস্টয়ড অস্থিতে প্রসারিত হয় তাকে ম্যাস্টোডাইটিস বলে।

- **মেনিনজাইটিস (Meningitis):** সংক্রমণ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণ মেনিনজেসে প্রসারিত হয় তাকে মেনিনজাইটিস বলে।

প্রতিকার

অধিকাংশক্ষেত্রে কানের সংক্রমণ কিছুদিনের মধ্যে নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

১। উপরোক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলো যদি একদিনের বেশি দ্রাঘী হয় তাহলে ডাঙ্গারের পরামর্শ নিতে হবে।

২। ডাঙ্গারের পরামর্শ অনুযায়ী ওযুধ সেবন, কানে ঝুঁপ দেয়া, কানের অপারেশন করা।

৩। সংক্রমিত কানে নরম, উষ্ণ কাপড় দিয়ে চাপ দেয়া।

৪। ব্যথা বেশি হলে শিশুকে হালকা কাজ যেমন- জোড়ে বই পড়া, খেলাধুলা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা।

প্রতিরোধ

১। অসুস্থ শিশুদের থেকে নিজের বাচ্চাকে দূরে রাখতে হবে।

২। শিশুদের ধোয়ামুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে।

৩। অস্তত ছয় মাস বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

৪। বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চাকে একটি উচু করে ধরতে হবে।

৫। বাচ্চাকে নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিসের টিকা দিতে হবে।

৬। কানে যাতে পানি না ঢোকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

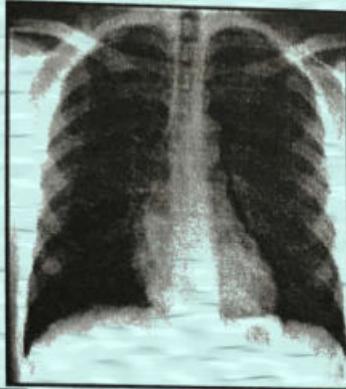
৫.৫ ফুসফুসের X-রে চিত্রের তুলনা

(Comparision of X-ray of smoker's and nonsmoker's lung)

এক্স-রে চিত্রের মাধ্যমে দ্রুমপায়ী এবং অদ্রুমপায়ী মানুষের ফুসফুসের মধ্যে পার্থক্য নিপত্ত করা যায়। যেমন-

বৈশিষ্ট্য	অদ্রুমপায়ীর ফুসফুস	দ্রুমপায়ীর ফুসফুস
১। সাদা-কালো দাগ:	ফুসফুসের X-রে চিত্রের কালো দাগ ও সাদা দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদন দেখা যায়।	ফুসফুসে কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়।
২। প্রাচীর:	ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর X-রে চিত্রে স্থানাধিক ও সবল দেখায়।	ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর পাতলা ও দুর্বল হয়ে যায় যা X-রে চিত্রে পরিলক্ষিত হয়।
৩। এমফাইসিমা:	ফুসফুসে X-রে চিত্রে এমফাইসিমার চিহ্ন দেখা যায় না।	ফুসফুসের X-রে চিত্রে এমফাইসিমার চিহ্ন দেখা যায়।
৪। টিউমার:	ফুসফুসের X-রে চিত্রে কোনো টিউমার উপর্যুক্তির চিহ্ন দেখা যায়।	ফুসফুসের X-রে চিত্রে অনেকসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপর্যুক্তির চিহ্ন দেখা যায়।
৫। স্বচ্ছতা	ফুসফুসের X-রে চিত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়।	ফুসফুসের X-রে চিত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।
৬। সিলিয়া:	ফুসফুসের X-র চিত্রে আলভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো স্থানাধিক অবস্থায় দেখা যায়।	ফুসফুসের X-র চিত্রে আলভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো বিনষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।
৭। ক্যাপ্সার কোষ:	ফুসফুসের X-র চিত্রে কোন ক্যাপ্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।	ফুসফুসের X-র চিত্রে অনেকসময় ক্যাপ্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায়।

নিচে এ ধরনের দুটি ফুসফুসে X-রে চিত্র দেয়া হলো:



ক



খ

চিত্র ৫. ১৫ (ক) অধূমপায়ীর ফুসফুস (খ) ধূমপায়ীর ফুসফুস-এর X-রে

ধূমপান মানব শাস্ত্রের জন্য অভ্যন্তর ক্ষতিকর

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিংশ শতাব্দীতে তামাক ব্যাধিতে সারাবিশ্বে প্রায় 10 কোটি লোক মারা গেছে। বিশ্বে আনুমানিক 125 কোটি লোক ধূমপায়ী। ধূমপানের কোনো উপকার নেই অথচ বিশ্বে ধূমপানের পিছনে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে যা দিয়ে কয়েক লক্ষ বৃহৎকু মানুষের অন্নসংস্থান হতো। ধূমপানে সৃষ্টি হোম্যোতে প্রায় 500 ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এতে প্রধান যেসব ক্ষতিকর উপাদান থাকে সেগুলো হলো নিকোটিন, টার ও কার্বন মনোক্সাইড। এগুলো প্রধানত মানুষের শ্বসন অঙ্গে জাতিলতাসহ অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন-

১। সিগারেটের ধোয়ায় বিদ্যমান বিষাক্ত নিকোটিন ও টার ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে, কার্বন মনোক্সাইড শ্বাসনালিতে ব্রষ্টাইটিস (bronchitis) সৃষ্টি করে।

২। ধূমপানের ধোয়া ফুসফুসের আলভিওলাসের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে অ্যালভিওলাসের আয়তন বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থানে ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে। ফলে শ্বসনতল কমে গিয়ে গ্যাস বিনিময়ে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে এমফাইসিমা (emphysema) বলে।

৩। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের O_2 পরিবহন ক্ষমতাহারণ করে এবং ধমনি গাত্রে কোলেস্টেরল জমতে সাহায্য করে। এতে উচ্চ রক্তচাপসহ স্ট্রোক (stroke) করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

৪। নিয়মিত ধূমপান গলাবিল ও অন্ননালিতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। মুখ, গলা ও খাদ্যনালিতে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি ধূমপায়ীর জন্য অধূমপায়ীর চেয়ে 5-10 গুণ বেশি।

৫। ধূমপায়ী মাল্লাদের বক্স হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৬। ধূমপান পরিবেশ দূষণ ঘটায় এবং অধূমপায়ীদের শ্বাস গ্রহণে ব্যাধাত সৃষ্টি করে।

ধূমপান ছাড়ার কয়েকটি উপায়

বিশ্বে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ ধূমপান ছাড়তে চাইলেও শ্বেষমেষ বেশিরভাগ মানুষই ব্যর্থ হয়। আর এ অন্যতম কারণ হলো মানসিক দৃঢ়তার অভাব। অনেক চেষ্টা করেও যখন ধূমপান ছাড়া সম্ভব হয় না, তখন মানসিক যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে পড়ে অনেকে। যারা অনেক চেষ্টা করেও ধূমপান ছাড়তে পারে না তাদের জন্য কয়েকটি উপায় বের করেছেন বিশেজ্জরা। এসব পথ অনুসরণ করলে আর মানসিক দৃঢ়তা থাকলেই হয়তো ধূমপান ত্যাগ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে ধূমপায়ীদের জন্য।

১। পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থন: ধূমপান থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহ প্রয়োজন। এতে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে।

২। ব্যায়াম: নিয়মিত ব্যায়াম পারে মানসিক চাপ কমাতে আর ধূমপান ছাড়ার ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তার বিরক্তে লড়তে।

৩) এভাবে দুবার করার পর ঐ ব্যক্তির বুকের ওপর এক হাতের ওপর অন্য হাত রেখে দু হাতের সাহায্যে চাপ দিতে হবে। এতে হৃৎপিণ্ডের অঙ্গিজেনমুক্ত রক্ত দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রবাহিত হবে।

৪) এভাবে 15 বার চাপ দেয়ার পর আবারো দুবার মুখে মুখ লাগিয়ে ফুসফুসে বাতাস ভরে দিতে হবে।

৫) রোগীর বুকের দিকে লাঙ্ক রাখতে হবে। বুক উঠানামা করতে শুরু করলে মুখ বাতাস প্রবশ করানো বন্ধ করে দিতে হবে। তা নাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসক, অঙ্গিজেন নল, অঙ্গিজেন ব্যাগ, সিলিংডার ও অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে সিপিআর চালিয়ে যেতে হবে।

সারসংক্ষেপ

■ **শ্বসন:** যে প্রক্রিয়ায় প্রাণী বায়ু হতে অঙ্গিজেন গ্রহণ করে সেই অঙ্গিজেনের (O_2) সাহায্যে কোষাহৃত সরল খাদ্যকে জারিত করে খাদ্যস্থিত স্থিতিশাস্ত্রিকে গতিশক্তিতে রূপান্তর করে এবং এতে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডকে (CO_2) দেহ হতে বহিকার করে তাকে শ্বসন বলে। যে তত্ত্ব দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিয়য় প্রক্রিয়ায় সজ্ঞিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সে তত্ত্বকে শ্বসনতত্ত্ব বলে।

■ **ব্রাক্ষিয়াল বৃক্ষ:** প্রাইমারি ব্রাক্ষাস থেকে শুরু করে আলভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র দেখতে অনেকটা বৃক্ষের মতো বলে একে শ্বসন বৃক্ষ বা ব্রাক্ষিয়াল বৃক্ষ বলে।

■ **অ্যালভিওলাস:** ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক হলো অ্যালভিওলা। প্রতিটি অ্যালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদ্বুদ সদৃশ বায়ুকুণ্ঠী বিশেষ।

■ **শ্বাসক্রিয়া:** যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অঙ্গিজেন সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে শ্বাসক্রিয়া বলে।

■ **ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া:** লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO_3^- রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা আম্বুজার বিক্রিয়া বলা হয়।

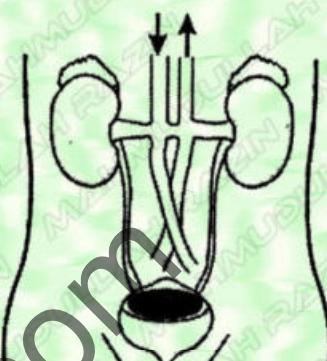
■ **সাইনোসাইটিস:** কোনো কারণে যদি শ্বসনতত্ত্বে বিদ্যমান সাইনাসগুলোর মধ্যে ঘা বা প্রদাহ হয় তখন তাকে সাইনোসাইটিস বলে। সাইনাসগুলো ভাইরাস, র্যাকটেরিয়া বা ছাঁচাক দ্বারা আক্রান্ত হলে সাইনোসাইটিস হতে পারে।

■ **ওটিটিস মিডিয়া:** মধ্যকর্ণের সংক্রমণকে ওটিটিস মিডিয়া বা মধ্যকর্ণের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বলে। কানের পর্দা ও অন্তকর্ণের মাঝে বিদ্যমান ইউস্টেশনিয়ান নালিতে ওটিটিস মিডিয়া হয়।

- মানব ফুসফুসে বিদ্যমান সকল কৈশিক নালিকাকে পরম্পর সংযুক্ত করলে এর মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় 1600 কিলোমিটার। এতে বিদ্যমান সকল অ্যালভিওলাসের শ্বসনতত্ত্বের মোট আয়তন একটি টেনিস কোর্টের সমান বা 525 বর্গফুট বা 11,800 বর্গ সেমিমিটার।
- একজন সুস্থ মানুষ প্রতি মিনিটে 16 বার, প্রতি ঘণ্টায় 960 বার, প্রতিদিন 23040 বার, প্রতি বছর 8.4 মিলিয়ন বার এবং 80 বছর বয়সের জীবনে মোট 672,768 মিলিয়ন বার শ্বাস গ্রহণ করে।
- থাচ (sneeze) শ্বসনতত্ত্বের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিবর্তি ক্রিয়া যা নাসিকার মিউকাস পর্দা থেকে কোনো প্রদাহিক বন্ধকে প্রাপ্তকার করে। সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত থাচের গতি 165 কিলোমিটার/ঘণ্টা।
- মন্তিক দ্বারা ফুসফুসে নিম্নমাত্রার অঙ্গিজেন নির্ণীত হলে দেহ এতে সাড়া দিয়ে হাইম তোলে (Yawning) যার ফলে অধিক পরিমাণ অঙ্গিজেন গৃহীত হয়।
- আজ্ঞমা বা হাঁপানি একটি শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগ যা শ্বাসনালির অতিসংবেদনশীলতার (Hypersensitivity) কারণে হয়ে থাকে। প্রদাহজনিত কারণে শ্বাসনালির স্বাভাবিক ব্যাস করে গিয়ে সরল হয়ে যায় ফলে ফুসফুসে পর্যন্ত বাতাস যাতায়ত করতে পারে না এবং দেহ অঙ্গিজেনের অভাব অনুভব করতে শুরু করে।
- কমন কোভ বা ঠাণ্ডা লাগা শ্বসনতত্ত্বের সংক্রমণজনিত একটি রোগ যা 200 ধরনের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়।
- নিউমোনিয়া (Pneumonia) ফুসফুসের প্যারেনকাইমার প্রদাহজনিত একটি রোগ যা সাধারণত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়।

মানব শারীরতত্ত্ব: বর্জ্য ও নিষ্কাশন

আমরা প্রতিদিন কিছু না কিছু মাছ, মাংস, ডাল, দুধ, ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকি। এসব খাদ্য দেহের বৃক্ষি ও ক্ষয়পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। সকল ধরনের আমিষ খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এদের অধিকাংশই দেহের বৃক্ষি ও ক্ষয়পূরণে অংশগ্রহণ করে। সামান্য কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় কিছু নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয় যা দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের রেচনতত্ত্ব এসব ক্ষতিকর পদার্থ দেহ হতে বের করে দেয়। এ অধ্যায়ে মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গের গঠন, কাজ ও জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



প্রধান শব্দাবলি (Key words): রেচন, মূত্র, বৃক্ষ, নেফ্রন, ম্যালপিজিয়ান বডি, বোম্যানস ক্যাপস্যুল, গ্লোমেরুলাস, হেনলির লুপ, নিবাচিত পুনঃশোষণ, ইউরিয়া, অরনিথিন চক্র, রেনাল ফেইলিউর।

পি঱িয়ড সংখ্যা ৬। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল) -

- বৃক্ষের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
- রেচনের শারীরবৃত্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানব শরীরে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্ষের কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- বৃক্ষের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ ও ঐ মূহূর্তে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- **ব্যবহারিক:** বৃক্ষের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।

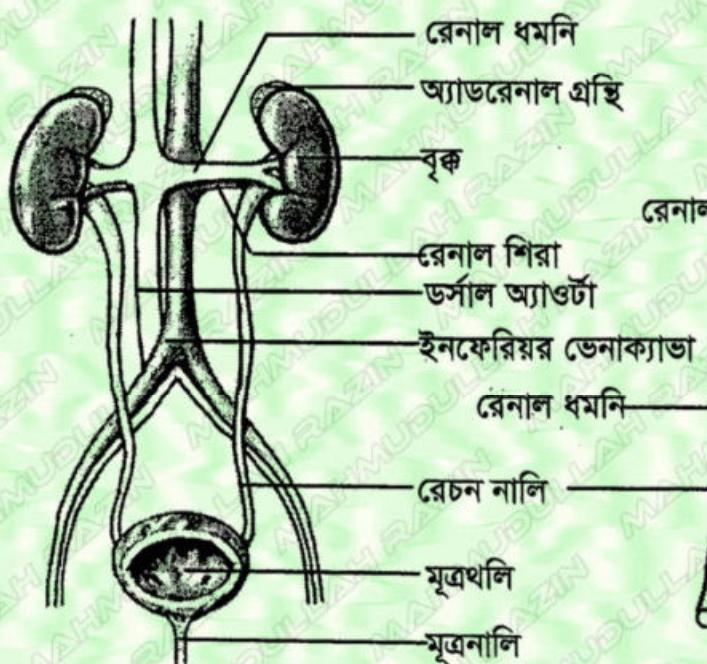
জীবদেহ হতে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ বা বিষাক্ত ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অপসারণকে রেচন বলে। প্রকৃতপক্ষে যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া দেহ হতে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে সৃষ্টি নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) বলে। মানুষের প্রধান রেচন বৃক্ষের নাম হলো মূত্র (urine)। বৃক্ষ মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো তুক, ফুসফুস ও পরিপাকনালি কিছু কিছু রেচনবর্জ্য দেহ হতে নিষ্কাশন করে। যে তন্ত্র দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে রেচনতত্ত্ব (excretory system) বলে। বৃক্ষ মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো তুক, ফুসফুস, যকৃত ও পরিপাকনালি দ্বারা কিছু রেচন বর্জ্য দেহ থেকে বহিস্থিত হয়। মানুষের রেচনতত্ত্ব নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

- ১। একজোড়া বৃক্ষ (Kidneys): এতে মূত্র তৈরি হয়;
- ২। একজোড়া রেচননালি (Ureters): বৃক্ষ থেকে মূত্রকে পরিবহন করে মূত্রথলিতে পাঠায়;
- ৩। একটি মূত্রথলি (Urinary bladder): মূত্রকে সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং
- ৪। একটি মূত্রনালি (Urethra): মূত্রথলি থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিষ্কেপ করে।

১.১ বৃক্ষের গঠন ও কাজ (Structure and Functions of Kidney)

মানুষের উদর গহ্বরের পশ্চাত প্রাচীর সংলগ্ন মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি বৃক্ষ বিদ্যমান। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে একটি অপ্রতিসাম্যতার সৃষ্টি হওয়ায় বাম বৃক্ষটি ডান বৃক্ষ থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্ষের উর্ধ্ব অংশ 11তম ও 12তম পর্শুকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। প্রতিটি বৃক্ষ খয়েরী-লাল বর্ণের এবং শিমবীজ আকৃতির। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিটি বৃক্ষের ওজন 125- 170 গ্রাম এবং মহিলার বৃক্ষের ওজন 115-155 গ্রাম। সাধারণত বাম বৃক্ষ ডান বৃক্ষ হতে কিছুটা বড়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিটি বৃক্ষের দৈর্ঘ্য 11-12 সেন্টিমিটার, প্রস্থ 5-6 সেন্টিমিটার, পুরুষ প্রায় 3 সেন্টিমিটার। বৃক্ষের বাইরের দিক উভল এবং ভেতরের দিক অবতল। এর অবতল অংশে একটি খাঁজ থাকে, একে হাইলাস (hilus) বলে। এ হাইলাসের মধ্য দিয়ে রেনাল ধমনি ও স্নায়ুরজ্জু বৃক্ষে প্রবেশ করে এবং রেচননালি ও রেনাল শিরা বৃক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। বৃক্ষের অগ্রপাত্তে অ্যাডৱেনাল গ্রহণ মতো আচ্ছাদন করে অবস্থান করে। সমগ্র বৃক্ষ যোজক কলা গঠিত

রেনাল ক্যাপস্যুল বা টিউনিকা ফাইব্রোসা (renal capsule/tunica fibrosa) আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। রেনাল ক্যাপস্যুলের বাইরে একটি চর্বিযুক্ত আবরণ থাকে যা বৃক্ককে যে কোনো ঘর্ষণ হতে রক্ষা করে।



চিত্র ৬. ১ মানুষের রেচনতত্ত্ব



চিত্র ৬. ২ মানব বৃক্কের লম্বচেদ।

বৃক্কের লম্বচেদে খালি চোখে সুস্পষ্ট দুটি অংশ দেখা যায়। বাইরের দিকের রেনাল ক্যাপস্যুল সংলগ্ন অংশকে রেনাল কর্টেক্স (renal cortex) এবং ভেতরের দিকের কেন্দ্রীয় অংশকে রেনাল মেডুলা (renal medulla) বলে। বৃক্কের কর্টেক্স অংশ দ্বিষৎ বাদামী বর্ণের। এখানে বৃক্কের কার্যকরি একক নেফ্রনের রেনাল করপাসল, প্রক্রিয়াল প্যাচানো নালিকা এবং ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে। বৃক্কের মেডুলা অংশ গাঢ় বাদামী বা দ্বিষৎ কালচে বর্ণের হয়। মেডুলা অংশ মূলত নেফ্রনের হেনলির লুপ, সংগ্রাহক নালিকা এবং রক্তজালিকা নিয়ে গঠিত। এখানে ত্রিভুজাকৃতির কয়েকটি (8-18টি) গঠন দেখা যায়। এদের রেনাল পিরামিড (renal pyramids) বলে। রেনাল পিরামিডের ফাঁকে ফাঁকে কর্টেক্সের যে অংশ বিস্তৃত থাকে তাকে রেনাল কলাম (renal column) বলে। রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে রেনাল প্যাপিলা (renal papilla) বলে। এটি ক্রমশ সরু হয়ে নালিকাকার ধারণ করে। এ নালিকাকে ক্যালিক্স মাইনর (calyx minor) বলে। কয়েকটি ক্যালিক্স মাইনর যুক্ত হয়ে ক্যালিক্স মেজর (calyx major) গঠন করে। এগুলো রেচননালির উর্ধ্ব প্রান্তের স্ফীত অংশ রেনাল পেলভিসের (renal pelvis) সাথে সংযুক্ত থাকে। একজোড়া রেনাল ধমনির মাধ্যমে বৃক্ক রক্ত গ্রহণ করে এবং একজোড়া রেনাল শিরার মাধ্যমে বৃক্ক হতে রক্ত বের হয়ে যায়।

বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন (Ultrastructure of Kidney)

বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন (Nephron) বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় 10-12 লক্ষ নেফ্রন থাকে। প্রকৃতপক্ষে বৃক্কের কার্যাবলি মানেই হলো সকল নেফ্রনের কাজের সমষ্টি। মৃত সৃষ্টির প্রক্রিয়া মূলত নেফ্রনেই সংঘটিত হয়। প্রতিটি নেফ্রন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা -

- (ক) রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি এবং
- (খ) রেনাল টিউব্যুলস বা বৃক্কীয় নালিকা।

(ক) রেনাল করপাসল (Renal corpuscle): বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত 0.2 মিলিমিটার ব্যাসের গোলাকার অংশকে রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি (Malpighian body) বলে। এটি নেফ্রনের সম্মুখের অংশ। এটি বাতি বা পেয়ালা আকৃতির বোম্যানস ক্যাপস্যুল (Bowman's capsule) এবং জটিল গ্লোমেরুলাস (glomerulus) নিয়ে গঠিত। বোম্যানস ক্যাপস্যুলের প্রাচীর দ্বিতীয় এপিথেলিয়াম দ্বারা গঠিত। এর অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্টি একটি ক্ষুদ্র অন্তর্বাহী ধমনিকা (afferent arteriole) বোম্যানস ক্যাপস্যুলে প্রবেশ করে এবং 50-60টি কৈশিকজালিকায়

বিভক্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন করে। ক্যাপস্যুল প্রাচীরের গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন পড়োসাইট কোষযুক্ত (podocytes cell) অস্তিত্বকে ডিসেরাল স্তর এবং আইশাকার এপিথেলিয়াল কোষযুক্ত বহিস্তরকে প্যারাইটাল স্তর বলে।

কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে বহির্বাহী ধমনিকা (efferent arteriole) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপস্যুল থেকে বের হয়ে রেনাল টিউবুলস-এর চারদিকে সৃষ্টি কৈশিকজালিকা গঠন করে। বহির্বাহী ধমনিকার ব্যাস অন্তর্বাহী ধমনিকার চেয়ে কম হয়, ফলে গ্লোমেরুলাসে সর্বদা উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।

কাজ: রেনাল করপাসলে রক্তের অতিসৃষ্টি ছাঁকন (ultrafiltration) ঘটে এবং রক্ত হতে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্তুত হয়ে গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেট (glomerular filtrate) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপস্যুলে জমা হয়।

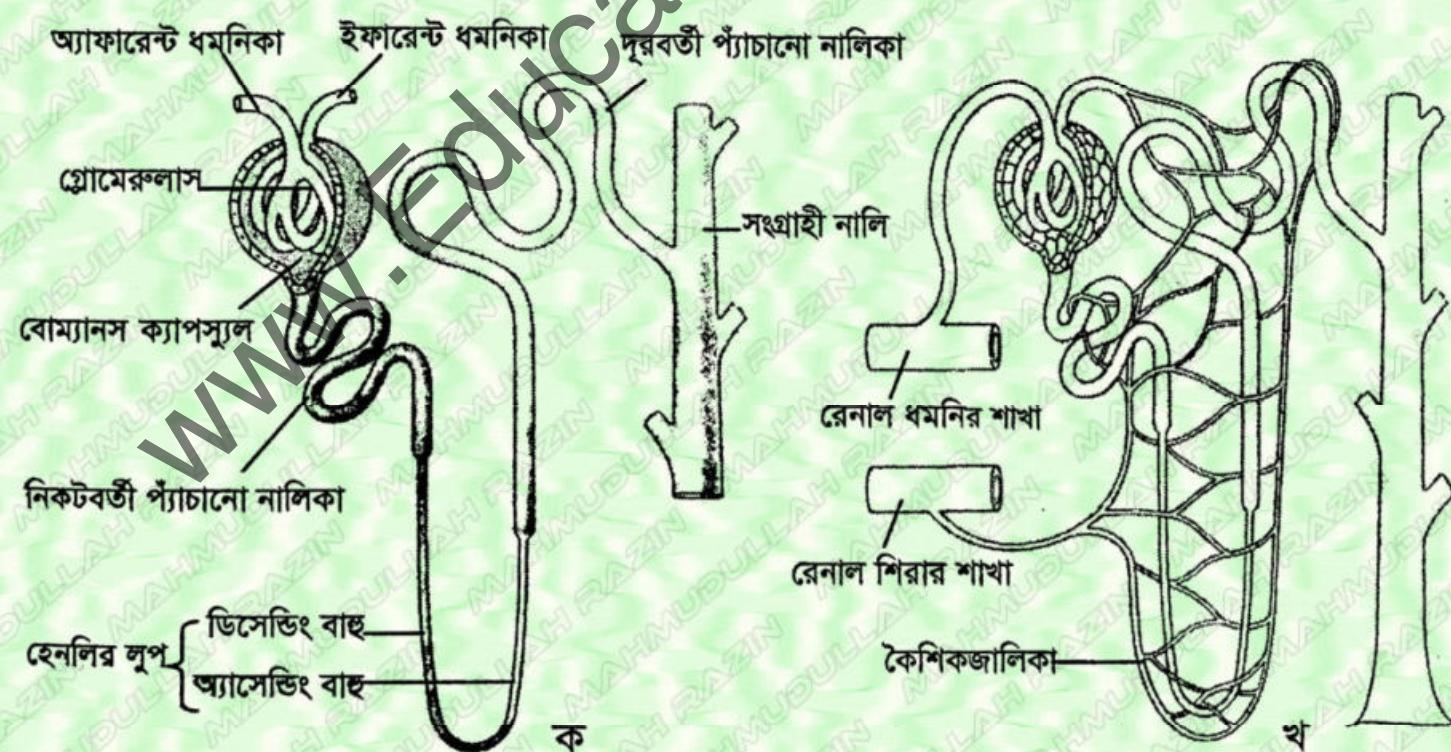


চিত্র ৬.৩ একটি রেনাল করপাসল

(খ) রেনাল টিউবুলস (Renal tubules): এটি নেফ্রনের পশ্চাত অংশ। এটি বোম্যানস ক্যাপস্যুলের পেছন হতে সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। প্রতিটি রেনাল টিউবুলস প্রায় 3 সেন্টিমিটার লম্বা এবং গড় ব্যাস প্রায় 60 মাইক্রোমিটার। রেনাল টিউবুলস তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-

- ১। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule),
- ২। নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ (Nephron loop or Loop of Henle),
- ৩। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা (Distal convoluted tubule) এবং

১। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকা: বোম্যানস ক্যাপস্যুলের সাথে সংযুক্ত প্রায় 14 মিলিমিটার দীর্ঘ প্যাচানো নালিকাকে নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকা বলে। রেনাল টিউবুলসের এ অংশ বৃক্কের কর্তৃত্বে অবস্থিত। এর প্রাচীর একত্রী এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য মাইক্রোভিলাই থাকে।



চিত্র ৬.৪ একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ (ক) কৈশিক জালিকাবিহীন (খ) কৈশিক জালিকাযুক্ত

২। নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ: নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং প্রায় 11 মিলিমিটার দীর্ঘ একটি U আকৃতির ফাঁস বা লুপ গঠন করে পুনরায় কর্তৃত্বে অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র-২৪

জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-র নামানুসারে একে হেনলির লুপ (Loop of Henle) বলা হয়। এর নিম্নমুখী নালিকে ডিসেন্টিং বাহু (descending limb) এবং উর্ধমুখী নালিকে অ্যাসেন্টিং বাহু (ascending limb) বলে।

৩। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা: এটি রেনাল টিউব্যুলস-এর শেষ অংশ। হেনলির লুপ-এর পরবর্তী এ প্যাচানো নালিকা প্রায় 5 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং এটি বৃক্কের কর্তেক্সে অবস্থান করে। এর শেষপ্রান্ত সংগ্রাহী নালিকার সাথে যুক্ত থাকে। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত।

কাজ: রেনাল টিউব্যুলস-এর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নালিকা সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা বা পেরিটিউব্যুলস ক্যাপিলারি (peritubules capillaries) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ হতে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় নিবাচিত পুনঃশোষণ (selective reabsorption) ঘটে। এর হেনলির লুপ হতে পানি এবং দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা হতে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

নেফ্রনের দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে সংগ্রাহী নালি বলে। একটি সংগ্রাহী নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্তেক্সে এবং কিছু অংশ মেডুলাতে অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী কোষ দ্বারা গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে ডাক্ট অব বেলিনি (Duct of Belini) নামের সাধারণ নালি গঠন করে যা রেচন নালির মাধ্যমে বৃক্ক থেকে বের হয়ে যায়।

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের কাজ

নেফ্রনের অংশ	কাজ
১। রেনাল করপাসল	রক্তের আন্তাফিল্ট্রেশন ঘটে। রক্ত হতে প্রতি মিনিটে 125 মিলিলিটার রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রূত হয়ে প্লোমেরলসারস ফিল্ট্রেট হিসেবে বোম্যানস ক্যাপস্যুলে জমা হয়।
২। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকা	ফিল্ট্রেশন : Na^+ , Cl^- , H_2O পুনঃশোষণ: HCO_3^- , K^+ , glucose, HPO_4^{2-} , amino acid, uric acid, urea. ক্ষরণ : Organic acid, base, H^+ , NH_4^+
৩। হেনলির লুপ	পুনঃশোষণ : H_2O , Na^+ , Cl^- , K^+ , Ca^{++}
৪। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা	ক্ষরণ : Na^+ , Cl^- , (HCO_3^-) , (K^+) , H_2O , H^+ , NH_4^+ , K^+ .
৫। সংগ্রাহী নালি	পুনঃশোষণ : Na^+ , Cl^- , H_2O , (K^+) , urea ক্ষরণ : H^+ , NH_4^+ , (K^+)

নেফ্রনের প্রকার

বৃক্কের কর্তেক্সে নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান বডি বা রেনাল করপাসলের অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষের নেফ্রন তিনি প্রকার, যথা-

১। সুপারফিসিয়াল কর্টিকেল নেফ্রন (Superficial cortical nephrons): এদের করপাসল বৃক্কের কর্তেক্সের বহির্জাগারে এক মিলিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। বৃক্কের 85% নেফ্রনই এ প্রকৃতির। এদের হেনলির লুপ খাটো।

২। মিড কর্টিকেল নেফ্রন (Midcortical nephrons): এদের রেনাল করপাসল কর্তেক্সের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। এদের লুপ খাটো বা লম্বা হয়ে থাকে। বৃক্কের মাত্র 5% নেফ্রন এ প্রকৃতির।

৩। জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন (Juxtamedullary nephrons): এদের রেনাল করপাসল কর্তেক্সের গভীরে কর্টেক্স-মেডুলার সংযোগস্থলের ওপরে অবস্থান করে। এদের হেনলির লুপ অনেক লম্বা। বৃক্কের মাত্র 10% নেফ্রন এ প্রকৃতির।

বৃক্কের কাজ

মূত্র উৎপাদন বৃক্কের প্রধান কাজ হলেও এটি আরো অনেকগুলো কার্য সম্পাদন করে এবং দেহতরলের সাম্যাবস্থা বজার রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে বৃক্কের বিভিন্ন কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো:

১। রেচন বর্জ্য অপসারণ: বৃক্ক দেহ হতে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীর বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে।

২। বিষ ও অন্যান্য বস্তু অপসারণ: বৃক্ক হতে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ওষুধ ও হরমোন বহিস্থৃত হয়; বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো অ্যাসিড অপসারিত হয়।

৩। দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা: বৃক্ষ রক্তের প্লাজমার পানি সুরক্ষার মাধ্যমে দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা করে।

৪। অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ: বৃক্ষ রক্ত ও কোষ-কলার অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। আয়ন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: বৃক্ষ দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ইত্যাদির আয়নমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। pH নিয়ন্ত্রণ: বৃক্ষ দেহে বিভিন্ন তরলের pH নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহে অল্প-ক্ষারের ভারসাম্যতা রক্ষা করে।

৭। হরমোন ক্ষরণ: বৃক্ষ থেকে এরিথ্রোপোয়েটিন (erythryopoietin) ও অ্যানজিওটেনসিন (angiotensin) হরমোন ক্ষরিত হয়। এরিথ্রোপোয়েটিন রক্ত উৎপাদনকে উদ্বৃত্তি করে এবং অ্যানজিওটেনসিন দেহে লবণ ও পানির পরিমাণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৮। এনজাইম নিঃসরণ: বৃক্ষ থেকে রেনিন (renin) নামক এনজাইম নিঃসৃত হয়। রেনিন এনজাইম দেহে এলডোস্টেরন (aldosterone)-এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। [রেনিন (rennin) পাকস্থলিতে বিদ্যমান এনজাইম বা দুর্ক পরিপাকের সাথে জড়িত]।

৯। গ্লাইকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis): দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকলে বৃক্ষ গ্লাইকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রোটিন ও লিপিড থেকে শর্করা উৎপাদন করে। এসময় বৃক্ষ প্রায় 20% গ্লুকোজ সরবরাহ করতে পারে।

১০। পুনশোষণ: বৃক্ষ দেহে পানি, গ্লুকোজ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড পুনঃশোষণের সাথে জড়িত।

মানব রেচনতন্ত্রের অন্যান্য অংশ

□ **রেচননালি (Ureters):** প্রতিটি বৃক্ষ থেকে 25-30 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি নলাকার নালি বের হয়ে পেছন দিকে মূত্রথলিতে প্রবেশ করে। একে রেচননালি বা ইউরেটার বা গবিনী বলে। এর উর্বরপ্রাপ্ত স্ফীত হয়ে রেনাল পেলভিস গঠন করে।

কাজ: রেচননালির মাধ্যমে বৃক্ষ হতে মূত্র সংগৃহীত ও পরিবাহিত হয়ে মূত্রথলিতে জমা হয়।

□ **মূত্রথলি (Urinary bladder):** দেহের শ্রোণীগুহারে অবস্থিত অনেছিক পেশি নির্মিত পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির থলিকে মূত্রথলি বলে। এটি সক্রোচন-প্রস্তরণক্ষম। এর মূত্রধারণ ক্ষমতা 700-750 মিলিলিটার। তবে 280-320 মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই যে চাপ সৃষ্টি হয় তাতে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে।

কাজ: মূত্রকে সাময়িকভাবে ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূত্র নিষ্কাশন করে।

□ **মূত্রনালি (Urethra):** মূত্রথলি থেকে একটি নালির মাধ্যমে মূত্র দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। এ নালিকে মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা বলে। পুরুষে এটি 18-20 সেন্টিমিটার লম্বা এবং লিঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে লিঙ্গের প্রান্তের ছিদ্রপথে বাইরে মুক্ত হয়। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এটি 3.5-4 সেন্টিমিটার লম্বা এবং যৌনি সংলগ্ন ছিদ্রপথে বাইরে মুক্ত হয়।

কাজ: মূত্রথলি থেকে মূত্র মূত্রনালির মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে বীর্য স্থালিত হয়।

৬.২ রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া দেহ হতে নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন বলে। দেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং অবশ্যই দেহ হতে নিষ্কাশন হতে হয়। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্য হলো- ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামিনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক এবং এটি মূত্রের সাথে দেহ হতে বের হয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া সৃষ্টি হয় এবং রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে বৃক্ষে পৌছায়। বৃক্ষে মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এক্সপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে ইউরিটেলিজম (Ureotelism) বলে। যে সব প্রাণীতে ইউরিটেলিজম দেখা যায় তাদের ইউরিটেলিক প্রাণী (ureotelic animals) প্রাণী বলে।

মানুষ ইউরিটেলিক হওয়ার কারণে রেচনের শারীরবৃত্তকে দুটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়, যথা- (১) ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং (২) মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া।

১। ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Formation of Urea)

প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। অধিকাংশ অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের গাঠনিক ও কার্যকরি প্রোটিন যেমন- পেশি, হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড

অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু দেহ এসব অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সঞ্চয় করতে পারে না। এসব অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো অ্যাসিড যকৃতে এসে ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো অ্যাসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো অ্যাসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি করে। এসব অ্যামোনিয়া দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এগুলো শর্করা বিপাকে সৃষ্টি CO_2 এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ইউরিয়া $[CO(NH_2)_2]$ সৃষ্টি করে। এক অণু CO_2 দুই অণু NH_3 এর সাথে মিলিত হয়ে এক অণু ইউরিয়া গঠন করে। যকৃতে ইউরিয়া সৃষ্টি হয়। Hans Krebs এবং Kurt Henseleit (1932) ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে ইউরিয়া চক্র (urea cycle) বা অরনিথিন চক্র (Ornithine cycle) মাধ্যমে ইউরিয়া সৃষ্টি হয়। ইউরিয়া সৃষ্টির সরল বিক্রিয়াসমূহ হলো:



২। মৃত্ত তৈরির প্রক্রিয়া (Mechanism of Formation of Urine)

ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড রক্তের প্লাজমার পানির সাথে পরিবাহিত হয়ে বৃক্তে আসে এবং ছাঁকন পদ্ধতিতে রক্ত থেকে অপসারিত হয়। দেহের সকল রক্ত ছাঁকনের জন্য প্রতি 4-5 মিনিটে একবার বৃক্ত অতিক্রম করে। স্ফটিশ শারীরবিজ্ঞানী Arthur Robertson Cushny (1917) মানুষের বৃক্তে মৃত্ত তৈরির কৌশল বর্ণনা করেন। বৃক্তে তিনটি ধাপে মৃত্ত তৈরি হয়। এ ধাপগুলো হলো:

- (ক) গ্লোমেরুলার ছাঁকন বা অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন (Glomerular filtration or Ultrafiltration),
- (খ) টিউবুলার বা নির্বাচিত পুনঃশোষণ (Tubular or Selective reabsorption) এবং
- (গ) টিউবুলার ক্ষরণ (Tubular secretion)।

(ক) গ্লোমেরুলার ছাঁকন বা অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন: নেফ্রনের রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডিতে যে পদ্ধতিতে রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রূত হয় তাকে অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন বলে। এটি মৃত্ত তৈরির প্রথম ধাপ। বহিবাহী ধমনির ব্যাস অর্তবাহী ধমনির চেয়ে কম হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে উচ্চমাত্রার হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) থাকে। এ চাপের ফলে তরল পদার্থ গ্লোমেরুলাস থেকে বের হয়ে বোম্যানস ক্যাপস্যুলে প্রবেশ করে। চাপের মাধ্যমে এ ধরনের ছাঁকনকে অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন বলে। গ্লোমেরুলাসের কৈশিক জালিকায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ 70 মিমি/পারদ। এচাপের বিরুদ্ধে অন্যান্য চাপ হলো 35 মিমি/পারদ। ফলে প্রকৃত ছাঁকন চাপ (পার্থক্য) 35 মিমি/পারদ থাকায় গ্লোমেরুলাস হতে প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া প্রায় সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, ধাতব আয়ন, হরমোন প্রভৃতি উৎপাদন পরিস্রূত হয়ে বোম্যানস ক্যাপস্যুলে জমা হয়। পরিস্রূত এ তরলকে গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেট (glomerular filtrate) বলে। অতিসূক্ষ্ম ছাঁকনের জন্য গ্লোমেরুলাসের কৈশিকজালিকার প্রাচীর এবং বোম্যানস ক্যাপস্যুলের প্রাচীর মিলে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি ফিল্টার বা ছাঁকনি গঠন করে। ছাঁকনি গঠনকারী স্তরগুলো হলো-

- (i) গ্লোমেরুলাস রক্তনালির এভোথেলিয়াম,
- (ii) গ্লোমেরুলাস রক্তনালির বেসমেন্ট মেম্ব্রেন এবং
- (iii) বোম্যানস ক্যাপস্যুলের এভোথেলিয়াম।

এ ছাঁকনিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রপথে গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেট পরিস্রূত হয়। বোম্যানস ক্যাপস্যুলের অন্তর্ভুক্ত বা এভোথেলিয়ামে বিদ্যমান পড়োসাইট কোষ গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেট ছাঁকনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানবদেহের দুটি বৃক্তের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় 1200 সিসি রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে প্রায় 125 সিসি গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেট পরিস্রূত হয়ে বোম্যানস ক্যাপস্যুলে জমা হয়।



(খ) টিউব্যুলার বা নির্বাচিত পুনঃশোষণ: গ্লোমেরুলারস ফিল্ট্রেটে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উভয় ধরনের পদার্থ থাকে। প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো যেমন-পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আয়ন প্রভৃতি গ্লোমেরুলারস ফিল্ট্রেট থেকে পুনঃশোষণ পদ্ধতিতে রক্তনালিতে ফিরে আসে। নেফ্রনের রেনাল টিউব্যুলসের প্রাচীরের কোষগুলো পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন-

(i) কোষগুলোর একপাশে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণ এলাকা বেশি।

(ii) সাইটোপ্লাজমে অধিকসংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

(iii) কৈশিকজালিকার সাথে ঘনসন্ধিবিহীন থাকে।

গ্লোমেরুলারস ফিল্ট্রেট নেফ্রনের রেনাল করপ্তাসল থেকে রেনাল টিউব্যুলসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এর (গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট) 80% নির্বাচিত প্রব্যাদি রেনাল টিউব্যুলসের প্রাচীরের কোষ কর্তৃক পুনঃশোষিত হয়, যেমন-

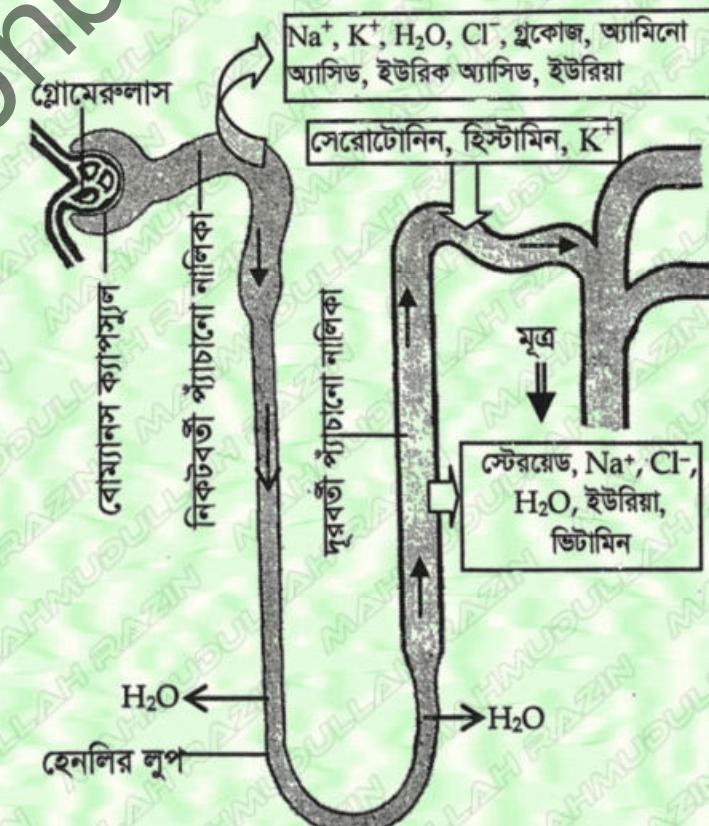
(i) রেনাল ক্যাপস্যুলের নিরুট্ববর্তী প্যাচানো নালিকার কোষে অধিকাংশ পুনঃশোষণ সংযুক্তি হয়। এখান থেকে পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, সোডিয়াম আয়ন, পটাসিয়াম আয়ন ইত্যাদি সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে শোষিত হয়।

(ii) হেনলির লুপে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় 70% পানি পুনঃশোষিত হয়।

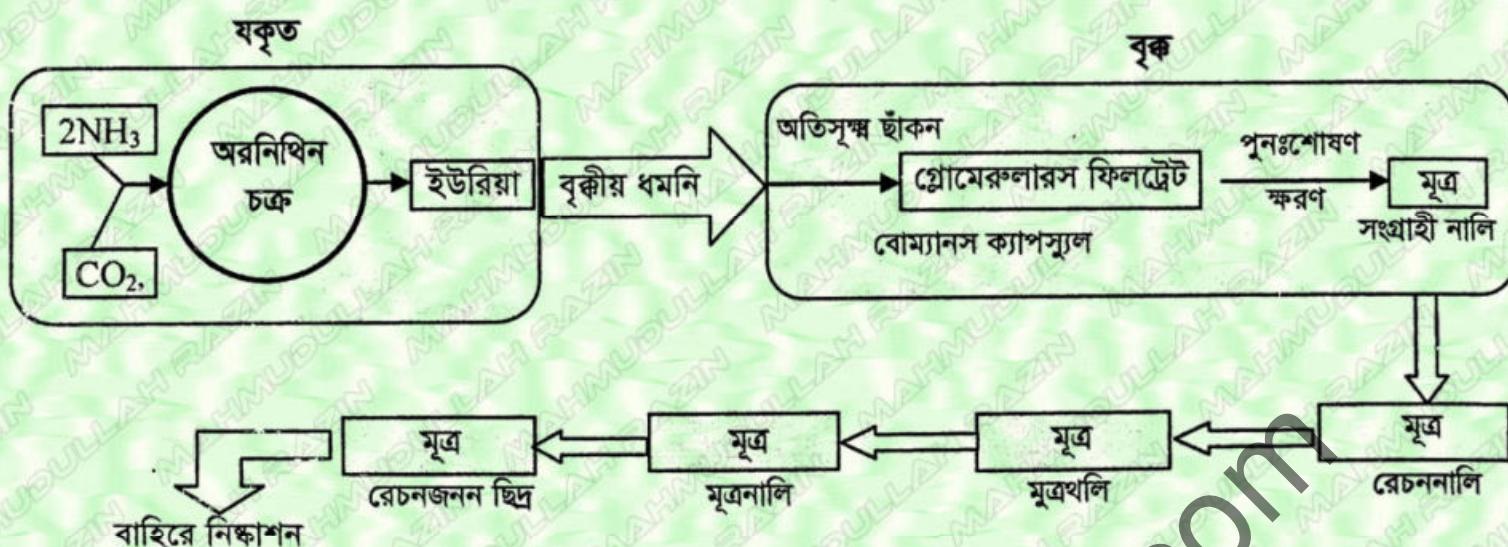
(iii) দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা থেকে Na^+ , Cl^- আয়ন, ভিটামিন ও কিছু পরিমাণ পানি পুনঃশোষিত হয়।

গ্লোমেরুলারস ফিল্ট্রেটের 40-50% ইউরিয়া রেনাল টিউব্যুলস থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে আসে। বাকী ইউরিয়া মূত্রের সাথে দেহ হতে অপসারিত হয়।

(গ) টিউব্যুলার ক্ষরণ: নেফ্রনের বহির্বাহী ধরনিতে কিছু অপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায় যেগুলো অতিসূক্ষ্ম ছাঁকনের সময় গ্লোমেরুলারস ফিল্ট্রেটে আসে না। রেনাল টিউব্যুলসের দূরবর্তী প্যাচানো নালিকার প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ রক্ত থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বস্তু যেমন- সেরোটোনিন, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম আয়ন, হিস্টামিন, স্টেরয়েড যৌগ ইত্যাদি যৌগ শোষণ করে সক্রিয় পদ্ধতিতে নালিকার লুমেনে ক্ষরণ করে যা মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়।



চিত্র ৬. ৬ নেফ্রনে মূত্র সৃষ্টির কৌশল



চিত্র ৬. ৭. মানব রেচনের প্রবাহচিত্র এবং মূত্র নিষ্কাশনের গতিপথ

মূত্র (Urine)

নেফ্রনের রেনাল টিউবুলসে গ্রোমেরলার ফিল্ট্রেট এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তৈরি ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অস্ত্রধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র (Urine) বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে 1.5 লিটার মূত্র ত্যাগ করে। দেহে দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মূত্র ($> 2.5 \text{ L}$) উৎপাদিত হলে তাকে পলিউরিয়া (polyuria), মূত্রের পরিমাণ $< 400 \text{ mL}$ হলে অলিগোরিয়া (oliguria) এবং $< 100 \text{ mL}$ হলে আনুরিয়া (anuria) বলে। স্বাভাবিক মূত্রের 96% পানি এবং 4% দ্রবীভূত পদার্থ। দ্রবীভূত পদার্থ হলো: ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড, কিটোন বডিস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদি।

মূত্রের বৈশিষ্ট্য

- আয়তন: দুটি বৃক্তে দৈনিক 0.5 থেকে 2.5 লিটার মূত্র উৎপাদন হয় যা 6-8 বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।
- বর্ণ: মূত্রে ইউরোক্রোম (urochrome) নামক পদার্থ থাকায় এটি খড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়। মূত্রের বর্ণ ঘোলাটে হলে অস্বাভাবিকতা নির্দেশ করে। মূত্রে রঞ্জ, পুঁজ, শুক্র কিংবা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে এক্সপ বর্ণের হয়ে থাকে। ডিহাইড্রেশনের কারণে মূত্রের বর্ণ গাঢ় হলুদ হয়ে যায়।
- গন্ধ: সাধারণত ঝাঁঝালো। তবে পানীয় বা খাদ্য গ্রহণের উপর মূত্রের বর্ণ বা গন্ধ নির্ভর করে।
- রাসায়নিক ধর্ম: মূত্র সামান্য অল্লীয়, এর pH মান 5-6.5। হাইপারইউরিকোসরিয়া (মূত্রে অতিমাত্রার ইউরিক অ্যাসিড) রোগীদের ক্ষেত্রে মূত্রের ইউরিক অ্যাসিড বৃক্ত, রেচননালি কিংবা মূত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি করে।
- আপেক্ষিক গুরুত্ব: 1.008 - 1.030।
- রাসায়নিক উপাদান: গবেষণাগারে মূত্র বিশ্লেষণ করে যেসব উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

মূত্রের রাসায়নিক উপাদান

১. পানি (96%)			
মূত্র	২. কঠিন পদার্থ (4%)	(ক) জৈব পদার্থ (60%)	i. নাইট্রোজেনাস
			ii. নন-নাইট্রোজেনাস
	(খ) অজৈব পদার্থ (40%)	i. ক্যাটায়ন	সাইট্রেট, ল্যাকটেট, কিটোন বডিস।
		ii. অ্যানায়ন	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , NH ₄ ⁺
			SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻

মূত্রত্যাগ (Micturition or Urination): মূত্রথলি থেকে মুদ্রনালির মাধ্যমে দেহ হতে মূত্র নিষ্কাশিত হওয়ার কৌশলকে মূত্রত্যাগ বলে। মানুষের মূত্রথলিতে 280-320 মিলিলিটার মূত্র জমা হলেই একটি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে মুদ্রনালির ডেট্রুসর পেশির (detrusor muscle) সঞ্চোচন ও স্ফিন্স্টার পেশির (sphincter muscle) অসারণ ঘটিয়ে মূত্র দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

৬.৩ বৃক্কের ভূমিকা

১। রেচনে বৃক্কের ভূমিকা

বৃক্ক প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে অপসারণ করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য হলো- ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এদেরকে রেচন বর্জ্য বলা হয়। এগুলো রক্তের বিভিন্ন উপাদানের সাথে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয়। এসব পদার্থ শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং এরা দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই এসব বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে নিষ্কাশন করা একটি অত্যাবশ্যকীয় শারীরবৃত্তীয় ঘটনা।

□ **ইউরিয়া বর্জ্য:** যকৃতে শর্করা বিপাকে সৃষ্টি কার্বন ডাই অক্সাইডের এর সাথে নাইট্রোজেন বিপাকে সৃষ্টি অ্যামোনিয়া সংযুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া অ্যামোনিয়া থেকে কম বিষাক্ত। এটি রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে আসে এবং মৃত সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ হতে বহিঃকৃত হয়। ইউরিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র অণু যা পরিবহনের জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না ফলে খুব সহজেই এরা ব্যপন প্রক্রিয়ায় কোষ পর্দা অতিক্রম করতে পারে। এটি অভিস্রবণ স্ক্রিয় এবং রক্ত ও অন্যান্য তরলের অভিস্রবণিক চাপ রক্ষার ভূমিকা রাখে।

□ **ইউরিক অ্যাসিড বর্জ্য:** যকৃতের কোষে নিউক্লিক অ্যাসিডের পিউরিন ক্ষারক বিপাকের ফলে ইউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। ইউরিক অ্যাসিড অণু ইউরিয়া অণু থেকে বৃহৎ, কম দ্রবণীয় এবং কম বিষাক্ত। এটি বৃক্ক দ্বারা দেহ হতে বহিঃকৃত হয়। হাইপারইউরিকোসরিয়া (মৃত্তে অতিমাত্রার ইউরিক অ্যাসিড) রোগীদের ক্ষেত্রে মৃত্তের ইউরিক অ্যাসিড বৃক্ক, রেচননালি কিংবা মৃত্তথলিতে সঞ্চিত হয়ে সুই আকৃতির (needle shaped) স্ফটিক সৃষ্টি করে যা বৃক্কের পাথর (kidney stone) নামে চিহ্নিত। তবে বৃক্কের পাথর অন্যান্য পদার্থ জমা হয়েও সৃষ্টি হয়।

□ **ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য:** দেহের পেশিতে ক্রিয়েটিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকের ফলে ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। দেহে বিদ্যমান প্রায় 2% ক্রিয়েটিন বিপাক প্রক্রিয়ায় পেশিতে শক্ত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়েটিনিন সৃষ্টি করে। বৃক্কে রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রূত হয়ে মৃত্তের সাথে বহিঃকৃত হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা দ্বারা বৃক্কের সুস্থ্যতা নির্ণয় করা হয়। এজন্য রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাত্রাকে বৃক্কের রোগ নিষ্ঠায়ের নির্দেশক (diagnostic index) হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃক্কের কাজে জটিলতা দেখা দিলে রক্তে ক্রিয়েটিনিন মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের 0.6-1.2 mg/dl এবং মহিলাদের 0.5-1.1 mg/dl (milligrams=mg, deciliter=dl)।

□ **অন্যান্য বর্জ্য:** বৃক্ক হতে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ওষুধ ও হরমোন বহিঃকৃত হয়। বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো অ্যাসিড অপসারিত হয়।

২। অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

দেহাভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি ও বিভিন্ন লবণের ভারসাম্যতা রক্ষার কৌশলকে অভিস্রবণ নির্যন্ত্রণ বা অসমোরেগুলেশন (osmoregulation) বলে। মানবদেহের অভিস্রবণ নির্যন্ত্রণে রেচনতত্ত্ব প্রধান ভূমিকা পালন করে।

□ **পানি সাম্যতা রক্ষা:** মানবদেহের অধিকাংশই পানি দ্বারা গঠিত। পূর্ণাঙ্গ পুরুষের দৈহিক ওজনের 60%ই পানি। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ 50%। শিশুদের দেহে পানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় 70%। মানবদেহে পানি দুভাবে অবস্থান করে। যেমন- **বহিঃকোষীয় তরল** (extracellular fluid) হিসেবে থাকে 45% এবং **অন্তঃকোষীয় তরল** (intracellular fluid) হিসেবে থাকে 55%। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহে পানি গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। প্রচুর পরিমাণ পানি পান করলে রক্তে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং রক্তের ঘনত্ব কমে যায়। আবার ঘামের সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি ও লবণ নির্গত হলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। বৃক্ক দেহে পানি ও লবণের মাত্রা সঠিক রাখে। প্রতিদিন প্রায় 170 লিটার পানি বৃক্ক দ্বারা পরিস্রূত হয়। কিন্তু 168.5 লিটার পানিই বৃক্কীয় নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে আসে। মাত্র 1.5 লিটার পানি মৃত্ত হিসেবে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

□ **সোডিয়াম আয়ন সাম্যতা রক্ষা:** Na^+ দেহতরলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এগুলো দেহের বহিঃকোষীয় তরলের আয়তন ঠিক রাখে। এছাড়া এরা ক্রিয়াবিভব (action potential) সৃষ্টি করে স্নায়ু উদ্বীপনা পরিবহন করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

করে। দেহে Na^+ আয়নের ঘনত্ব বহিঃকোষীয় তরলে প্রায় 142 mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 10 mmol/L। সুস্থ দেহে এ ঘনমাত্রা সর্বদা ধ্রুব (constant) অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক খাদ্য, পানীয় এবং খাবার লবণের সাথে দেহের চাহিদার চেয়ে বেশি Na^+ দেহে প্রবেশ করে। মৃত্র, পায়খানা ও ঘামের সাথে অতিরিক্ত Na^+ দেহ হতে বের হয়ে যায়।

□ পটাসিয়াম আয়ন সাম্যতা রক্ষা: K^+ দেহতরলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উত্তেজনক্ষম কলার বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টিতে এগুলো বিশেষভাবে জড়িত। স্বাভাবিক অবস্থায় এর ঘনত্ব বহিঃকোষীয় তরলে 4 mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 160 mmol/L। দেহ এ সাম্যবস্থা সঠিকভাবে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের ফল খেলে দেহে K^+ প্রবেশ করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত K^+ মৃত্র ও পায়খানার সাথে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়। K^+ এর অভাবে ডায়রিয়া ও পেশি দুর্বলতা দেখা দেয়। এর আধিক্যতা ও স্বল্পতা উভয়ই হৎরোগ সৃষ্টি করে।

৩। রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ বা অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্তের ভূমিকা

pH হলো কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রার বা $[\text{H}^+]$ এর 10 ভিত্তির ঋগ্নাত্মক লগারিদম (pH is the negative logarithm of $[\text{H}^+]$ to the 10 base) বা, $\text{pH} = -\text{Log}_{10}[\text{H}^+]$. পানি একটি নিরপেক্ষ দ্রবণ। পানির pH = 7. কোনো দ্রবণের pH মান পানির চেয়ে বেশি হলে উহা ক্ষারীয় (রক্তরস-7.4) এবং পানির চেয়ে কম হলে উহা অম্লীয় (মৃত্র-6.5) প্রকৃতির হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহতরলের pH মান 7.3 -7.7 পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। pH এর মান এর চেয়ে বেশি বা কম হলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বহিঃকোষীয় তরল (রক্তরস, কলারস) অপেক্ষা অন্তঃকোষীয় তরলের pH মান কিছুটা কম থাকে। এটি অবশ্য কলা থেকে কলাতে CO_2 উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। বহিঃকোষীয় তরলের pH মানের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন অন্তঃকোষীয় তরলের pH মানের উপর প্রভাব ফেলে। দেহতরলের অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য রক্ষায় বা pH নিয়ন্ত্রণে বৃক্ত মুখ্য ভূমিকা রাখে। অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্তের প্রাথমিক কাজ হলো দেহ তরলের অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নসমূহ সংরক্ষণ করা। দেহের আয়নসমূহের সার্বিক সংখ্যা ও ঘনত্ব স্বাভাবিক রাখার জন্য বৃক্ত প্রধানত দুটি কাজ সম্পন্ন করে-

- ১। প্রথমত শোষণ ও পুনঃশোষণের মাধ্যমে দেহতরলের HCO_3^- এর প্রমাণ মান বজায় রাখে এবং
- ২। দ্বিতীয়ত দেহতরল হতে প্রচুর পরিমাণ H^+ নল-কার্বনিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়াকুপে মৃত্রের সাথে নিষ্কাশন করে।

বৃক্তের H^+ নিঃসরণ নির্ভর করে অন্তঃকোষীয় তরলের pH মানের উপর যা আবার বহিঃকোষীয় তরলের pH মানের উপর নির্ভরশীল। ফলে দেহে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে H^+ নিঃসরণও বৃদ্ধি পায়। বৃক্তীয় নালিকা দ্বারা যে পরিমাণ Na^+ পুনঃশোষিত হয় সে পরিমাণ H^+ বেচিত হয়। অ্যাডরেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন হরমোন দ্বারা বৃক্তের H^+ রেচন মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী বৃক্ত HCO_3^- পুনর�ংস্কার করে। এটি নির্ভর করে বৃক্তের H^+ নিঃসরণ ও বৃক্তীয় নালিতে বিদ্যমান HCO_3^- এর পরিমাণের উপর। যখন বৃক্তীয় নালিকার তরলে যথেষ্ট পরিমাণ H^+ বিদ্যমান থাকে অথবা উহাতে HCO_3^- পরিমাণ কম থাকে তখন তরল থেকে সকল ধরনের বাইকার্বনেট শোষিত হয়। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থাতে HCO_3^- মৃত্রের সাথে বের হয়ে যায়।

৬.৪ বৃক্তের তাংক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয়

বৃক্ত শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। একে দেহের ছাঁকন যন্ত্র বলা হয়। মানবদেহের দুটি বৃক্ত প্রতিদিন প্রায় 170 লিটার রক্ত পরিশোধন করে শরীরকে সুস্থ রাখে। বৃক্ত নিজস্ব কোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারে অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বৃক্তের প্রধান রোগগুলো হলো: রেনাল ফেইলুর (renal failure), একিউট গ্লুমেরুলো নেফ্রাইটিস (acute glumerulo nephritis or AGN), প্রশ্রাবে রক্ত যাওয়া বা হেমাচুরিয়া (hematuria), নেফ্রোটিক সিনড্রোম (nephrotic syndrom), এনুরিয়া (anuria) ইত্যাদি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখার বৃক্তের স্বাভাবিক কার্যাবলি ও এর রোগ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে নেফ্রোলজি (Nephrology) বলে। বৃক্তের রোগকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ১। বৃক্তের দীর্ঘস্থায়ী বিকল বা ক্রনিক রেনাল ফেইলুর (chronic renal failure) এবং
- ২। বৃক্তের তাংক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলুর (acute renal failure)।

□ বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল: বৃক্ক যখন নিজস্ব কোনো রোগে আক্রান্ত হয় অথবা অন্য কোনো রোগে বৃক্ক আক্রান্ত হয়, যার ফলে বৃক্কের কার্যকারিতা ৩ মাস বা ততোধিক সময় পর্যন্ত লোপ পেয়ে থাকে তখন তাকে বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল বলে। একে বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা অক্সিক বৃক্কীয় রোগ (chronic kidney disease-CKD) বলে। দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ক রোগের সবচেয়ে অসুবিধা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগীদের কোনো উপসর্গ হয় না। ফলে বছরের পর বছর এরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যখন উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাদের বৃক্কের কার্যকারিতা 75% লোপ পায়। বৃক্কের কার্যকারিতা 75% লোপ পাওয়ার পরে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কেবল ডায়ালাইসিস অথবা বৃক্ক প্রতিস্থাপনই একমাত্র চিকিৎসা।

□ বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল: কোনো সুস্থ লোকের হঠাতে করে বৃক্কের কার্যক্রম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলুর (acute renal failure-ARF) বলে। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের ফলে সাধারণত প্রস্তাবের মাত্রা কমে যায়, অনেক সময় প্রস্তাব একবারেই বন্ধ হয়ে যায়, আবার কখনো কখনো স্বাভাবিক মাত্রার প্রস্তাব হয়েও এরোগ হতে পারে। এ রোগ হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বাঢ়তে থাকে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণগুলোকে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়, যেমন-

(ক) প্রিরেনাল কারণ বা বৃক্কে রক্ত প্রবাহ কমে যাওয়া (Pre-renal causes or decreased blood flow to the kidney): কিছু রোগ ও অবস্থার কারণে বৃক্কে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। যেমন- নিম্ন রক্তচাপ বা শক, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অতিমাত্রার ডায়ারিয়া ও বমি, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর, অতিমাত্রার ব্যথানাশক ওষুধ সেবন, রক্তে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব, অতি মাত্রার অ্যালার্জি, আগুনে পোড়া, রক্তবমি, ভল রক্ত দেয়া, সার্জিকেল অপারেশন, গর্ভপাত ইত্যাদি।

(খ) রেনাল কারণ বা বৃক্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া (Renal causes or direct damage to the kidneys): কিছু রোগ ও অবস্থার কারণে বৃক্ক নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- অতিমাত্রার প্রদাহ, যেমন- গ্রাম নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া, মাল্টিপল মায়েলিমা ক্যানসার, নেফ্রাইটিস, সর্প দংশন, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাকিউট চিউব্যুলার ন্যাক্রোসিস (ATN), রেনিন অ্যানজিওটেনসিন এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়া, ক্লেরোডার্মা, ভাস্কুলাইটিস, প্রাপ্তোটিক মাইক্রোঅ্যানজিওপ্যাথি ইত্যাদি।

(গ) পোস্টরেনাল কারণ বা মূত্রনালিতে বাধা (Post-renal causes or urinary tract obstruction): কিছু রোগ ও অবস্থার কারণে মূত্রনালিতে বাধার সৃষ্টি হয়। যেমন- প্রোস্ট্যাট গ্রহিত সমস্যা, ইউরেটারে পাথর, বৃক্কে পাথর, ইউরেনারি ক্যাথেটার, রেনাল ম্যালিগন্যাসি, মূত্রনালিতে রক্ত জমাট ইত্যাদি।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অনেকের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণগুলো নিম্ন বর্ণনা করা হলো:

■ মৃদু লক্ষণ (mild symptoms): মৃত্র উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, দেহের বিভিন্ন অংশ ফুলে যাওয়া, মনযোগ সমস্যা, দ্বিধা-বন্ধ, ক্লান্তি বোধ, অলসতা, বমির উদ্বেগ, বমি, ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, মুখে মেটালিক স্বাদ (metallic taste) অনুভূতি ইত্যাদি।

■ মাঝারি লক্ষণ (moderate symptoms): শারীরিক দুর্বলতা, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি, পা ও চোখ ফুলে যাওয়া, ঘন ঘন শ্বাস নেয়া, বমি, রক্তপাত, মৃত্যুত্যাগ হ্রাস, মৃদু মাথা ব্যথা, চুলকানি ইত্যাদি।

■ অতিমাত্রার লক্ষণ (severe symptoms): অধিক ঘুম, রক্তাঙ্গতা, বৃক্কে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, উচ্চ রক্তচাপ, প্রচণ্ড বমি, ব্যাপক রক্তপাত, চরম দুর্বলতা, মৃত্যুত্যাগে অক্ষমতা, খিঁচুনী বা একেবারে অজ্ঞান হওয়া ইত্যাদি।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় (Acute Renal Failure Diagnosis)

রক্ত ও মৃত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় করা হয়। নিম্নলিখিত কারণে পরীক্ষাগুলো করা হয়-

■ বৃক্ক বিকল হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

- বৃক্ষ বিকল হলে রক্তে আয়নের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।
- বৃক্ষ বিকল হলে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থাকে অ্যানিমিয়া (anemia) বলে।
- বৃক্ষ বিকল হলে মূন্ডের পরিমাণ কমে যায় ($< 0.5 \text{ ml/kg/h}$ for 6 hours)।

বৃক্ষের তাংক্ষণিক বিকলের করণীয় (চিকিৎসা ও প্রতিরোধ)

১। রোগীকে অবশ্যই একজন বৃক্ষ বিশেষজ্ঞের (nephrologist) শরণাপন্ন হতে হবে। রোগের অবস্থা জটিল হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

২। বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ায় রক্তে অতিমাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ ও তরল জমা হলে ডায়ালাইসিস (dialysis) করে অপসারণ করতে হবে।

৩। বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হলে অনেকসময় বৃক্ষ প্রতিস্থাপনের (kidney transplant) প্রয়োজন হয়।

৪। রোগীকে নিম্ন প্রোটিন ও পটাসিয়াম সম্মত খাবার খেতে হবে।

৫। বৃক্ষের তাংক্ষণিক বিকলের জটিলতা এড়াতে রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করতে হবে। যেমন-বৃক্ষের সংক্রমণ আরোগ্য লাভের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক সেবন, মৃত্তৈরির জন্য ডাইইউরেট সেবন, আয়ন ভারসাম্যতার জন্য ওষুধ সেবন ইত্যাদি।

৬। পাতলা পায়খানা, বমি বা জ্বর হলে ঘন ঘন চিনির শরবত বা স্যালাইস পান করতে হবে; প্রয়োজন হলে আইভি স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে।

৭। যাদের বয়স 50 এর বেশি, যাদের নিজের কিংবা পরিবারের অন্য কারো ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের বৃক্ষ নিয়মিত পরীক্ষা করা।

৮। শরীর সুস্থ ও সচল রাখার জন্য নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়াম করা, খাদ্যাভাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৯। অনেক ভেষজ ওষুধ আছে যেগুলো বৃক্ষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, সেগুলো এড়িয়ে চলা।

১০। কোনো অবস্থাতেই আনাড়ী দায় দিয়ে প্রসব কিংবা গর্ভপাত না ঘটানো। ভুল রক্তদান যাতে না ঘটে যেদিকে লক্ষ রাখা।

বৃক্ষ ও ডায়ালাইসিস

বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইসিস (dialysis)। রক্তে রেচন বর্জ্যের বৃদ্ধি পাওয়াকে অ্যাজোটিমিয়া (azotemia) বলে। এ অবস্থায় মানুষ দেহে যে অসুস্থতা অনুভব করে তাকে ইউরেমিয়া (uremia) বলে। বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে যাওয়া রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডায়ালাইসি অত্যাবশ্যিক। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করে প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

কখন ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হয়?

রোগীর দেহে রেচন বর্জ্যের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়ে যখন প্রচণ্ড অসুস্থ অনুভব করে তখন ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়। সাধারণত মূন্ডের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স পরীক্ষা দ্বারা বৃক্ষের সুস্থতা নির্ণয় করা হয়। মানুষের বৃক্ষে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত থেকে রেচন বর্জ্য ক্রিয়েটিনিন পরিশোধিত হয় তাকে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (creatinine clearance) বলে। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স হলো 125 সিসি/মিনিট। বৃক্ষের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স 10-12 সিসি/মিনিট হলোই ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়।

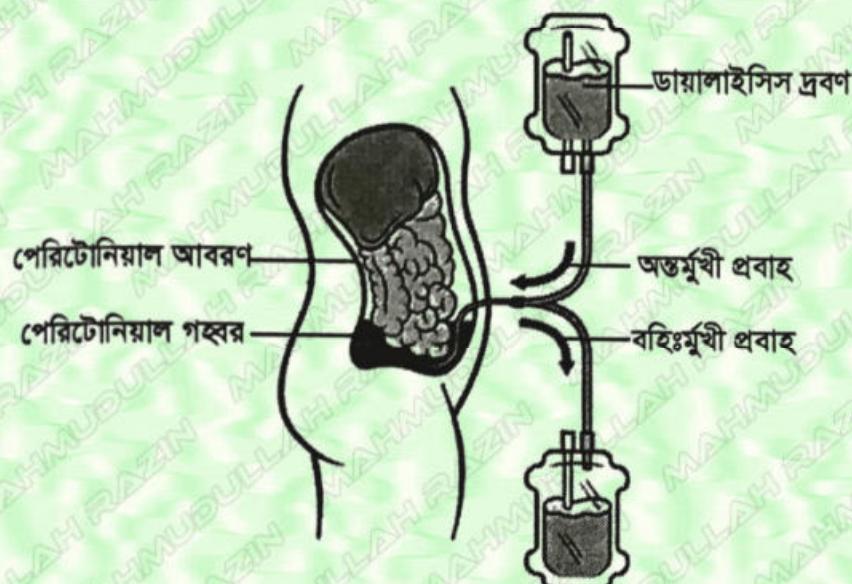
ডায়ালাইসিসের প্রকার

ডায়ালাইসিস সাধারণত দুই প্রকারের হয়। হিমোডায়ালাইসিস এবং পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস।

(ক) **হিমোডায়ালাইসিস (hemodialysis):** এক্ষেত্রে রক্ত থেকে অতিরিক্ত রেজন বর্জ্য ও পানি বের করে দেয়ার জন্য ডায়ালাইসিস মেশিনে বিদ্যমান একটি বিশেষ ধরনের ছাঁকনি বা ডায়ালাইসিস পর্দা (dialysis membrane) ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে রোগীর হাত বা পায়ের একটি ধমনি ও একটি শিরার মাঝে একটি প্লাস্টিকের নল গর্টেক্স গ্রাফট (gortex graft) স্থাপন করা হয়। এ পদ্ধতিকে সিমিনো ফিস্টুলা (Cimino fistula) বলা হয়। এ ফিস্টুলাতে সুইয়ুজ দুটি নল স্থাপন করা হয় যার একটি দিয়ে রক্ত ডায়ালাইসিস মেশিনে যায় এবং অপরটি দিয়ে বিশুद্ধ রক্ত দেহে ফিরে আসে।

(খ) **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (peritoneal dialysis):** এক্ষেত্রে একটি প্লাস্টিক নলের মাধ্যমে উদরের পেরিটোনিয়াল গহ্বরে একটি বিশেষ ধরনের দ্রবণ প্রবেশ করানো হয়। এ নলকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ক্যাথেটার (peritoneal dialysis

catheter) বলে এবং এটি উদর প্রাচীরের মধ্য দিয়ে উদর গহ্বরে স্থাপন করা হয়। উদরে গহ্বরের পেরিটোনিয়াল পর্দা রক্ত ও দ্রবনের মাঝে ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে। এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ ব্যবহার করে রক্ত থেকে অতিরিক্ত রেজন বর্জ্য ও পানি বের করে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি সাময়িকভাবে রোগীর চিকিৎসা দেয়া সম্ভব কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়।



চিত্র ৬.৮ পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া



চিত্র ৬.৯ হিমোডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে হিমোডায়ালাইসিসের প্রচলন বেশি। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ডায়ালাইসিস সুস্থ বৃক্কের মতো কাজ করে কিন্তু বৃক্ককে সুস্থ করে না। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করে মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। এটি হাস্পাতালে সঞ্চাহে দুই বা তিন দিন করা হয়। ডায়ালাইসিসের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এটি একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ডায়ালাইসিস শুরু করার পর কয়েক মাসের মধ্যেই টাকার অভাবে ডায়ালাইসিস বন্ধ করে দেয় এবং অকালে মৃত্যুবরণ করে থাকে।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney transplantation)

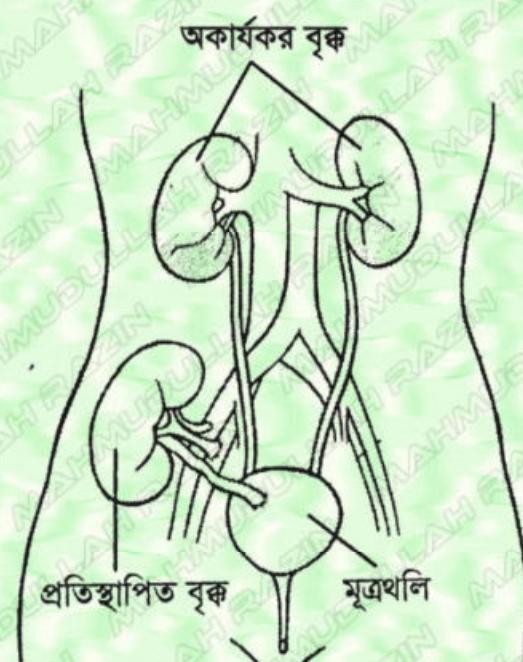
একজন অসুস্থ মানুষের দেহে অকার্যকর বৃক্কের পরিবর্তে কোনো সুস্থ মানুষের বৃক্ক স্থাপন করাকে বৃক্ক প্রতিস্থাপন বলে। নতুন স্থাপিত বৃক্ক অকার্যকর বৃক্কের পরিবর্তে কাজ করে। কিডনি সার্জন নতুন বৃক্ক তলপেটে স্থাপন করে রক্তজলালির সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়। নতুন স্থাপিত বৃক্কের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক বৃক্কের মতো মুদ্র তৈরি করে। যদি কোন সংক্রমণ বা উচ্চ রক্তচাপ না হয় তাহলে আগের বৃক্ক রেখে দেয়া হয়।

প্রতিস্থাপিত বৃক্ক কতদিন কাজ করে?

প্রতিস্থাপিত বৃক্ক কতদিন টিকবে তা বিভিন্ন প্রভাবকের উপর নির্ভর করে। সার্বিকভাবে প্রতিস্থাপিত বৃক্ক নিম্নরূপ স্থায়ী হয়:

- এক বছর- প্রায় 95%
- পাঁচ বছর-প্রায় 85-90%
- দশ বছর- প্রায় 75%

সুস্থ ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করলে প্রতিস্থাপিত বৃক্কের আয়ুক্ষাল আরো বৃদ্ধি পায়।



চিত্র ৬. ১০ বৃক্ক প্রতিস্থাপন

৬.৫ হরমোনাল ক্রিয়া: মূন্ত্রের ঘনত্ব ও রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

দেহের অভিস্রবণ ও রেচন কার্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চারটি হরমোন মানুষের মূন্ত্রের ঘনত্ব ও রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। হরমোনগুলো হলো:

(i) Antidiuretic hormone (ADH), (ii) Aldosterone hormone, (iii) Angiotensin II, (iv) Atrial natriuretic peptide (ANP)

১। **Antidiuretic hormone (ADH):** পিটুইটারি গ্রাহি ক্ষরিত antidiuretic hormone-এর প্রভাবে বৃক্ষের পানি শোষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি বৃক্ষীয় নালিকার পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্তে পানির মাত্রা কমে গেলে অধিক পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। এতে বৃক্ষীয় নালিকা দ্বারা অধিক পরিমাণ পানি শোষিত হয়। ফলে মূন্ত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং এর ঘনত্ব বেড়ে যায়। অন্যদিকে রক্তে পানির পরিমাণ বেশি হলে ADH ক্ষরণ করে যায় এবং এতে কম পরিমাণ পানি বৃক্ষীয় নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয়। ফলে মূন্ত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ঘনত্ব কমে যায়।

পিটুইটারি গ্রাহির ADH উৎপাদন হাস পেলে মানুষের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (diabetes insipidus) নামক রোগ সৃষ্টি হয়। এতে নেফ্রনের নালি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পুনঃশোষিত হয় না, ফলে মূন্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ADH ইনজেকশন কিংবা ADH ন্যাজাল স্প্রের মাধ্যমে এরোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। **Angiotensin II:** এটি একটি সক্রিয় পেপটাইড হরমোন যা angiotensin I হিসেবে নিক্রিয় অবস্থায় বক্তৃত থেকে ক্ষরিত হয়। এর নিম্নলিখিত প্রভাবগুলো দেখা যায়:

- (i) এর প্রভাবে অ্যালডোস্টেরন হরমোন সংশ্লেষণ ও ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।
- (ii) রক্তনালির সঙ্কোচনের মাধ্যমে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।
- (iii) নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকা কর্তৃক সোডিয়াম পুনঃশোষণ উদ্দীপিত করে।
- (iv) পিটুইটারি গ্রাহির উদ্দীপিত করে।

৩। **Aldosterone hormone:** বৃক্ষের শীর্ষে বিদ্যমান অ্যাডরেনাল গ্রাহি থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি নেফ্রনের প্রান্তীয় নালি এবং সংগ্রাহক নালির উপর ক্রিয়া বৃক্ষের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন বৃক্ষের বিভিন্ন আয়ন ও পানি পুনঃশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি বৃক্ষের সোডিয়াম (Na^+) সংরক্ষণ করা, পানি ধরে রাখা এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪। **Atrial natriuretic hormone (ANH):** হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের প্রাচীরে বিদ্যমান কিছু কোষ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে বৃক্ষের সোডিয়াম রেচন হার বৃদ্ধি পায় এবং দেহের রক্তচাপ ও রক্তের পরিমাণ কমে যায়। হৃৎপিণ্ডে অলিন্দে মাত্রারিক্ত রক্ত প্রবাহিত হলে এর প্রাচীর প্রসারিত হয়। এসময় এর প্রাচীর থেকে ANH ক্ষরিত হয়। ANH এর প্রধান শারীরবৃক্ষীয় প্রভাব হলো:

- এটি নেফ্রনের অ্যাফারেন্ট ধমনিগুলোকে প্রসারিত করে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হার বৃদ্ধি করে।
- এটি নেফ্রনের সংগ্রাহক নালিগুলোকে সোডিয়াম লবণ পুনঃশোষণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেয়।
- এটি রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন ক্ষরণে বাধা দেয়।

ব্যবহারিক: বৃক্ষের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পর্যবেক্ষণ

১। বৃক্ষের সার্বিক প্রস্তুতে বাইরের দিকের রেনাল কর্টেক্স এবং ভেতরের দিকের রেনাল মেডুলা দেখা যায়।

২। কর্টেক্স ও মেডুলাতে কয়েক লক্ষ বৃক্ষের কার্যকরি একক নেফ্রন ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে।

৩। কর্টেক্স অংশে নেফ্রনের রেনাল করপাসল, প্রিমাল প্যাচানো নালিকা এবং ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা অবস্থান করে।

৪। মেডুলা অংশে নেফ্রনের হেনলির লুপ, সংগ্রাহক নালিকা এবং রক্তজালিকা অবস্থান করে।

৫। মেডুলা অংশে 8-18টি তিভুজাকৃতির গঠন রেনাল পিরামিড (renal pyramids) দেখা যায়।

৬। রেনাল করপাসল বৃক্কের অনুচ্ছেদের সবচেয়ে স্পষ্ট আণুবীক্ষণিক অংশ। এগুলো বাটি আকৃতির বোম্যানস ক্যাপসুল এবং জটিল গ্লোমেরুলাস নিয়ে গঠিত।

৭। অ্যাফারেন্ট ধমনিকা ও ইফারেন্ট ধমনিকা নিয়ে বল আকৃতির গ্লোমেরুলাস গঠিত যা বোম্যানস ক্যাপসুল-এর অধিকাংশ স্থান দখল করে রাখে।

৮। রেনাল করপাসল-এর সাথে জাক্সটাগ্লোমেরুলাস অঙ্গ (juxtaglomerular apparatus) বিদ্যমান থাকে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুলসহ ম্যালপিজিয়ান বড় বিদ্যমান।

২। ব্রাশ বর্ডারযুক্ত প্রক্রিমাল নালিকা, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা, সংগ্রাহক নালিকা, রঞ্জনালিকা ইত্যাদি বিদ্যমান।

৩। বিভিন্ন নালিকার ফাঁকে ফাঁকে মেডুলারি রশ্মি নামক যোজক কলা বিদ্যমান।

৪। রেনাল করপাসল-এর সাথে জাক্সটাগ্লোমেরুলাস অঙ্গ বিদ্যমান থাকে।



চিত্র ৬.১১ বৃক্কের অণুপ্রস্থছেদ

সারসংক্ষেপ

- **রেচন:** যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহ হতে নাইট্রোজেনটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন বলে। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনটিত রেচন বর্জ্য হলো- ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামেনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি।

- **নেক্রন:** বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেক্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় 10-12 লক্ষ নেক্রন থাকে।

- **হেনলির লুপ:** নেক্রনের নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা লুপ গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিক্ষারক জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-র নামানুসারে একে হেনলির লুপ বলা হয়।

- **আলট্রাফিল্ট্রেশন:** নেক্রনের রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডিতে যে পদ্ধতিতে রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রূত হয় তাকে অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বা আলট্রাফিল্ট্রেশন বলে।

- **মৃত্র:** নেক্রনের রেনাল টিউব্যুলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অস্ত্রধর্মী তরুণ রেচন বর্জ্য মৃত্রাখলিতে জমা হয় তাকে মৃত্র বলে।

- **বৃক্কের পাথর:** অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড মৃত্রানালিতে সংঘর্ষ হয়ে সুই আকৃতির স্ফটিক সৃষ্টি করে যা বৃক্কের পাথর নামে চিহ্নিত। তবে বৃক্কের পাথর অন্যান্য পদার্থ জমা হয়েও সৃষ্টি হয়।

- **ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স:** মানুষের বৃক্কে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত থেকে রেজন বর্জ্য ক্রিয়েটিনিন পরিশোধিত হয় তাকে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স বলে। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স হলো 125 সিসি/মিনিট। বৃক্কের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স 10-12 সিসি/মিনিট হলেই ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়।

- **বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল:** বৃক্ক যখন নিজস্ব কোনো রোগে আক্রান্ত হয় অথবা অন্য কোনো রোগে বৃক্ক আক্রান্ত হয়, যার ফলে বৃক্কের কার্যকারিতা ৩ মাস বা ততোধিক সময় পর্যন্ত লোপ পেয়ে থাকে তখন তাকে বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল বা ক্রনিক রেনাল ফেইলুর বলে।

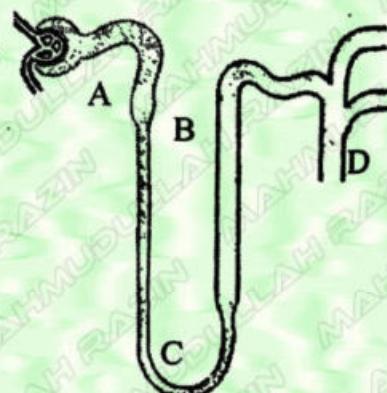
- **বৃক্কের তাংক্রিমিক বিকল:** কোনো সুস্থ লোকের হঠাতে করে বৃক্কের কার্যক্রম কমে যাওয়া বা বক্ষ হয়ে যাওয়াকে বৃক্কের তাংক্রিমিক বিকল বা আকিউট রেনাল ফেইলুর বলে।

■ **ডায়ালাইলিস:** বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইলিস।

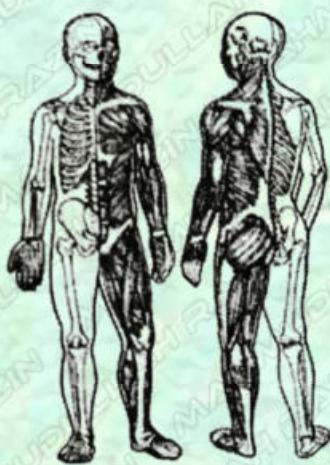
- মানুষের দুটি বৃক্কে যে পরিমাণ নেক্রন থাকে তার 50% সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে এবং 50% বিশ্রামে থাকে। তাই কোনো মানুষের দেহ হতে একটি বৃক্ক অপসারণ করলেও সে দিব্যি সুস্থ থাকে।
 - মানুষের দেহের সকল রক্ত বৃক্ক দিয়ে প্রবাহিত হতে 4-5 মিনিট সময় লাগে। সে অনুযায়ী প্রতিদিন দুটি বৃক্ক থায় 170 লিটার রক্ত পরিশোধন করে যা দেহের রক্তের মোট আয়তনের 40 শুণ।
 - মানুষের বৃক্কে যে পাথর হয় সেগুলো প্রাথমিক অবস্থায় রক্তের সাথে সমগ্র দেহে ঘুরে বেড়ায়।
 - বৃক্কে প্রবেশকারী রেনাল শিরা দেহের সবচেয়ে বড় শিরা।
 - মানুষের মৃত্যুলির আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের আয়তনের সমান।
 - চা, কফি ও অ্যালকোহল ইত্যাদি পানীয় মৃত্যু সৃষ্টি ত্বরান্বিত করে। এজন্য এদের ডাইইউরেট বলা হয়।
 - গবেষণায় দেখা গেছে কিডনি বিকল হ্বার পেছনে 50% ভূমিকা রাখে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ। অন্যান্য যেসব কারণে কিডনি নষ্ট হয় সেগুলো হলো: ধূমপান, স্ত্রীলাভ, হৃদরোগ ইত্যাদি।
 - বাংলাদেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা থায় 2 কোটির মত। এর মধ্যে কমপক্ষে প্রতিবছর কিডনিজনিত রোগে কমপক্ষে 35 হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। এ হিসেবে প্রতি ঘণ্টায় থায় 5 জন কিডনি রোগের কারণে মারা যায়।
 - আমেরিকাতে 450,000 মানুষ নিয়মিত ডায়ালাইসিস করে এবং 185,000 মানুষ কিডনি প্রতিস্থাপন করে বেঁচে আছে।
 - কিডনি বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 2006 সাল থেকে প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস পালন করা হয়।

অনুবাদ

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ଳା (ନୟନା)



মানব শারীরতত্ত্ব: চলন ও অঙ্গচালনা



মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে চলাফেরা করতে হয়। হাত ও পায়ের সঞ্চালন ছাড়া মানুষের চলন এবং কাজ করা অসম্ভব। এসব অঙ্গের পরিচালনে দেহের দুটি তত্ত্ব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে কঙ্কালতত্ত্ব এবং পেশিতত্ত্বের সক্রিয়তার জন্য আমরা চলাচল ও কাজ করতে পারি। এদুটি তত্ত্ব আমাদের দেহের সুনির্দিষ্ট অবকঠামো গঠন করে। বিভিন্ন অঙ্গসমূহ এবং পেশি সংযোগ দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়ে মানুষের কঙ্কালতত্ত্ব এবং পেশিতত্ত্ব চলন ও অঙ্গ সঞ্চালনে প্রধান ভূমিকা রাখে। এ অধ্যায়ে মানুষের কঙ্কালতত্ত্বের প্রধান অংশ, এদের কাজ, অঙ্গের কয়েক ধরনের সমস্যা এবং পেশির গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words): অঙ্গীয় কঙ্কাল, উপাঙ্গিক কঙ্কাল, করোটিকা, কশেরুকা, শ্রোণীচক্র, ফিমার, হ্যাভারসিয়ান তত্ত্ব, ক্যানালিকুলি, কোমলাঙ্গি, সারকোলেমা, কার্ডিয়াক পেশি, ফ্লেক্সর পেশি, অঙ্গিভঙ্গ।

পিরিয়ড সংখ্যা ১২। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল) -

- মানুষের কঙ্কালতত্ত্বের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- অঙ্গি ও তরঙ্গাঙ্গির (কোমলাঙ্গি) গঠনের তুলনা করতে পারবে।
- ব্যবহারিক: মানুষের কঙ্কালতত্ত্বের অঙ্গিসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের তুলনা করতে পারবে।
- পেশির টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যবহারিক: প্রস্তুতকৃত স্ট্রাইডের সাহায্যে মস্তি ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা করতে পারবে।
- কঙ্কালের প্রধান কার্যক্রম 'রডস ও লিভারের' একটি তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মানুষের হাতু সঞ্চালনে অঙ্গি ও পেশির সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের অঙ্গিভঙ্গ এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের অঙ্গিসমূহে আঘাত ও এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭.১ মানব কঙ্কালতত্ত্ব

জগীয় মেসোভার্ম উদ্ভূত বিশেষ ধরনের যোজককলা অঙ্গি ও কোমলাঙ্গি নির্মিত যে তত্ত্ব মানবদেহের প্রধান কাঠামো গঠন করে, দেহের গুরুত্বপূর্ণ নরম অঙ্গাদি ধারণ করে, দেহের ভারবহন করে, দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে এবং পেশি সংযোজনের তল সৃষ্টি করে তাকে কঙ্কালতত্ত্ব (skeletal system) বলে। মানব কঙ্কালতত্ত্বের অধিকাংশই অঙ্গি নির্মিত। এছাড়া এ তত্ত্বে তরঙ্গাঙ্গি, টেনডন ও লিগামেন্ট থাকে যারা কঙ্কালতত্ত্বের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে। মানুষের 21 বছর বয়সের অঙ্গের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। মানবদেহের অঙ্গি নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞানকে মানব অঙ্গবিজ্ঞান বা হিউমেন অস্ট্রোলজি (human osteology) বলে।

কঙ্কালতত্ত্বের কাজ

কঙ্কালতত্ত্ব মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কার্যাবলি সম্পাদন করে। কঙ্কালবিহীন মানুষ একপিণ্ড মাংশ ও নাড়িভূড়ি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কঙ্কালতত্ত্ব দেহের অবকাঠামো গঠন করে এবং পুরুষ ও নারীদেহের মোট ওজনের যথাক্রমে 15% ও 10% গঠন করে। নিম্নে মানবদেহের কঙ্কালতত্ত্বের কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো-

- ১। দৈহিক কাঠামো গঠন: কঙ্কালতন্ত্র মানবদেহের দৃঢ় ও মজবুত অবকাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি প্রদান করে।
- ২। সুরক্ষা: মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি যেমন- মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৎপিণি, সুমুদ্রাকাণ্ড প্রভৃতি বিশেষভাবে নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

- ৩। সংযোগতন্ত্র সৃষ্টি: দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন কঙ্কালে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সংঘালন ঘটায়।
- ৪। চলন: অঙ্গসংক্রিতি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয় দ্বারা কঙ্কালতন্ত্র মানুষের চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।
- ৫। রক্তকণিকা উৎপাদন: অঙ্গের ভেতরে অবস্থিত অঙ্গমজ্জা (bone marrow) থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। অঙ্গমজ্জা থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় 26 লক্ষ লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়।
- ৬। খনিজলবণ সংরক্ষণ: ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস জাতীয় খনিজলবণ অঙ্গেতে সংরক্ষিত হয়। দেহের প্রায় 97% ক্যালসিয়ামই অঙ্গেতে জমা থাকে। দেহের প্রয়োজনে এগুলো রক্তে মুক্ত হয়ে খণিজলবণের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- ৭। রাসায়নিক শক্তি সংরক্ষণ: মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু লোহিত অঙ্গমজ্জা (red bone marrow) পরিবর্তিত হয়ে পীত অঙ্গমজ্জা (yellow bone marrow) গঠন করে। পীত অঙ্গমজ্জায় প্রচুর পরিমাণে অ্যাডিপোজ কোষ থাকে যেগুলো দেহের সংরক্ষিত রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে বিবেচ্য।

- ৮। চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা: কঙ্কালতন্ত্র দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।
- ৯। রোগ প্রতিরোধ: অঙ্গের রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।
- ১০। শ্রবণ: কঙ্কালতন্ত্রের সবচেয়ে ছোট অঙ্গ অন্তঃকর্ণের মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস মানুষের শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- ১১। বিষাক্ত মৌল সংরক্ষণ: অঙ্গে অনেক বিষাক্ত মৌল যেমন- লেড, আর্সেনিক ইত্যাদি সংরক্ষণ করে দেহকে বিপদমুক্ত রাখে।
- ১২। হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ: অঙ্গে কোষ থেকে অস্টিওক্যালসিন (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহে রক্তের চিনি ও চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কঙ্কালতন্ত্রের উৎপাদন

কঙ্কালতন্ত্র পাঁচ ধরনের তন্ত্রময় ও খনিজসমূহ প্রধান উৎপাদন নিয়ে গঠিত। যেমন-

- ১। অঙ্গ (Bone): অঙ্গ কঙ্কালতন্ত্রে বিদ্যমান সুদৃঢ় যোজক কলা যা প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দিয়ে গঠিত।
- ২। কোমলাঙ্গি (Cartilage): কোমলাঙ্গি কঙ্কালতন্ত্রে বিদ্যমান স্থিতিস্থাপক ধরনের যোজক কলা। তবে এতে কোন ক্যালসিয়াম থাকে না।
- ৩। লিগামেন্ট (Ligament): লিগামেন্ট বা অঙ্গবন্ধনী হলো ঘন, শ্বেত বর্ণের তন্ত্রময় ও স্থিতিস্থাপক বন্ধনী যা দ্বারা একটি অঙ্গ অন্য একটি অঙ্গের সাথে যুক্ত থাকে। এগুলো বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক স্থানে ধরে রাখতে সহায়তা করে।
- ৪। টেনডন (Tendon): টেনডন হলো ঘন, মজবুত, শ্বেত বর্ণের নমনীয় ও অঙ্গস্থাপক তন্ত্রময় যোজক কলা যেগুলো মাংসপেশির প্রাপ্তে অবস্থান করে পেশি ও অঙ্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

- ৫। অঙ্গসংক্রিতি (Joint): একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গের সাথে সংযুক্ত হয়ে যে সংক্রিত গঠন করে তাকে অঙ্গসংক্রিতি বলে। অঙ্গসংক্রিতি থাকার কারণে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভিন্ন মাত্রায় সংঘালন করা যায় ফলে চলন, নড়ন, ভারবহন ও বিভিন্ন কাজকর্ম সহজ হয়।

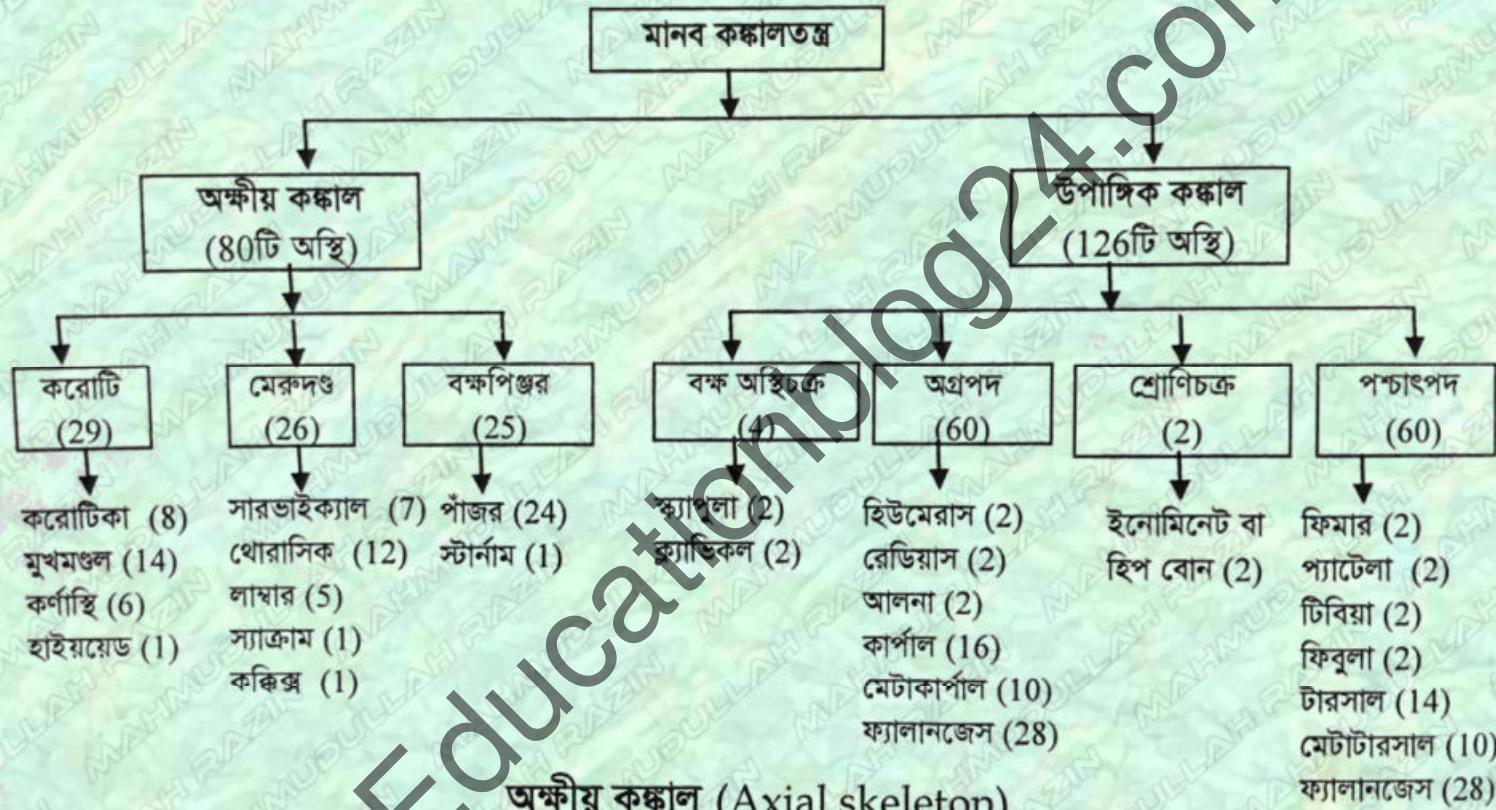
কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ

মানবশিশু জন্মের সময় দেহে প্রায় 300টি অঙ্গ থাকে। কিন্তু পরিণত মানবকঙ্কাল মোট 206টি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কোমলাঙ্গি (তরলাঙ্গি) থাকে তবে কোমলাঙ্গি নির্মিত কোনো অঙ্গে গঠন নেই। মানুষের কঙ্কালতন্ত্রকে প্রধান দুটাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন-

১। অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton): কঙ্কালতন্ত্রের যে অংশগুলো দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থিত তাদের অক্ষীয় কঙ্কাল বলে। মোট ৪০টি অস্থির সমন্বয়ে অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত। করোটি (skull), মেরুদণ্ড (vertebral column), বক্ষপিণ্ড (thoracic cage) দেহের অক্ষীয় কঙ্কাল গঠন করে।

২। উপাঙ্গিক কঙ্কাল (Appendicular skeleton): কঙ্কালতন্ত্রের যে অংশগুলো অক্ষীয় কঙ্কালের দুপার্শে প্রতিসমভাবে অবস্থান করে তাদের উপাঙ্গিক কঙ্কাল বলে। মোট ১২৬টি অস্থির সমন্বয়ে উপাঙ্গিক কঙ্কাল গঠিত। বক্ষ অস্থিচক্র (pectoral girdle), উর্ধ্ববাহুর অস্থি (forelimb), শ্রোণিচক্র (pelvic girdle) ও নিম্নবাহুর অস্থি (hindlimbs) উপাঙ্গিক কঙ্কাল গঠন করে।

মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:



অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton)

করোটি, মেরুদণ্ড ও বক্ষপিণ্ডের নিয়ে মানুষের অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত।

১। করোটি (Skull)

মস্তক গঠনকারী কঙ্কালকে করোটি বলে। করোটি ২৯টি অস্থি নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে করোটিকার অস্থি ৪টি, মুখমণ্ডলীয় অস্থি ১৪টি, কর্ণস্থি ৬টি এবং হাইঅয়েড অস্থি ১টি। করোটি প্রধান তিনটি কাজ করে: এটি মস্তিষ্ককে সুরক্ষা করে, স্টেরিওকোপিক দর্শনের জন্য দৃঢ়চার্খের মাঝের দূরত্ব ঠিক করে এবং শব্দ তরঙ্গের গতিপথ ও দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য কানের অবস্থান ঠিক করে।

মানুষের করোটি প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা-করোটিকা ও মুখমণ্ডলীয় অস্থি।

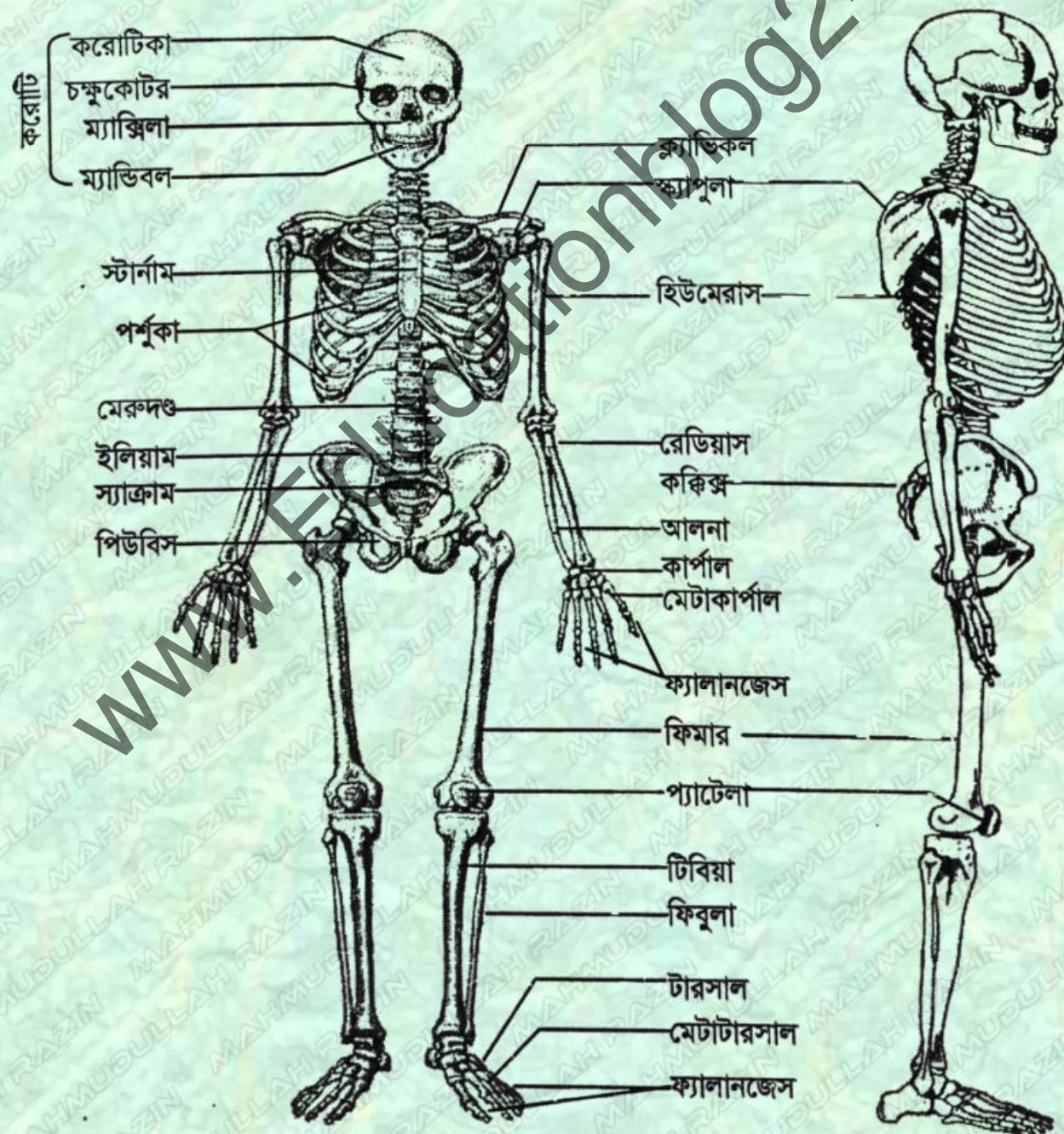
(ক) করোটিকা (Cranium): করোটির যে অংশ মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে তাকে করোটিকা বা ক্রেনিয়াম বা ক্যালভেরিয়াম (Cranium or Calvarium) বলে। ছয় ধরনের মোট ৪টি সুগঠিত, শক্ত ও মজবুত অস্থিপাত দিয়ে করোটিকা গঠিত। পাতঙ্গলো একে অন্যের সাথে সূচার সংক্রিয় (suture joint) মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। সূচার সন্ধিগুলোকে মাথার খুলির দাগকাটা জোড়া বলা হয়। জন্মের সময় শিশুর করোটিকার অস্থিগুলো আলাদা থাকে। ফলে মস্তকে ৬টি ফাঁকা স্থান থাকে। এদের ফন্টানেল (fontanelles) বলে। ফন্টানেল থাকার কারণে প্রসবের সময় মাথার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে প্রসব নলি (birth canal) দিয়ে শিশুর বের হওয়া সহজ হয় এবং পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বৃদ্ধির ফলে উহার স্থান সংকুলান হয়। দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশুর করোটির সকল অস্থি সূচার সংক্রিয় মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে জোড়া লেগে যায়।

করোটিকা যেসব অস্থি নিয়ে গঠিত সেগুলো হলো: কপাল ও মাথার সম্মুখভাগ গঠনকারী অগভীর পেয়ালাকৃতির অযুগ্ম ফ্রন্টাল অস্থি (frontal bone), ফ্রন্টালের পেছনে অনিয়মিত চতুর্কোণাকৃতির একজোড়া প্যারাইটাল অস্থি (parietal bone),

মানব কঙ্কালতত্ত্বের শ্রেণিবিন্যাস ও অস্থিসমূহের তালিকা				
কঙ্কালতত্ত্বের অংশ		অস্থির নাম	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
অঙ্গীয় কঙ্কাল (80টি)	করোটি (29টি)	করোটিকা	ফ্রন্টাল..... প্যারাইটাল..... টেম্পোরাল..... অক্সিপিটাল..... স্ফেনয়েড..... এথময়েড.....	1 2 2 1 1 1
		মুখমণ্ডল	উৎর্বরচোয়াল (ম্যাক্সিলা)..... নিম্নচোয়াল (ম্যানিবল)..... জাইগোম্যাটিক..... ন্যাজাল ল্যাক্রিমাল..... ন্যাজাল কনকা..... ডোমার প্যালেটাইন.....	2 1 2 2 2 2 1 2
		কর্ণাস্থি	মেলিয়াস..... ইনকাস..... স্টেপিস.....	2 2 2
		হাইয়য়েড		1 1
		মেরুদণ্ড	সারভাইক্যাল	7
			থোরাসিক	12
			লীম্বার	5
			স্যাক্রাম.....	1 (5)
			কক্ষিক্র.....	1 (4)
		বক্ষ পিঞ্জর	পাঁজর..... স্টার্নাম.....	24 1
উপাঙ্গিক কঙ্কাল (126টি)	বক্ষ অস্থিচক্র	(দুটি)	ক্ষ্যাপুলা..... ক্ল্যাভিকল.....	2 2
			হিউমেরাস..... রেডিয়াস.....	2 2
			আলনা.....	2
			কার্পাল.....	16
			মেটাকার্পাল.....	10
			ফ্যালানজেস.....	28
		(দুটি)	ইনোমিনেট বা হিপ বোন...	2 (3+3) 2 (6)
			ফিমার..... প্যাটেলা	2 2
			টিবিয়া	2
			ফিবুলা..... টারসাল..... মেটাটারসাল..... ফ্যালানজেস.....	2 14 10 28
	পশ্চাত্পদ (পা)	(দুটি)	সর্বমোট	206 (217)

করেটিকার দুপাশে দুটি টেম্পোরাল অস্থি (temporal bone), করেটিকার পশ্চাত ও অন্তর্ভাগে অবস্থিত একটি অযুগ্ম অক্সিপিটাল অস্থি (occipital bone), করেটিকার মেঝে গঠনকারী একটি অযুগ্ম ফেনয়েড অস্থি (sphenoid bone) এবং করেটিকার মেঝের সম্মুখ দিকে অবস্থিত জটিল গঠন বিশিষ্ট ত্রিভুজ আকৃতির এথময়েড অস্থি (ethmoid bone)। করেটিকার অক্সিপিটাল অস্থিতে ফোরামেন ম্যাগনাম (foramen magnum) নামক একটি ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে স্পন্ড্যালিক কোড (spinal cord) প্রসারিত হয়। করেটিকার ফেনয়েড অস্থি দেখতে প্রসারিত ডানাসহ বাদুর কিংবা প্রজাপতির মতো। এতে একটি গর্ত থাকে যার মধ্যে পিটুইটারি গ্রাণ্ড অবস্থান করে। এথময়েড অস্থি নাসিকা গহ্বরকে মন্তিক্ষ হতে পৃথক রাখে।

(ব) মুখমণ্ডলীয় অস্থি (Facial skeleton) : মানুষের করেটিতে আট ধরনের 14 টি অস্থি নিয়ে মুখমণ্ডলীয় অস্থি গঠিত। মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলো হলো: 2টি ইনফেরিয়র ন্যাজাল কনকা, 2টি ল্যাক্রিমাল, একটি U আকৃতির ম্যানিবল (নিম্নচোয়াল), 2টি ম্যাক্সিলা (উর্ধ্বচোয়াল), 2টি ন্যাজাল, 2টি প্যালেটাইন, 2টি জাইগোম্যাটিক ও 1টি ভোমার অস্থি। মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলো করেটিতে সম্মুখ-নিম্নাংশ গঠন করে, মুখমণ্ডলের অবয়ব প্রদান করে এবং চোখ, কান, নাক ও মুখগহ্বর সৃষ্টি করে।



চিত্র ৭.১ মানব কঙ্কাল-সম্মুখদৃশ্য

চিত্র ৭.২ মানব কঙ্কাল-পার্শ্বদৃশ্য

২। মেরুদণ্ড (Vertebral column)

মেরুদণ্ড মানবদেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ গঠন করে। একে শিড়দাঁড়া বা স্পাইন (spine) নামেও ডাকা হয়। মেরুদণ্ড কতগুলো অসম আকৃতির, স্বাধীন অস্থিও নিয়ে গঠিত যেগুলো একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত কিন্তু সীমিতভাবে সঞ্চালনক্ষম। এসব অস্থিওকে কশেরুকা (একবচন-vertebra; বহুবচন-vertebrae) বলে। কশেরুকাগুলো একে অপরের সাথে কোমলাছি নির্মিত সিমফাইসিস (symphysis) বা আন্তঃকশেরুকা চাকতি (intervertebral disc) দ্বারা সংযুক্ত হয়ে মেরুদণ্ড গঠন করে। প্রতি দুই কশেরুকার সংযোগস্থলের উভয় পাশে একটি করে ছিদ্র থাকে। এদের আন্তঃকশেরুকা ছিদ্র (intervertebral foramen) বলে। এসব ছিদ্র দিয়ে সুষুম্না মাঝ (spinal nerves) ও রক্তনালি প্রসারিত হয়। পুরুষের মেরুদণ্ড গড়ে 70 সেন্টিমিটার এবং মহিলাদের গড়ে 60 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়।

কশেরুকার প্রকারভেদ

মেরুদণ্ড বিভিন্ন আকৃতির 33টি কশেরুকা নিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান অনুযায়ী এদের নামকরণ করা হয়, যেমন-

কশেরুকার নাম	অবস্থান	সংখ্যা
১। সারভাইক্যাল	গ্রীবাদেশ	7 টি
২। থোরাসিক	বক্ষদেশ	12 টি
৩। লাম্বার	কঠিদেশ	5 টি
৪। স্যাক্রাল	শ্রোণিদেশ	5টি (=1টি স্যাক্রাম)
৫। কক্ষিক্রিয়াল	পুচ্ছদেশ	4টি (=1টি কক্ষিক্রিয়া)

পরিণত মানুষের পাঁচটি শ্রোণিদেশীয় বা স্যাক্রাম কশেরুকা একত্রে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ স্যাক্রাম (sacrum) এবং পুচ্ছদেশীয় চারটি কশেরুকা একত্রে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ কক্ষিক্রিয়া (coccyx) গঠন করে। মানবদেহের অঙ্গ গণনার সময় এদের প্রতিটিকে একটি অঙ্গ হিসেবে গণনা করা হয়। সেক্ষেত্রে কশেরুকার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় 26টি।

মেরুদণ্ডের কাজ: মেরুদণ্ড দেহের কেন্দ্রীয় স্থিতিস্থাপক অক্ষ গঠন করে। এটি সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) ও সুষুম্না মাঝকে (spinal nerves) পরিবেষ্টন করে সুরক্ষা প্রদান করে। এটি দেহের ওজন ধরে রাখে এবং দেহের সকল অঙ্গের প্রধান অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। এটি সকল অঙ্গীয় পেশি ও পর্ণকার সংযোগ তল সৃষ্টি করে। এটি দেহের নড়ন, অঙ্গভঙ্গি সৃষ্টি ও চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন দেয়।

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন

মেরুদণ্ডের সাংগঠনিক একক হলো কশেরুকা। মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের কশেরুকার গঠন বিভিন্ন রকম। তবে এদের সকলের গঠন প্রকৃতি একটি মৌলিক গঠনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ কশেরুকা নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত -

১। সেন্ট্রাম (Centrum): এটি কশেরুকার অক্ষীয় দিকে অবস্থিত একটি চোঙাকৃতির শক্ত ও মজবুত অঙ্গ। মানুষের কশেরুকা অ্যাসিলাস (acoelus) প্রকৃতির অর্থাৎ সেন্ট্রামের উভয়প্রান্ত সমতল। সেন্ট্রামে কতগুলো ছুদ্র ছিদ্র দেখা যায় যেগুলোর মধ্য দিয়ে রক্তনালি প্রবাহিত হয়।

২। নিউরাল ছিদ্র (Neural foramen): সেন্ট্রামের পৃষ্ঠদিকে অবস্থিত গোলাকার বা ডিখাকার ছিদ্রকে নিউরাল বা ভার্ট্রিব্রাল ছিদ্র (neural or vertebral foramen) বলে। এর মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড ও রক্তনালি প্রসারিত থাকে।

সারভাইক্যাল কশেরুকা (7)

থোরাসিক কশেরুকা (12)

লাম্বার কশেরুকা (5)

স্যাক্রাল কশেরুকা (5)

কক্ষিক্রিয়াল কশেরুকা (4)

চিত্র ৭.৩ মানব মেরুদণ্ড



৩। নিউরাল আর্চ (Neural arch): এটি কশেরুকার পৃষ্ঠীয় দিকে অবস্থিত একটি আংটির মতো গঠন বিশেষ। নিউরাল ছিদ্রকে ঘিরে অবস্থিত একজোড়া চ্যাপ্টা পাতের মতো অস্তি দিয়ে এটি গঠিত।

৪। নিউরাল প্রসেস বা স্পাইন (Neural process): নিউরাল আর্চ গঠনকারী দুটি অস্থিপাত নিউরাল ছিদ্রের পৃষ্ঠদেশে মিলিত হয়ে যে কাঁটার মতো গঠন সৃষ্টি করে তাকে নিউরাল প্রসেস বা নিউরাল স্পাইন বলে। নিউরাল প্রসেসের গোড়ার দুদিকের মজবুত অংশকে ল্যামিনা (lamina) বলে।

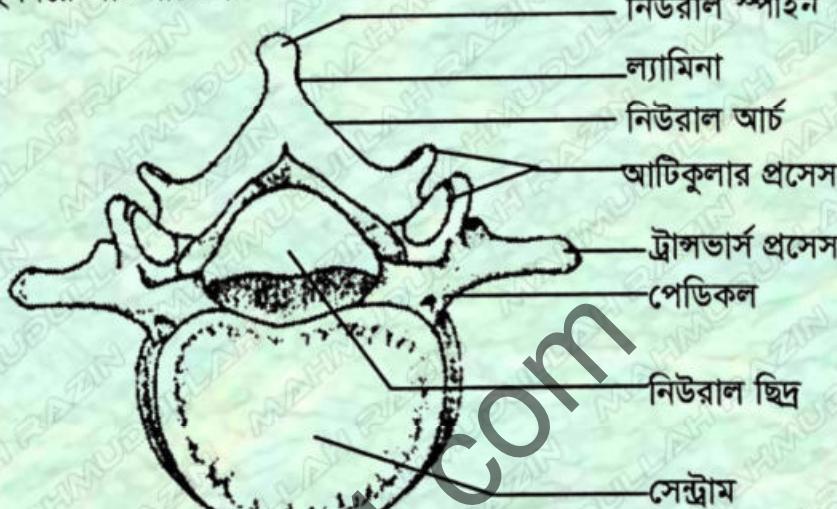
৫। ট্রান্সভার্স প্রসেস (Transverse process): কশেরুকার পৃষ্ঠদিকের দুইপার্শে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত দুটি প্রলম্বিত অস্তিকে ট্রান্সভার্স প্রসেস বা প্রবর্ধন বলে। দুটি পেডিকল (pedicle) দ্বারা এরা সেন্ট্রোমের সাথে যুক্ত থাকে।

৬। আর্টিকুলার প্রসেস (Articular process) বা জাইগাপোফাইসিস (Zygapophysis): একটি কশেরুকাতে স্কুল চামচ সদৃশ্য ৪টি সংযোগকারী প্রবর্ধন বা আর্টিকুলার প্রসেস থাকে। এদের দুটি নিউরাল আর্চের সম্মুখে এবং দুটি নিউরাল আর্চের পশ্চাতে অবস্থিত। সম্মুখের প্রবর্ধন দুটিকে প্রি-জাইগাপোফাইসিস (pre-zygapophysis) এবং পশ্চাতের প্রবর্ধন দুটিকে পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস (post-zygapophysis) বলে। একটি কশেরুকা পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস দ্বারা উহার পরবর্তী কশেরুকার প্রি-জাইগাপোফাইসিসের সাথে যুক্ত থাকে।

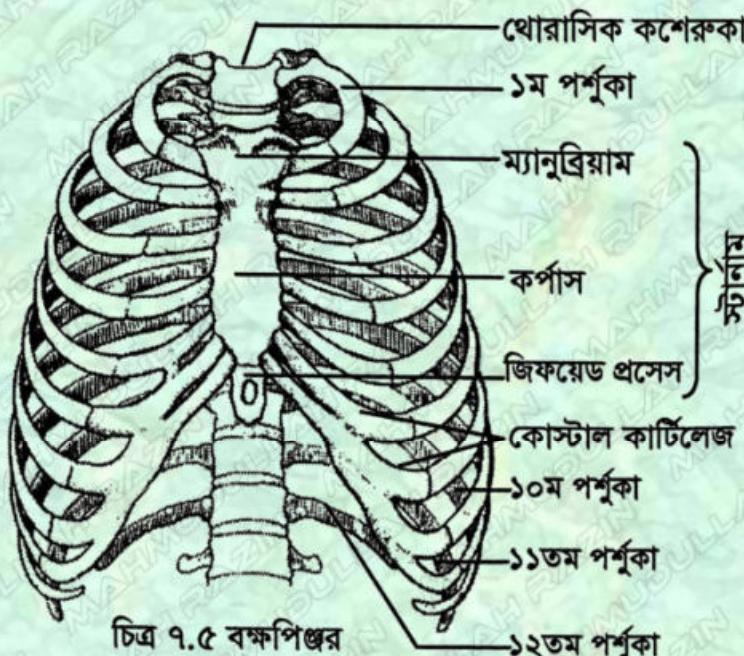
(গ) বক্ষপিণ্ড (Thoracic cage)

মানুষের বক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত অস্তি ও কোমলাস্থি নির্মিত 12টি থোরাসিক কশেরুকা, একটি উরফফলক বা স্টার্নাম ও 12 জোড়া পর্শুকা বা রিব সমন্বয়ে গঠিত যে খাঁচা বা পিণ্ডের থাকে তাকে বক্ষপিণ্ড বলে। বক্ষপিণ্ডের ব্যারেল আকৃতির। এর পশ্চাত সীমানা থোরাসিক কশেরুকা এবং পর্শুকার পেছনের অংশ দ্বারা, সম্মুখ সীমানা স্টার্নাম ও পর্শুকার সম্মুখ অংশ দ্বারা এবং পার্শ্ব সীমানা কেবল পর্শুকা দ্বারা গঠিত।

বক্ষপিণ্ডের কাজ: এটি শ্বসন ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে। এটি শ্বসনের সময় সংকোচিত ও প্রসারিত হয়ে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।



চিত্র ৭.৪ একটি আদম্য কশেরুকা



উপাঞ্চিক কঙ্কাল (Appendicular skeleton)

বক্ষ অস্থিচক্র (pectoral girdle), উর্ধ্ববাহুর অস্তি (forelimb), শ্রোণিচক্র (pelvic girdle) ও নিম্নবাহুর (hindlimbs) অস্থিসমূহ মানুষের উপাঞ্চিক কঙ্কাল গঠন করে।

(ক) বক্ষ অস্থিচক্র (Pectoral girdle)

মানবদেহের ক্ষেত্রে বক্ষ অঞ্চলে বক্ষ অস্থিচক্র অবস্থিত। একজোড়া ক্ষ্যাপুলা (scapula) এবং একজোড়া ক্ল্যাভিকল (clavicle) নিয়ে বক্ষ অস্থিচক্র গঠিত। বক্ষ অস্থিচক্র অগ্রপদকে ধারণ করে, দেহের উর্ধ্বাংশের অবকাঠামো গঠন করে এবং হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও অন্যান্য নরম অঙ্গদিকে সুরক্ষা প্রদান করে। (ক্ষ্যাপুলা ও ক্ল্যাভিকলের গঠন ব্যবহারিক অংশে বর্ণনা করা হয়েছে)

(খ) উর্ধ্ববাহু বা অগ্রপদের অঙ্গ (Bones of upper limb)

মানবদেহের ক্ষক্ষ অঞ্চল থেকে দুপাশে দুটি বাহু ঝুলে থাকে। এদের উর্ধ্ববাহু বলে। প্রতিটি উর্ধ্ববাহু ছোট-বড় ৩০টি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। উর্ধ্ববাহুতে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো থাকে-

১। হিউমেরাস (Humerus): উর্ধ্ববাহুর প্রথম অঙ্গকে হিউমেরাস বলে। এটি উর্ধ্ববাহুর সবচেয়ে বৃহৎ ও লম্বা অঙ্গ। হিউমেরাস একটি লম্বা শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্রিয়াল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

২। রেডিয়াস ও আলনা (Radius and Ulna): উর্ধ্ববাহুর মধ্যবর্তী অংশ রেডিয়াস ও আলনা নামক দুটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। অঙ্গ দুটি উভয় প্রান্তে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। আলনা অন্তর্দিকে (দেহের দিকে) এবং রেডিয়াস বহির্দিকে অবস্থান করে।

৩। কার্পাল অঙ্গ (Carpal bones): প্রতি সারিতে চারটি করে দুই সারিতে মোট ৮টি ক্ষুদ্র কার্পাল অঙ্গ অর্ধ-চন্দ্রাকৃতিতে সজ্জিত থেকে হাতের কঞ্জি (wrist) গঠন করে। উপরের সারির কার্পাসগুলো হলো- Scaphoid, Lunate, Triquetal, Pisiform। নিচের সারির কার্পাল অঙ্গগুলো হলো- Trapezium, Trapezoid, Capitate, Hamate।

৪। মেটাকার্পাল অঙ্গ (Metacarpal bones): এক সারিতে অবস্থিত পাঁচটি ক্ষুদ্র লম্বাকৃতির মেটাকার্পাল অঙ্গ হাতের করতল (plum) গঠন করে।

৫। ফ্যালানজেস (বহুচন-Phalanges; একচন-phalanx): হাতের আঙুলের অঙ্গগুলোকে ফ্যালানজেস বলে। বৃক্ষাঙ্গলে দুটি এবং অন্যান্য আঙুলে ৩টি করে প্রতি বাহুতে মোট 14টি ফ্যালানজেস বিদ্যমান।

(গ) শ্রোণিচক্র (Pelvic girdle)

মানুষের নিতম্বীয় অঞ্চলে (pelvic region) অবস্থিত দুটি সম আকৃতির অঙ্গ নিয়ে শ্রোণিচক্র গঠিত। অঙ্গের প্রতিটিকে হিপ বোন (hip bone) বা ইনোমিনেট অঙ্গ (innominate bone) বলে। অর্থাৎ দুটি ইনোমিনেট অঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে শ্রোণিচক্র গঠন করে। প্রতিটি ইনোমিনেট অঙ্গ আবার তিনটি অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, যথা- ইলিয়াম (ilium), ইক্সিয়াম (ischium) ও পিউবিস (pubis)। শ্রোণিচক্র নিম্নবাহু বা পশ্চাত্পদের অঙ্গসমূহ ধারণ করে, নিতম্বের আকৃতিদান করে এবং ত্বী জননতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।

শ্রোণিচক্রের প্রতিপার্শ্বে ইলিয়াম, ইক্সিয়াম ও পিউবিস অঙ্গের মিলনস্থলে একটি অগভীর গর্ত সৃষ্টি হয়। একে অ্যাসিটাবুলাম (acetabulum) বলে। অ্যাসিটাবুলামে নিম্নবাহুর ফিমারের মন্তক অবস্থান করে। ইলিয়াম ও পিউবিস অঙ্গের মাঝে প্রায় গোলাকৃতির একটি ফোকর থাকে। একে অবটুরেট ফোরামেন (obturator foramen) বলে।

(ঘ) নিম্নবাহুর অঙ্গ বা পশ্চাত্পদের অঙ্গ (Bones of hindlimbs)

মানবদেহের শ্রোণি অঞ্চলের দুপাশে দুটি বাহু যুক্ত থাকে। এদের নিম্নবাহু বা পশ্চাত্ব পদ বলে। প্রতিটি নিম্নবাহু ছোট-বড় ৩০টি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। নিম্নবাহুতে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো থাকে-

১। ফিমার (Femur): নিম্নবাহুর প্রথম অঙ্গের নাম ফিমার। এটি দেহের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মজবুত অঙ্গ। ফিমার উপরের দিকে শ্রোণিচক্রের অ্যাসিটাবুলামের সাথে যুক্ত থাকে এবং নিচের দিকে টিবিয়া ও ফিবুলা প্যাটেলার সাথে হাঁটু সঙ্কে গঠন করে।

২। টিবিয়া ও ফিবুলা (Tibia and Febula): নিম্নবাহুর মধ্যবর্তী অংশ টিবিয়া ও ফিবুলা নামক দুটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। অঙ্গ দুটির উভয় প্রান্তে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। টিবিয়া অন্তর্দিকে (দেহের দিকে) এবং ফিবুলা বহির্দিকে অবস্থান করে।

৩। টারসাল অঙ্গ (Tarsal bones): পায়ের গোড়ালি ও পদতলের পশ্চাত্ব অর্ধাংশ গঠনকারী অঙ্গসমূহের নাম টারসাস (tarsus)। পাঁচ ধরনের ৮টি টারসাস তিন সারিতে সজ্জিত থাকে। টারসাসগুলো হলো- Talus (1), Calcaneus (1), Cuboid (1), Navicular (1), Cuneiform (3)।

৪। মেটাটারসাল অঙ্গ (Metatarsal bones): এক সারিতে অবস্থিত পাঁচটি ক্ষুদ্র লম্বাকৃতির মেটাটারসাস (metatarsus) পদতলের সম্মুখ অর্ধাংশ গঠন করে।

৫। ফ্যালানজেস (Phalanges): পায়ের আঙুলের অঙ্গগুলোকে ফ্যালানজেস বলে। বৃক্ষাঙ্গলে দুটি এবং অন্যান্য আঙুলে তিনটি করে মোট 14টি ফ্যালানজেস বিদ্যমান।

৭.২ অস্তি ও তরুণাস্তি (Bone and Cartilage)

অস্তি (Bone)

ঘন, অনমনীয়, অস্থিত্ত্বাপক, জৈব-অজৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ম্যাট্রিক্স ও বিভিন্ন ধরনের অস্তিকোষ নিয়ে গঠিত যে কঠিন প্রকৃতির যোজক কলা কঙ্কালতত্ত্বের অধিকাংশ গঠন করে তাকে অস্তি বলে। এগুলো মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত, কঠিন ও ভঙ্গুর প্রকৃতির কলা। এ কলার ম্যাট্রিক্সের 40% জৈব পদার্থ এবং 60% অজৈব খনিজ লবণ। জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্ত্র ও মিউকোপলিস্যাকারাইড (অসেইন) এবং অজৈব খনিজ লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট উল্লেখযোগ্য। ম্যাট্রিক্সে ক্যালসিয়াম লবণ থাকাতে অস্তি শক্ত হয়। ম্যাট্রিক্সে প্রধানত তিনি ধরনের অস্তিকোষ থাকে, যেমন-অস্টিওব্লাস্ট (osteoblast), অস্টিওক্লাস্ট (osteoclast) এবং অস্টিওসাইট (osteocyte)।

অস্তিতে প্রধানত দুধরনের খনিজায়িত কলা থাকে, যথা- কর্টিক্যাল কলা ও ক্যানসেলিয়াস কলা। অস্তিতে আরো যেসব কলা থাকে সেগুলো হলো: অস্তিমজ্জা, পেরিঅস্টিয়াম, এভোস্টিয়াম, স্নায়ু, রক্তনালি ও কোমলাস্তি। পেরিঅস্টিয়াম (periosteum) কলার পাতলা আবরণ দ্বারা অস্তি আবৃত থাকে। এভোস্টিয়াম (endosteum) অস্তির অভ্যন্তরের মেডুলারি গহ্বরের আবরণ গঠন করে। শার্পে তন্ত্র (Sharpey's fibers) দ্বারা পেরিঅস্টিয়াম অস্তির সাথে লেগে থাকে। পেরিঅস্টিয়ামে স্নায়ুপ্রাণ থাকায় অস্তিগুলো সংবেদী হয়।

দেহে অস্তির গঠন প্রক্রিয়াকে অসিফিকেশন (ossification) বলে। শিশু মাত্রগতে থাকা অবস্থায় ইন্ট্রামেম্ব্রেনাস ও এভোকন্ড্রাল অসিফিকেশনের মাধ্যমে অস্তির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মানবদেহের সবচেয়ে বড় অস্তি হলো উরুর অস্তি বা ফিমার (femur) এবং সবচেয়ে ছোট অস্তি হলো মধ্যকর্ণের স্টেপিস (stapes)।

অস্তির কাজ:

অস্তি মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন-

- ১। অস্তি দেহের দৃঢ় ও মজবুত স্থাপত্য কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি প্রদান করে।
- ২। দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি যেমন- মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্বাকাও প্রভৃতি অস্তি নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
- ৩। দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন অস্তিতে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।
- ৪। অস্তিসক্ষি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয় দ্বারা অস্তি নির্মিত কঙ্কালতত্ত্ব প্রাণীর চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।
- ৫। অস্তির ভেতরে অবস্থিত লোহিত অস্তিমজ্জা (red bone marrow) থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। পীত অস্তিমজ্জা সঞ্চিত চর্বির আধার হিসেবে কাজ করে।
- ৬। কিছু ক্রটিপূর্ণ ও ব্যাস্ক লোহিত রক্তকণিকা অস্তিমজ্জার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেহের কিছু অবাস্থিত বস্তু ও ভারী ধাতব পদার্থ (heavy metals) অস্তির মাধ্যমে দেহ হতে বহিস্থৃত হয়।
- ৭। কিছু ক্ষারীয় লবণ (alkaline salts) শোষণ বা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে অস্তি দেহের pH রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- ৮। ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস জাতীয় খনিজলবণ অস্তিতে সঞ্চিত হয়। এগুলো দেহে অজৈব পদার্থের ভাওর হিসেবে কাজ করে। দেহের প্রায় 97% ক্যালসিয়ামই অস্তিতে জমা থাকে।
- ৯। অস্তির রেটিক্যুলো এভোথেলিয়াল তন্ত্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।
- ১০। কঙ্কালতত্ত্বের সবচেয়ে ছোট অস্তি অস্তিকর্ণের মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস শ্রীবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- ১১। অস্তিকোষ থেকে অস্টিওক্যালসিন (osteocalcin) হরমোন ক্ষরিত হয় যা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ ও দেহে চর্বি সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করে।

অস্তির প্রকার: উপাদানের ঘনত্ব, দৃঢ়তা ও গঠনের ভিত্তিতে অস্তি দুপ্রকার, যথা- নিরেট অস্তি ও স্পেজি অস্তি।

১। নিরেট অস্তি (Compact bone) বা কর্টিকেল অস্তি (Cortical bone): এগুলো দৃঢ়, নিরেট ও ভঙ্গুর প্রকৃতির অস্তি। মানবদেহের কঙ্কালতত্ত্বের মোট ওজনের প্রায় 80% নিরেট অস্তি। মানুষের উপাস্থিক কঙ্কালের অধিকাংশ অস্তি যেমন- হিউমেরাস, রেডিও আলনা, ফিমার, টিবিয়াস, ফিবুলা ইত্যাদি নিরেট প্রকৃতির। এ ধরনের অস্তির কেন্দ্রে একটি নলাকৃতির

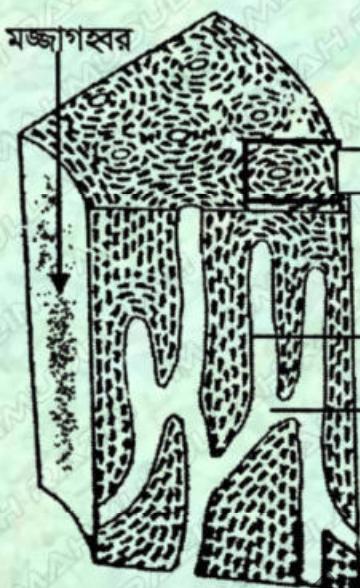
মজ্জাগহ্বর (marrow cavity) থাকে যা একটি তন্তুময় এন্ডোস্টিয়াম (endosteum) আবরণী দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। মজ্জাগহ্বরে লোহিত মজ্জা বা শ্বেতমজ্জা থাকে। অস্থির মজ্জাগহ্বরকে ঘিরে অসংখ্য একক গঠন গাদাগাদি করে অবস্থান করে। এসব একক গঠনকে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) বা অস্টিওন (osteon) বলে।

হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system)

হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একক। আবিষ্কারক Clopton Havers (1657-1702) এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ও 0.2 মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট চোঙাকৃতির গঠন বিশেষ। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন প্রধান চারটি অংশ নিয়ে গঠিত:

(ক) হ্যাভারসিয়ান নালি (Haversian canal): প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের কেন্দ্রে একটি নালি থাকে। একে হ্যাভারসিয়ান নালি বলে। এ নালির মধ্য দিয়ে শিরা, ধমনি, লসিকানালি ও স্নায়ুতন্ত্র প্রসারিত হয়।

(খ) ল্যামিলি (বহুচন-lamellae, একবচন-lamella): অস্থির ম্যাট্রিক্স হ্যাভারসিয়ান নালিকে কেন্দ্র করে 5-15টি স্তরে সজ্জিত থাকে। এসব স্তরকে ল্যামিলি বলে। এর প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস খণ্ডিজ লবণ এবং কোলাজেন তন্ত্র।



চিত্র ৭.৬ নিরেট অস্থির অংশ



চিত্র ৭.৭ হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র

(গ) ল্যাকুনি (বহুচন-lacuni, একবচন-lacuna):

ল্যামেলিসমূহের সংযোগস্থলে ল্যাকুনি নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থান থাকে। এসব ফাঁকা স্থানে অস্টিওসাইট বা অস্থিকোষ অবস্থান করে।

(ঘ) ক্যানালিকুলি (বহুচন-canaliculi, একবচন-canaliculus): ল্যাকুনার চতুর্দিকে সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ক্যানালিকুলি নামক কতগুলো নালিকা বিস্তৃত হয়ে ল্যাকুনিগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে। এসব নালিকার মাধ্যমে অস্থিতে পৃষ্ঠি পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত হয়।

অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো একে অপরের সাথে আড়াআড়ি নালি দ্বারা যুক্ত থাকে। এসব আড়াআড়ি নালিগুলোকে ভকম্যানস নালি (Volkmann's canal) বলে। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে কঠিন ম্যাট্রিক্স ও অস্টিওসাইট বিদ্যমান থেকে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।



চিত্র ৭.৮ অস্থির লম্বচেদ

২। স্পঞ্জি অস্থি (Spongy bone):

নিরেট অস্থির অভ্যন্তরে বিদ্যমান স্পঞ্জি অস্থি অপেক্ষাকৃত হালকা, অসংখ্য কুঠুরিযুক্ত স্পঞ্জের ন্যায়। এসব অস্থির গঠন স্পঞ্জি বা মৌচাকের মতো বলে এদেরকে ক্যানসেলাস বা ট্রাবেক্যুলাৰ অস্থি বলা হয়। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় 20% স্পঞ্জি অস্থি। স্পঞ্জি অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি এককে ট্রাবেক্যুলা (trabecula) বলে যা ল্যামিলি, অস্টিওসাইট, ল্যাকুনি ও ক্যানালিকুলির সমষ্টিয়ে গঠিত। ট্রাবেক্যুলাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান লোহিত অস্থিমজ্জা দ্বারা পূর্ণ থাকে। অস্থি আবরণ পেরিঅস্টিয়াম থেকে রক্তনালিকা ট্রাবেক্যুলাতে প্রবেশ করে অস্থির কোষসমূহকে পুষ্টি সরবরাহ করে। স্পঞ্জি অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণের পরিমাণ কম থাকে। এতে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না। স্তন্যপায়ীদের করোটিকা, চ্যাপ্টা হাড়, বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ এবং পাখিদের সকল অস্থি স্পঞ্জি ধরনের। শিশুদের প্রায় সকল অস্থিই স্পঞ্জি প্রকৃতিৰ।

নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে পার্থক্য

নিরেট অস্থি	স্পঞ্জি অস্থি
১। এদের কর্টিকেল অস্থি বলা হয়।	১। এদের ট্রাবেক্যুলার অস্থি বলা হয়।
২। নিরেট অস্থি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র নামক এককে গঠিত।	২। স্পঞ্জি অস্থি ট্রাবেক্যুলা নামক এককে গঠিত।
৩। নিরেট অস্থি ঘন, ভারী ও মজবুত ধরনের।	৩। স্পঞ্জি অস্থি পাতলা ও হালকা ধরনের।
৪। এটি অস্থির বাইরের প্রধান স্তর গঠন করে।	৪। এটি নিরেট অস্থির ভেতরে অবস্থান করে।
৫। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় 80%	৫। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় 20%
নিরেট অস্থি।	স্পঞ্জি অস্থি।

তরঞ্জাস্তি বা কোম্লাস্তি (Cartilage)

এগুলো যথেষ্ট মজবুত, অভঙ্গুর, শক্ত এবং টান ও ঢাপ সহনীয় যোজক কলা। মানুষের নাক ও কান, হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তক, বিভিন্ন অস্থিসঞ্চি, শ্বাসনালি, পর্শুকার প্রান্তভাগ, ইপিগ্লাটিস, আন্তঃকশেরূপকা চাকতি ইত্যাদিতে তরঞ্জাস্তি থাকে। সকল মেরুদণ্ডীর জ্বণীয় কঙ্কাল এবং কন্ড্রিকুলিস জাতীয় মাছের সমগ্র অন্তঃকঙ্কাল তরঞ্জাস্তি দিয়ে গঠিত। তরঞ্জাস্তির ম্যাট্রিক্সকে কন্ড্রিন (chondrin) এবং কোষসমূহকে কন্ড্রোসাইট (chondrocytes) বলা হয়। ম্যাট্রিক্স অর্ধ কঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। এতে কোলাজেন, ইলাস্টিন প্রোটিন নির্মিত বিভিন্ন তন্ত্র, প্রোটিওগ্লাইকেন ভিত্তি পদার্থ এবং কন্ড্রোসাইটগুলো এককভাবে বা গুচ্ছকারে অবস্থান করে। ম্যাট্রিক্সে কন্ড্রোসাইটের গুচ্ছকে ল্যাকুনা (lacuna) বলে।

তরঞ্জাস্তির বৈশিষ্ট্য

- ১। তরঞ্জাস্তিতে কোন রক্তনালি বা লসিকা প্রবাহ থাকে না এবং এর ম্যাট্রিক্সে ব্যাপন পদ্ধতিতে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়। এজন্য এদের ক্ষত সারাতে অনেক সময় লাগে।
- ২। তরঞ্জাস্তিতে কোন স্নায়ু প্রবাহ না থাকায় এরা সংবেদনহীন।
- ৩। তরঞ্জাস্তি পেরিকন্ড্রিয়াম (perichondrium) নামক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।
- ৪। তরঞ্জাস্তির ম্যাট্রিক্সে ক্যালসিয়াম লবণ থাকে না। এর পরিবর্তে এতে কন্ড্রয়টিন (chondroitin) নামক পদার্থ থাকে যা তরঞ্জাস্তিকে নমনীয়তা প্রদান করে।
- ৫। কখনো তরঞ্জাস্তিতে ক্যালসিয়াম জমা হলে এর কোষগুলো মরে যায় এবং তরঞ্জাস্তি ধীরে ধীরে অস্থির মতো গঠন করে।

তরঞ্জাস্তির প্রকারভেদ: ম্যাট্রিক্সের গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী তরঞ্জাস্তি চার ধরনের, যথা-

- ১। হায়ালিন তরঞ্জাস্তি (Hyaline cartilage): এ তরঞ্জাস্তির ম্যাট্রিক্স স্বচ্ছ বা হালকা নীলাভ, দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক, নমনীয় ও সমস্তু। এতে কোনো তন্ত্র থাকে না। পূর্ণাঙ্গ মেরুদণ্ডীদের শ্বাসনালি, নাক, পর্শুকার প্রান্তভাগ, অস্থিসঞ্চিস্থল এবং সকল মেরুদণ্ডীর জ্বণীয় কঙ্কাল হায়ালিন তরঞ্জাস্তি নিয়ে গঠিত।

২। পীত তন্ত্রময় তরংশাস্থি (Yellow fibrous cartilage): এ তরংশাস্থির ম্যাট্রিক্স অস্থচছ, দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক, নমনীয় ও সমস্তু। এতে হলুদ বা পীত বর্ণের, শাখাবিত ও স্থিতিস্থাপক তন্ত্র জালিকার ন্যায় বিন্যস্ত থাকে। কর্ণছত্র, স্বরযন্ত্র, ইপিগ্লুটিস, নাসিকার অগ্রভাগ ইত্যাদিতে পীত তন্ত্রময় তরংশাস্থি থাকে।

৩। শ্বেত তন্ত্রময় তরংশাস্থি (White fibrous cartilage): এ তরংশাস্থির ম্যাট্রিক্সে সাদা বা শ্বেত বর্ণের, অশাখ, অস্থিস্থাপক, কোলাজেন নির্মিত তন্ত্র সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। পিউবিস সিমফাইসিস, অস্থি ও টেনডনের সংযোগস্থল, আন্তঃকশেরক চাকতি ইত্যাদিতে শ্বেত তন্ত্রময় তরংশাস্থি থাকে।

৪। ক্যালসিফায়েড বা চূনময় তরংশাস্থি (Calcified cartilage): এ তরংশাস্থির ম্যাট্রিক্সে ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা হয়ে বিশেষ ধরনের শক্ত অবস্থা গঠন করে। হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এ ধরনের তরংশাস্থি পাওয়া যায়।



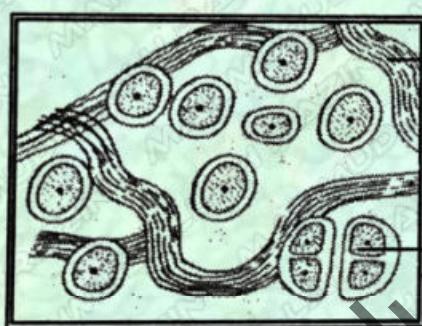
কন্ড্রোসাইট
ম্যাট্রিক্স

হায়ালিন তরংশাস্থি

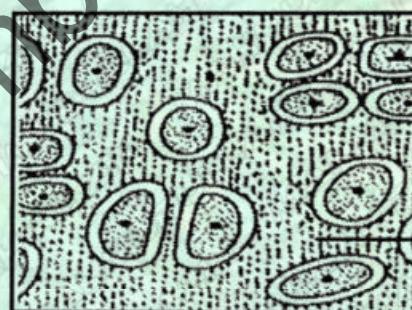


কন্ড্রোসাইট
পীত তন্ত্র

পীত তন্ত্রময় তরংশাস্থি



শ্বেত তন্ত্রময় তরংশাস্থি
কন্ড্রোসাইট



কন্ড্রোসাইট
ক্যালসিয়াম কার্বনেট

ক্যালসিফায়েড তরংশাস্থি

চিত্র: ৭.৯ বিভিন্ন ধরনের তরংশাস্থি

তরংশাস্থির কাজ:

- ১। তরংশাস্থি বিভিন্ন অঙ্গের চাপ ও টান প্রতিরোধ করে।
- ২। এগুলো বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি গঠন করে।
- ৩। অস্থিসন্ধিতে এরা দৃঢ় অস্থিকে সংযুক্ত হতে সহায়তা করে এবং অস্থির প্রান্তভাগকে ঘর্ষণের হাত হতে রক্ষা করে।
- ৪। এগুলো টেনডন ও লিগামেন্টকে অস্থির সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করে।
- ৫। তরংশাস্থিতে লুব্রিসিন (Lubricin) নামক গ্লাইকোপোটিন থাকে যা কঙ্কালতন্ত্রে জৈব লুব্রিকেটর হিসেবে কাজ করে।
- ৬। এগুলো মেরুদণ্ডীদের জীবনীয় কক্ষাল ও কন্ড্রিকথিস জাতীয় মাছের আন্তঃকক্ষাল গঠন করে।

তরংশাস্থি ও অস্থির মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	তরংশাস্থি	অস্থি
১। গঠন	অর্ধকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিক্স এবং বিভিন্ন তন্ত্র ও কোষ নিয়ে গঠিত যোজক কলা।	কঠিন, অনমনীয়, অস্থিস্থাপক ম্যাট্রিক্স এবং বিভিন্ন অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত যোজক কলা।
২। প্রকৃতি	স্থিতিস্থাপক।	অস্থিস্থাপক।
৩। আবরণ	পেরিকন্ড্রিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে।	পেরিঅস্টিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে।

তুলনীয় বিষয়	তরলাছি	অছি
৪। ম্যাট্রিক্স	ম্যাট্রিক্সে গোলাকৃতির কঙ্গোব্রাস্ট ও কঙ্গোসাইট কোষ থাকে।	ম্যাট্রিক্সে জালকাকৃতির অস্টিওব্রাস্ট ও অস্টিওক্লাস্ট কোষ থাকে।
৫। অস্থিমজ্জা	অস্থিমজ্জা থাকে না।	অধিকাংশক্ষেত্রে অস্থিমজ্জা থাকে।
৬। হ্যাভারসিয়ান তত্ত্ব	অনুপস্থিতি।	বিদ্যমান।
৭। রক্ত কণিকা	উৎপাদন করে না।	উৎপাদন করে।
৮। স্তন্যপায়ীদের দেহে অবস্থান	বিভিন্ন অস্থিপ্রান্ত, নাক, কান, শ্বাসনালি, অস্থিসঞ্চি, আস্তংকশেরংকা চাকতি ইত্যাদিতে।	স্তন্যপায়ীদের অস্তংকক্ষালের অধিকাংশই অস্থি দ্বারা গঠিত।
৯। কাজ	বিভিন্ন অঙ্গের চাপ ও টান প্রতিরোধ করে।	দেহের দৃঢ়তা প্রদান, বিভিন্ন অঙ্গের ভারবহন এবং রক্তকণিকা উৎপাদন করে।

ব্যবহারিক/পরীক্ষণ: মানবদেহের বিভিন্ন অছি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

কার্যপদ্ধতি: মানবদেহের কক্ষাল পাওয়া না গেলে মডেল অছি এখন বাজারে পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি অংশের নিম্নরূপ পৃথক পৃথক চিত্র আঁকতে হবে এবং শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লেখতে হবে।

১। করোটি (Skull)

- আটটি অছি নিয়ে করোটিকা এবং 14টি অস্থি নিয়ে মুখমণ্ডল গঠিত।

- করোটিকার অস্থিগুলো সূচার সঞ্চির মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে।

- সম্মুখ-উর্ধ্ব দিকে পেয়ালাকৃতির ফ্রন্টাল অছি বিদ্যমান।

- ফ্রন্টালের পেছনে অনিয়মিত চতুর্কোণাকৃতির একজোড়া প্যারাইটাল অছি বিদ্যমান।



চিত্র ৭.১০ করোটি

- দুপাশে দুটি টেম্পোরাল অছি বিদ্যমান।
- পশ্চাত ও অস্তর্ভাগে অক্সিপিটাল অছি অবস্থিত যার কেন্দ্রে ফোরামেন ম্যাগনাম নামক একটি বৃহৎ ছিদ্র বিদ্যমান।
- দুটি ম্যান্ডিবল সম্বয়ে মুখমণ্ডলের উর্ধচোয়াল গঠিত।
- একটি ম্যান্ডিবল অছি নিম্নচায়াল গঠন করে।

২। ম্যান্ডিবল (Mandible)

- এটি করোটির সর্ববৃহৎ, মজবুত ও সর্বনিম্নের অযুগ্ম অছি।

- এটি নিম্নচোয়াল গঠনকারী করোটির একমাত্র সম্বলনক্ষম অছি।

- এটি একটি U আকৃতির মূলদেহ এবং দুটি চওড়া রেমি (বহুচন -rami; একবচন - ramus) নিয়ে গঠিত।

- মূলদেহ বেস ও অ্যালভিওলার প্রসেস নিয়ে গঠিত, অ্যালভিওলার প্রসেসে দাঁতের গোড়া প্রোথিত থাকে।

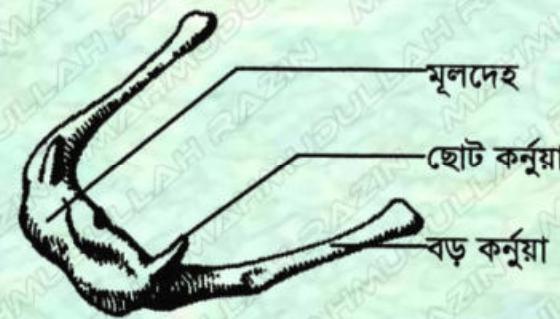


চিত্র ৭.১১ ম্যান্ডিবল

- প্রতিটি র্যামাস হাতলের মতো অংশ; এতে করোনয়েড ও কন্ডাইলয়েড নামক দুটি প্রবর্ধন এবং একটি ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র থাকে।

৩। হাইঅয়েড অস্থি (Hyoid bone)

- হাইঅয়েড অস্থি একটি U আকৃতির অস্থি।
- এটি একটি অনিয়ত, লম্বাকৃতির মূলদেহ এবং দুইজোড়া কাঁটা বা কর্ণুয়া (cornua) নিয়ে গঠিত।
- একজোড়া কর্ণুয়া ছোট, এরা পাশ্বীয়ভাবে অবস্থান করে।
- অন্যজোড়া কর্ণুয়া বড় এবং পশ্চাত্তিকে অবস্থান করে।



চিত্র ৭.১২ হাইঅয়েড অস্থি

৪। অ্যাটলাস (Atlas) বা

১ম সারভাইক্যাল কশেরুকা

- অনিয়ত আংটির মতো কশেরুকা।
- সম্মুখ ও পশ্চাত নিউরাল আর্চ এবং দুটি পাশ্বীয় অস্থিপিণ্ড নিয়ে গঠিত।
- সেন্ট্রাম ও নিউরাল স্পাইন অনুপস্থিত।
- নিউরাল ছিদ্র বৃহৎ।
- ট্রাঙ্গভার্স প্রসেস লম্বা ও মজবুত।

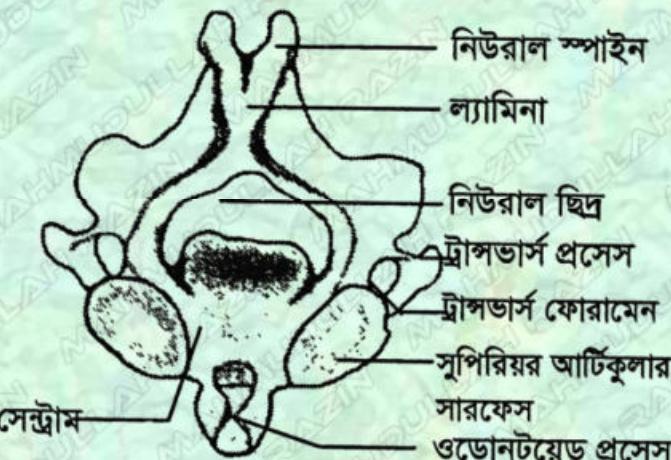


চিত্র ৭.১৩ অ্যাটলাস

৫। অ্যাক্সিস (Axis)

বা ২য় সারভাইক্যাল কশেরুকা

- সেন্ট্রাম ক্ষুদ্র; এর উপর অংশ লম্বা কনিক্যাল আকৃতির ওডোন্টয়েড প্রসেস গঠন করে।
- নিউরাল ছিদ্র বড় ও ত্রিকোণাকার।
- পেডিকল পুরু ও মজবুত; ল্যামিনা লম্বা ও পুরু।
- ট্রাঙ্গভার্স প্রসেস খাটো ও ভৌতা।
- নিউরাল স্পাইন বৃহৎ ও দ্বিপারিত।
- প্রি-জাইগাপোফাইসিসে গোলাকার ও সামান্য উত্তল অংশ সুপিরিয়র আর্টিকুলার সারফেস থাকে।

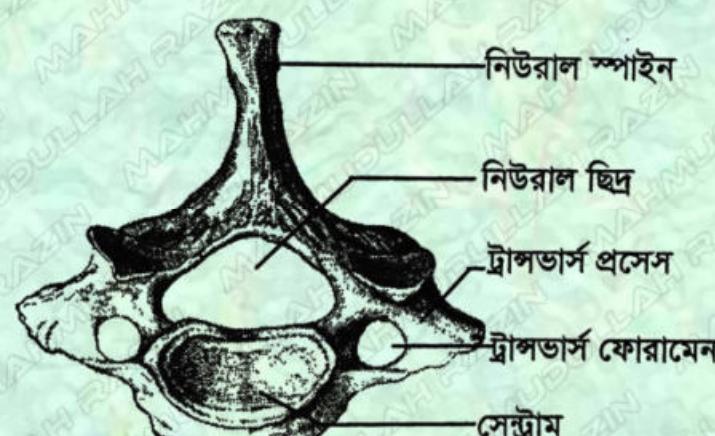


চিত্র ৭.১৪ অ্যাক্সিস

৬। ৭ম সারভাইক্যাল কশেরুকা বা ভার্ট্রিয়া প্রমিন্যাল

(Vertebra prominens)

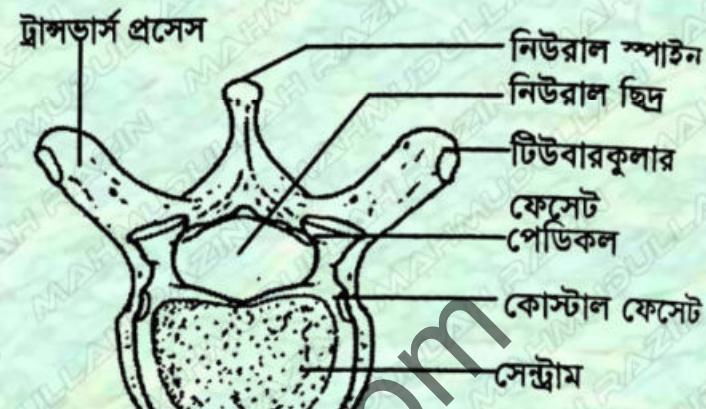
- নিউরাল স্পাইন লম্বা, পুরু এবং উলমিক।
- ট্রাঙ্গভার্স প্রসেস বৃহৎ ও খাটো, ট্রাঙ্গভার্স ফোরামেন ক্ষুদ্র।
- ট্রাঙ্গভার্স ফোরামেনের পশ্চাত অংশে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট টিউবারকল থাকে।
- ট্রাঙ্গভার্স ফোরামেনের সম্মুখ অংশ সরু ও খাটো টিউবারকল গঠন করে।



চিত্র ৭.১৫ ভার্ট্রিয়া প্রমিন্যাল

৭। বক্ষদেশীয় বা থোরাসিক কশেরুকা (Thoracic vertebrae)

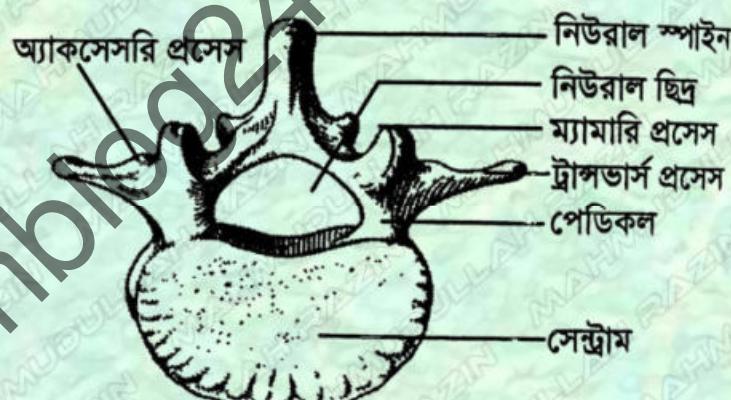
- সেন্ট্রাম চোঙাকৃতির বা হৎপিণি আকৃতির।
- সেন্ট্রামের দুপাশে দুটি কোস্টাল ফেসেট (costal facet) থাকে যেখানে পর্শুকার মস্তক অংশ সংযুক্ত থাকে।
- নিউরাল ছিদ্র স্ফুর্দ্র ও গোলাকার।
- পেডিকল পশ্চাত্তিকে নির্দেশিত; ল্যামিনা ছোট, চওড়া এবং পুরু।
- নিউরাল স্পাইন লম্বা, সরু ও নিচের দিকে নির্দেশিত।



চিত্র ৭.১৬ বক্ষদেশীয় কশেরুকা

৮। কটিদেশীয় বা লাঘার কশেরুকা (Lumber vertebrae)

- সেন্ট্রাম বৃহৎ, মজবুত এবং সমূখ-পশ্চাত হতে পার্শ্বভাবে বড়।
- কোস্টাল ফ্যাসেট এবং ট্রাঙ্গুলার্স ফোরামেন অনুপস্থিত।
- নিউরাল স্পাইন চতুর্কোণাকৃতির এবং উল্লম্বিক।
- নিউরাল ছিদ্র বৃহৎ ও ত্রিকোণাকৃতির।
- পেডিকল খাটো এবং মজবুত, ল্যামিনি খাটো ও চওড়া।
- ট্রাঙ্গুলার্স প্রসেসে অ্যাক্সেসরি প্রসেস এবং প্রিজাইগাপোফাইসিসে ম্যামারি প্রসেস বিদ্যমান।



চিত্র ৭.১৭ লাঘার কশেরুকা

৯। স্যাক্রাম (Sacrum)

মানুষের শ্রোণি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের ৫টি কশেরুকা মিলিত হয়ে একটি একক ত্রিকোণাকার স্যাক্রাম (sacrum) গঠন করে।



চিত্র ৭.১৮ স্যাক্রাম-অক্ষীয় দৃশ্য



চিত্র ৭.১৯ স্যাক্রাম-পৃষ্ঠীয় দৃশ্য

- এটি একটি বৃহৎ ত্রিকোণাকার অস্তি।
- পঞ্চম স্যাক্রাল কশেরুকা এপেক্স গঠন করে যার একটি ডিম্বাকৃতির ফ্যাসেটে কক্ষিত্ব যুক্ত হয়।
- সকল সেন্ট্রাম মিলিত হয়ে বেস গঠন করে যার অগ্র-অক্ষভাগে একটি স্যাক্রাল প্রমোন্টরি নামক প্রবর্ধন থাকে।
- সকল ট্রাঙ্গুলার্স প্রসেস মিলিত হয়ে স্যাক্রামের পার্শ্বদেশে ‘স্যাক্রাল আলা (sacral ala)’ গঠন করে।
- সকল নিউরাল ছিদ্র মিলিত হয়ে ত্রিকোণাকৃতির স্যাক্রাল নালি গঠন করে।
- স্যাক্রামের পৃষ্ঠ-অক্ষদেশ বরাবর চারজোড়া স্যাক্রাল ছিদ্র বিদ্যমান।
- সকল নিউরাল স্পাইন মিলিত হয়ে স্যাক্রামের পৃষ্ঠদিকে একটি মধ্যগ স্যাক্রাল ক্রেস্ট গঠন করে।

- পঞ্চম কশেরুকার পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস স্যাক্রাল কর্ণুয়া গঠন করে।

১০। কক্ষিক্র বা পুছদেশীয় কশেরুকা (Coccyx)

৩-৫টি কক্ষিজিয়াল কশেরুকা একত্রে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ ধরনের ত্রিকোণাকার ক্ষুদ্র কক্ষিক্র গঠন করে। এটি কোকিল বা Cuckoo এর ঠোঁট সদৃশ্য হওয়ায় এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

- এটি একটি ক্ষুদ্র ও ত্রিকোণাকার অস্থি খণ্ড।
- প্রথম কশেরুকা মূলদেহ গঠন করে; এর সম্মুখ দিকে একটি ডিম্বাকার ফ্যাসেট থাকে যার সাথে স্যাক্রাম সংযুক্ত থাকে।
- এর পৃষ্ঠ-পার্শ্বদিকে দুটি আর্টিকুলেট কর্ণ থাকে।
- কেবল প্রথম কশেরুকাতে ক্ষয়প্রাণ ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখা যায়।
- শেষ কশেরুকা ক্ষুদ্র, গোলাকৃতির এপেক্স গঠন করে।

১১। উরঘফলক বা স্টোর্নাম (Sternum)

- এটি একটি লম্বা ও চ্যাপ্টা অস্থি।
- এটি সম্মুখ বক্ষপ্রাচীরের মধ্য অংশ গঠন করে।
- এর গড় দৈর্ঘ্য পুরুষে 17 সেন্টিমিটার, স্ত্রীতে কিছুটা কম।
- এটি উপরের ত্রিকোণাকার ম্যানুব্রিয়াম, মাঝের লম্বাকৃতির কর্পাস এবং প্রান্তের ছোট জিফয়েড প্রসেস নিয়ে গঠিত।
- এর উর্ধ্বাংশে একটি সুপ্রা-স্টোর্নাল নচ, দুটি ক্ল্যাভিকুলার নচ এবং পার্শ্বভাগে 7 জোড়া পর্শুকা খাঁজ বিদ্যমান।



চিত্র ৭.২০ মানুষের কক্ষিক্র



চিত্র ৭.২১ স্টোর্নাম

১২। ক্ষ্যাপুলা (Scapula)

- এটি একটি বৃহৎ, চ্যাপ্টা ও ত্রিকোণাকার অস্থি।
- এটি কোস্টাল ও পৃষ্ঠীয় তল, তিনটি কৌণিক তল এবং তিনটি প্রসেস বা প্রবর্ধন নিয়ে গঠিত।

- এর বহিঃকৌণিক প্রান্তে গ্লেনয়েড গহ্বর (glenoid cavity) বিদ্যমান। এতে হিউমেরাসের মস্তক আর্টিকুলেট করে।
- ক্ষ্যাপুলার উর্ধ্ব-পৃষ্ঠভাগে একটি ত্রিকোণাকৃতির প্রবর্ধন থাকে, একে ক্ষ্যাপুলার কাঁটা বলে।
- ক্ষ্যাপুলার কাঁটার উপরের ও নিচের দিকে চাপা গর্তের মতো অংশস্থানকে যথাক্রমে সুপ্রাস্পাইনাল ফসা (supraspinous fossa) ও ইনফ্রাস্পাইনাল ফসা (infraspinous fossa) বলে।



চিত্র ৭.২২ ক্ষ্যাপুলার পশ্চাত্দৃশ্য

চিত্র ৭.২৩ ক্ষ্যাপুলার সম্মুখদৃশ্য

- ক্ষ্যাপুলার কোস্টাল তলে (সম্মুখ-উপরের তল) একটি কোরাকয়েড প্রসেস (coracoid process), একটি অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস (acromial process) এবং একটি সাবক্ষ্যাপুলার ফসা (subscapular fossa) থাকে।

১৩। ক্ল্যাভিকল (Clavicle)

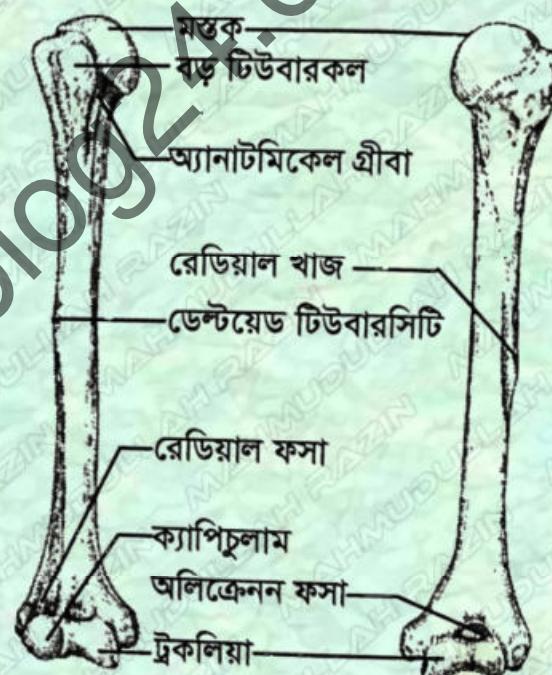
- এটি লম্বা, সরু, S আকৃতির নিরেট অস্তি।
- এটি বাঁকানো শ্যাফট এবং অ্যাক্রেমিয়াল ও স্টোর্নাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত।
- এর স্টোর্নাল প্রান্ত দিয়ে স্টোর্নামের ম্যানুব্রিয়ামের সাথে এবং অ্যাক্রেমিয়াল প্রান্ত দিয়ে ক্ষ্যাপুলার অ্যাক্রেমিয়াল প্রসেস-এর সাথে যুক্ত থাকে।
- এটি আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে এবং উর্ধ্ববাহকে অক্ষীয় কক্ষালের সাথে যুক্ত করে।



চিত্র ৭.২৪ ক্ল্যাভিকল

১৪। হিউমেরাস (Humerus)

- এটি লম্বা শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্রিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত।
- প্রক্রিমাল প্রান্তে একটি গোলাকার মন্তক এবং একটি ছোট ও একটি বড় টিউবারকল বিদ্যমান।
- মন্তকটি হায়ালিন কার্টিলেজ দ্বারা আবৃত।
- মন্তকের নিচে ঈষৎ সঙ্কোচিত খাঁজ-অ্যানাটমিকেল গ্রীবা বিদ্যমান।
- মূলদেহের সম্মুখ-পাশ্চায় পৃষ্ঠে ডেল্টয়েড টিউবারসিটি নামক একটি V আকৃতির অমসৃণ এলাকা বিদ্যমান।
- ডিস্টাল প্রান্তে ক্যাপিচুলাম, ট্রুকলিয়া, অলিক্রেনন ফসা, করোনয়েড ফসা এবং রেডিয়াল ফসা বিদ্যমান।



চিত্র ৭.২৫ হিউমেরাস

১৫। রেডিয়াস ও আলনা (Radius and Ulna)

- উর্ধ্ববাহুর মধ্যরাত্তি অংশ রেডিয়াস ও আলনা নামক দুটি অস্তি নিয়ে গঠিত।
- রেডিয়াস একটি শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্রিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত। এর প্রক্রিমাল বা হিউমেরাস সংলগ্ন প্রান্তে ডিক্ষ আকৃতির মন্তক, সঙ্কোচিত গ্রীবা এবং একটি উঁচু টিউবারসিটি থাকে।
- রেডিয়াসের মতো আলনাও একটি শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্রিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত। এর প্রক্রিমাল প্রান্তে উঁচু অলিক্রেনন ও করোনয়েড প্রসেস এবং অবতল ট্রুকলিয়ার ও রেডিয়াল নচ বিদ্যমান।
- শ্যাফট লম্বা ও নলাকার, এর ডিস্টাল প্রান্তে একটি খাটো ও গোলাকার স্টাইলয়েড প্রসেস বিদ্যমান।



চিত্র ৭.২৬ রেডিয়াস ও আলনা

১৭। শ্রোণিচক্র (Pelvic girdle)

■ এটি ইলিয়াম, ইক্সিয়াম ও পিউবিস নিয়ে গঠিত। এদেও সংযোগ স্থলে অ্যাসিটাবুলাম (acetabulum) নামের অগভীর গর্ত বিদ্যমান যাতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

■ ইলিয়াম একটি বৃহৎ ও চ্যাপ্টা অস্তি, এর উচু প্রান্তকে ইলিয়াম ক্রেস্ট (ilium crest) বলে।

■ ইক্সিয়াম দুটি বাহু বা রেমি ও মূলদেহ নিয়ে গঠিত, এর দেহের উপরের দিকে একটি কাঁটা ও নিচের দিকে একটি টিউবারকল বিদ্যমান থাকে।

■ পিউবিস মূলদেহ ও দুটি রেমি নিয়ে গঠিত; দুপার্শের দুটি পিউবিস একত্রে মিলিত হয়ে পিউবিক সিমফাইসিস গঠন করে।

১৮। ফিমার (Femur)

■ এটি দেহের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মজবুত অস্তি।

■ এটি একটি লম্বা শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্রিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

■ প্রক্রিমাল প্রান্তে একটি মস্তক, একটি বৃহৎ ট্রিকান্টার, একটি ছোট ট্রিকান্টার এবং একটি ইন্টারট্রিকান্টার ক্রেস্ট বিদ্যমান।

■ শ্যাফটির মধ্যভাগ সরু এবং দুই প্রান্তের দিকে ক্রমশ চওড়া, এতে স্পাইরাল রেখা ও গুটিয়াল টিউবারোসিটি বিদ্যমান।

■ এর ডিস্টাল প্রান্তটি প্রসারিত হয়ে দুটি কভাইল গঠন করে। কভাইল দুটির মাঝে ইন্টারকভাইলার নচ নামে একটি গর্ত থাকে।



চিত্র ৭.২৭ শ্রোণিচক্র (পুরুষ)



চিত্র ৭.২৮ ফিমার

১৯। টিবিয়া ও ফিবুলা (Tibia and Fibula)

■ নিম্নবাহুর মধ্যবর্তী অংশ টিবিয়া ও ফিবুলা নামক দুটি অস্তি নিয়ে গঠিত।

■ টিবিয়া অর্তনাদিকে এবং ফিবুলা বর্হিদিকে অবস্থান করে।

■ টিবিয়া লম্বা শ্যাফট এবং প্রক্রিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

■ টিবিয়ার প্রক্রিমাল প্রান্তে একটি করে মিডিয়াল কভাইল, ল্যাটারাল কভাইল এবং টিউবারোসিটি বিদ্যমান।

■ টিবিয়ার ডিস্টাল প্রান্ত কিছুটা চওড়া হয়ে একপার্শে একটি মিডিয়াল ম্যালিওলাস গঠন করে।

■ ফিবুলা দীর্ঘ ও সরু অস্তি; এটি মস্তক, শ্যাফট ও একটি ল্যাটারাল ম্যালিওলাস নিয়ে গঠিত।



চিত্র ৭.২৯ টিবিয়া ও ফিবুলা

৭.৩ পেশিকলার গঠন ও কাজ (Structure and Function of Muscle Tissue)

যেসব কলা সঙ্কোচন-প্রসারণক্ষম তন্ত্র সদৃশ্য অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত এবং যাদের ক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে তাদেরকে পেশিকলা বলে। যেমন- মাংসপেশি, কক্ষালপেশি, হৎপেশি ইত্যাদি। জীব বিকাশের সময় মেসোডার্ম থেকে মায়োজেনেসিস (myogenesis) প্রক্রিয়ায় পেশিকলা সৃষ্টি হয়। মানবদেহের মোট ওজনের অধিকাংশই হলো পেশিকলা যা দেহের মোট ওজনের ৪০% গঠন করে। এ কলার আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ধাত্র পদার্থ (matrix) খুব কম। এ কলার কোষগুলোর সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা খুব বেশি। পেশিকলার কোষগুলো সরক ও লম্বা বলে এদের ফাইবার বা তন্ত্র বলা হয়। পেশিকলার আবরণীকে সারকোলেমা (sarolema) এবং সাইটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম (sarcoplasm) বলে। সারকোপ্লাজমে পরম্পর সমান্তরালে সজ্জিত মায়োফাইব্রিল (myofibril) নামক অসংখ্য প্রোটিন তন্ত্র বিদ্যমান থাকে।

পেশিকলার কাজ:

- ১। পেশিকলার সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে।
- ২। এগুলো মানুষের চলনে অংশগ্রহণ করে এবং ভারবহন করে।
- ৩। এগুলো রক্তসঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ৪। এগুলো সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে পরিপাক, রেচন ও প্রজনন কাজে সহায়তা করে।

পেশিকলার প্রকারভেদ: অবস্থান, গঠন ও কাজের ভিত্তিতে পেশি কলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

- (ক) ঐচ্ছিক বা অমসৃণ বা রৈখিক বা কক্ষাল পেশি,
- (খ) অনৈচ্ছিক বা অরৈখিক বা ভিসেরাল বা মসৃণপেশি এবং
- (গ) হৎপেশি।

(ক) ঐচ্ছিক/অমসৃণ/রৈখিক/কক্ষাল পেশি (Voluntary/Nonsmooth/Straited/Skeletal muscle)

সংজ্ঞা: মানবদেহের যেসব কলা লম্বা, সরক, বহনিউক্লিয়াসযুক্ত ও রৈখিকভাবে বিন্যস্ত পেশিতন্ত্র দিয়ে গঠিত এবং যেগুলো মানুষের ইচ্ছেমতো সঙ্কোচিত বা প্রসারিত হতে পারে তাদের ঐচ্ছিক পেশি বা রৈখিক পেশি বলে। এসব পেশি বিভিন্ন অঙ্গের অস্ত্রিল সাথে সংযুক্ত থেকে এসব অঙ্গের সঞ্চালনে প্রধান ভূমিকা রাখে বলে এদের কক্ষালপেশি বলে। এসব পেশিতে রক্তপ্রবাহ অনেক বেশি এবং এরা স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অবস্থান: অধিকাংশ ঐচ্ছিক পেশি কোলাজেন তন্ত্র গঠিত টেনডন (tendon) দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্রিল সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া চোখে, জিহ্বায়, গলবিল ইত্যাদিতে ঐচ্ছিক পেশি থাকে।

গঠন: অসংখ্য তন্ত্র সদৃশ্য পেশিকোষ নিয়ে ঐচ্ছিক পেশি গঠিত। তন্ত্র মতো দেখায় বলে এসব কোষকে পেশিতন্ত্র (muscle fiber) বলা হয়। কতগুলো পেশিতন্ত্র একত্রিত হয়ে ফ্যাসিকুলাস (একবচন-fasciculus; বহুবচন-fasciculi) নামক বাণিল গঠন করে। এসব বাণিল যোজক কলা নির্মিত পেরিমাইসিয়াম (perimycium) আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। কতগুলো ফ্যাসিকুলা একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ গুচ্ছ গঠন করে। এসব গুচ্ছ যোজক কলা নির্মিত এপিমাইসিয়াম (epimycium) দ্বারা আবৃত থাকে। ঐচ্ছিক পেশি এভাবে অসংখ্য গুচ্ছকারে দেহে অবস্থান করে।

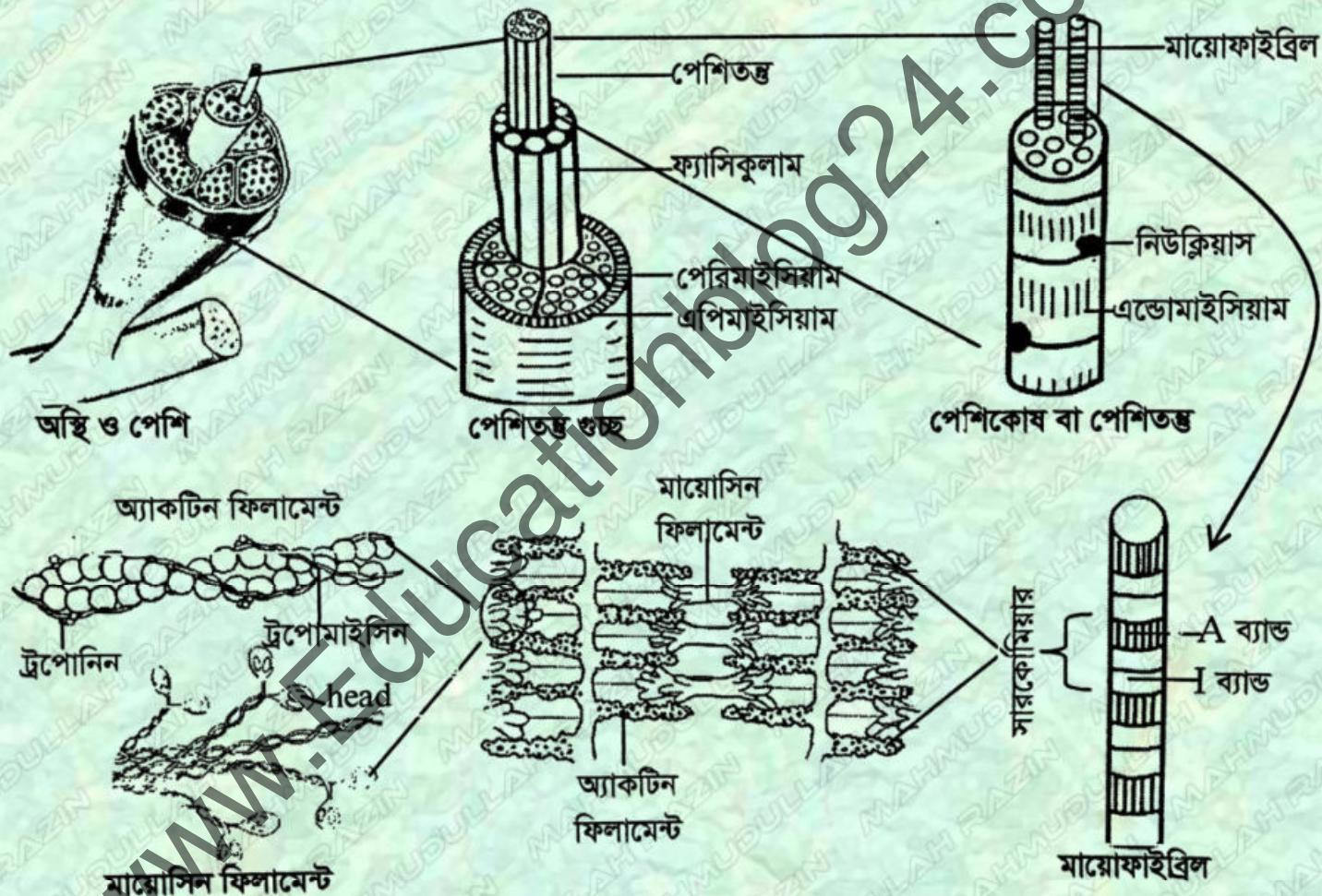
প্রতিটি পেশিকোষ বা পেশিতন্ত্র লম্বা চোঙাকৃতির বহনিউক্লিয়াসযুক্ত গঠন বিশেষ। এতে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে কারণ এসব কোষের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এভোমাইসিয়াম (endomycium) নামক একটি পাতলা আবরণ দ্বারা এটি আবৃত থাকে। পেশিকোষ দৈর্ঘ্যে 1-40 মিলিমিটার এবং প্রস্থে 0.01-0.1 মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পেশিকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের সারকোপ্লাজমে কোষের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত ও সমান্তরালভাবে সজ্জিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল (myofibril) বা অণুস্তুক থাকে। মায়োফাইব্রিলে অণুপ্রস্থ এবং একান্তরভাবে সজ্জিত কতগুলো স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দাগ দেখা যায়। এসব দাগের কারণেই ঐচ্ছিক পেশিকে ডোরাকাটা দেখা যায় এবং এদেরকে রৈখিক বা অমসৃণ পেশি বলে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল প্রোটিন নির্মিত মায়োসিন (myocin) ও অ্যাক্টিন (actin) নামক অসংখ্য ফিলামেন্ট নিয়ে গঠিত।

এদেরকে একত্রে সারকোথিয়ার (sarcomeres) বলে এবং পেশি তন্ত্রের কার্যকরি একক হিসেবে গণ্য করা হয়। আর্কটিন ও মায়োসিনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া অর্থাৎ অস্থায়ী সংযুক্তি ও বিযুক্তির ফলে পেশির সংকোচন-প্রসারণ ঘটে।

মায়োসিন ফিলামেন্ট কিছুটা পুরু এবং মায়োফাইব্রিলে অবস্থিত দাগ বা A ব্যান্ড গঠন করে। অসংখ্য মায়োসিন অণু লম্বাকৃতির গুচ্ছে সজ্জিত হয়ে মায়োসিন ফিলামেন্ট গঠন করে। প্রতিটি মায়োসিন অণু মুগ্ধ আকৃতির মাথা (club-shaped head) সমন্বিত দুটি পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে গঠিত।

আর্কটিন ফিলামেন্ট কিছুটা পাতলা এবং মায়োফাইব্রিলে অবস্থিত দাগ বা I ব্যান্ড গঠন করে। আর্কটিন ফিলামেন্টের উভয় পাশে অবস্থান করে। অসংখ্য আর্কটিন অণু নির্মিত প্যাচানো দ্বি-তত্ত্বী একটি অবলম্বন নিয়ে আর্কটিন ফিলামেন্ট গঠিত। এছাড়া এতে ট্রোমাইসিন (tropomyosin) ও ট্রোপোনিন (troponin) নামক দুটি প্রোটিন অণু যুক্ত হয়ে আর্কটিন ফিলামেন্ট কমপ্লেক্স গঠন করে।



চিত্র ৭.৩০ ঐচ্ছিক/কক্ষালপেশির বিশদ গঠন

কাজ: মানবদেহে বিদ্যমান 656 টি ঐচ্ছিক পেশি সমন্বিতভাবে প্রধান চারটি কাজ সম্পন্ন করে। যেমন-

- ১। মানুষের চলন মূলত কক্ষাল পেশির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।
- ২। এগুলো ইচ্ছেমতো সংকোচিত ও প্রসারিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে পরিচালনা করে।
- ৩। এরা দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৪। এরা দেহের ভঙ্গিমা ও পেশির টান নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) অনৈচ্ছিক বা অরৈখিক বা ভিসেরাল বা মসৃণ পেশি (Involuntary/Nonstraited/ Visceral/ Smooth muscle)

সংজ্ঞা: যেসব পেশিকলার সংকোচন-প্রসারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। এসব পেশির মায়োফাইব্রিলে ডোরাকাটা থাকে না বলে এদের মসৃণ বা অরৈখিক পেশি বলে।

অবস্থান: মানুষের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ (visceral organs), যেমন- পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, রেচননালি, শ্বাসনালি, জনননালি, জরায়ু ইত্যাদির প্রাচীরে অনেচিছক বা মসৃণ পেশি বিদ্যমান থাকে। এসব-পেশি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রাচীরে থাকে বলে এদেরকে ভিসেরাল পেশিও বলে।

গঠন: অসংখ্য মাঝু আকৃতির কোষ বা পেশিতন্ত্র নিয়ে অনেচিছক পেশি গঠিত। কোষগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দৈর্ঘ্যে 15-200 মাইক্রোমিটার ও প্রস্থে 3-8 মাইক্রোমিটার হয়ে থাকে। কোষগুলোর মধ্যভাগ চওড়া এবং দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। এদের কোষবিন্দু বা সারকোলেমা অস্পষ্ট। কোষের চওড়া অংশে একটি ডিখাকার নিউক্লিয়াস থাকে। পেশিতে একটি কোষের চওড়া অংশ অন্য কোষের সরু অংশের সাথে যুক্ত হয়ে বিন্যস্ত থাকে। কোষের সারকোপ্লাজমে (সাইটোপ্লাজম) অসংখ্য মায়োফাইব্রিল অণুসূত্র পেশির দৈর্ঘ্য বরাবর বিন্যস্ত থাকে।

কাজ:

১। এসব পেশির সক্ষেচন-প্রসারণ অতি মন্ত্র। এরা স্বয়ংক্রিয় মায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ছন্দোময় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালিসিস, রক্তনালির অবিরাম সক্ষেচন-প্রসারণ, শ্বাসনালি ও রেচননালির নিয়মমাফিক সক্ষেচন-প্রসারণ ইত্যাদি সকল কিছুই অনেচিছক পেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(গ) হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle)

সংজ্ঞা: যেসব বিশেষ ধরনের পেশিকলা হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে গঠনে অংশ নেয় তাদের হৃৎপেশি বলে। এগুলো অনেচিছক ধরনের পেশি কলা।

অবস্থান: হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর মায়োকার্ডিয়াম (myocardium) গঠন করে। এর বাইরে দিকে এপিকার্ডিয়াম ও ভেতরের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াম নামক যোজক কলা নির্মিত আবরণ থাকে।

গঠন: অনিয়তাকার, লম্বা ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত কতগুলো কোষ বা পেশিতন্ত্র নিয়ে হৃৎপেশী গঠিত। কোষ বা তন্ত্রগুলো পরম্পর যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন সৃষ্টি করে। কোষগুলো প্রায় 100 মাইক্রোমিটার লম্বা এবং প্রায় 15 মাইক্রোমিটার প্রশস্ত হয়। এদের সারকোলেমা (কোষবিন্দু) অত্যন্ত পাতলা। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রভাগে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। কোষের স্বল্প সারকোপ্লাজমে সমান্তরাল ও লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল অণুসূত্র থাকে। মায়োফাইব্রিলের গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির মতো একটি সংযোগকারী ডিস্ক গঠন করে। একে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (intercalated disc) বলে। এর মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের সংকেতগুলো প্রবাহিত হয় এবং এটি হৃৎপেশির অন্যতম শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

হৃৎপেশির তন্ত্রগুলোর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ অ্যারিওলার যোজক কলা দ্বারা পূর্ণ থাকে যাতে কৈশিকজালিকা বিস্তৃত থাকায় হৃৎপেশি পৃষ্ঠি ও অক্সিজেন প্রাপ্ত হয়।

কাজ: হৃৎপেশির অবিরাম সক্ষেচন-প্রসারণ হৃৎপিণ্ডে ছন্দোময় সক্ষেচন-প্রসারণ সৃষ্টি করে। এতে অবিরাম হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে মানবদেহে অবিচ্ছিন্ন রক্ত সংবর্ধনিত হয়। এ পেশি কখনও অবসান্ন থাকে না।



চিত্র ৭.৩১ (ক) অনেচিছক পেশি



চিত্র ৭.৩২ হৃৎপেশি

ব্যবহারিক: প্রস্তুতকৃত স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ এবং অমৃণ, মসৃণ ও হৃৎপেশী মধ্যে তুলনা



তুলনীয় বিষয়	অমসৃণ পেশি/কক্ষালপেশি	মসৃণ পেশি/ ভিসেরাল পেশি	হৃৎপেশি
১। অবস্থান	অঙ্গসংলগ্ন, চোখ, জিহ্বায়, গলবিলে।	পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, রেচননালি, শ্বাসনালি, জনননালি, জরায় ইত্যাদির প্রাচীরে।	হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মাঝেকার্ডিয়ামে।
২। প্রকৃতি	ঐচ্ছিক।	অনৈচ্ছিক।	অনৈচ্ছিক।
৩। পেশিতন্ত্র	নলাকার ও শাখা বিহীন।	মাঝু আকৃতির ও শাখা বিহীন।	নলাকার ও শাখাস্থিত।
৪। নিউক্লিয়াস	অসংখ্য, পরিধিতে থাকে।	একটি, কেন্দ্রে থাকে।	একটি, কেন্দ্রে থাকে।
৫। আড়াআড়ি দাগ	বিদ্যমান।	অনুপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৬। ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	অনুপস্থিত।	অনুপস্থিত।	বিদ্যমান।
৭। সংকোচন ক্ষমতা	দ্রুত ও শক্তিশালি।	মহুর ও দীর্ঘস্থায়ী।	পরিমিত ও ছন্দোময়।
৮। কাজ	অঙ্গ সঞ্চালন ঘটায়।	বিভিন্ন নালিতে বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।	হৃৎস্পন্দন ঘটায়।

৭.৪ পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না (Muscles can pull but cannot push)

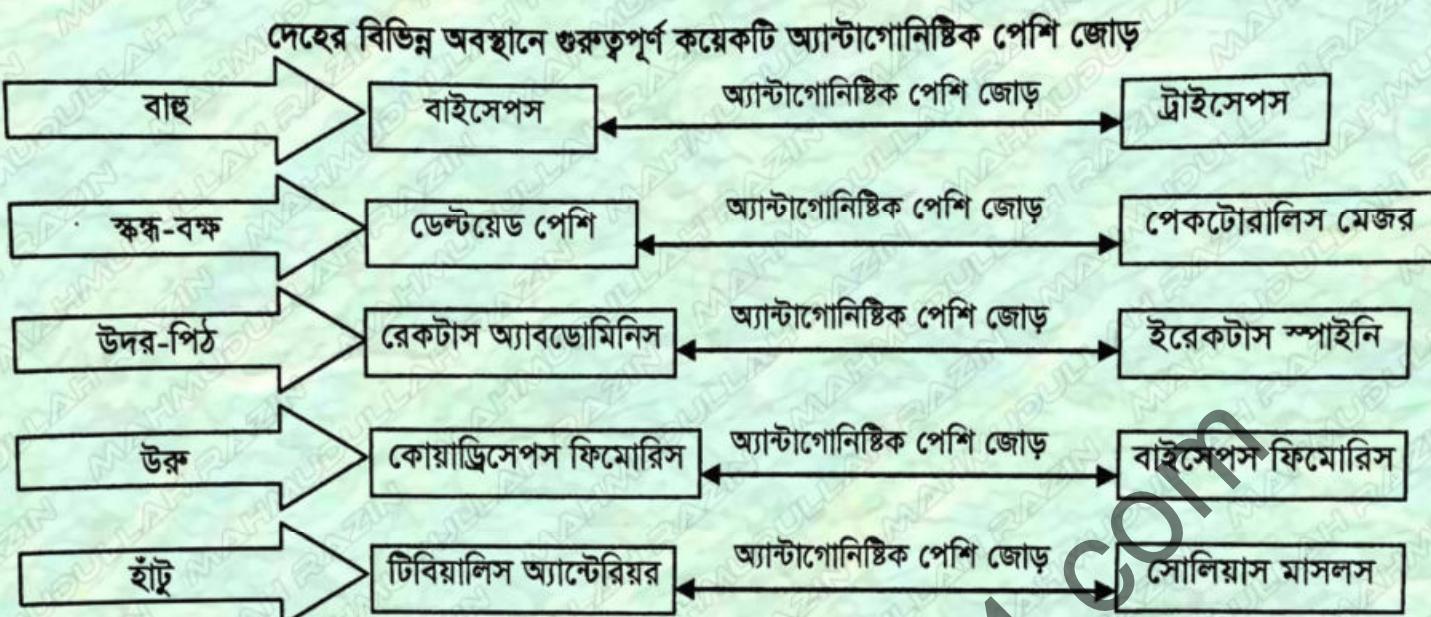
আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালন পেশি ও কক্ষালের সমন্বয়ে সাধিত হয়। এসব অঙ্গের সঞ্চালনে ক্রিয়াশীল পেশিতে টান পড়ে এবং সংকোচিত হয় কিন্তু ধাক্কা দেয় না। তাহলে কিভাবে আমরা বিভিন্ন বস্তুকে ধাক্কা দেই? এর উত্তর হলো আমাদের দেহের অধিকাংশ ঐচ্ছিক পেশি বা কক্ষালপেশি একত্রে দলগতভাবে কাজ করে প্রতিদিন অসংখ্য দৈহিক জটিল সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে কক্ষালপেশিগুলো কণ্ঠে বা টেনডনের মাধ্যমে অঙ্গের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং যুগ্মভাবে অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। প্রতিজোড়া কক্ষালপেশির একটি যখন টানের মাধ্যমে খাটো হয় অন্যটি তখন বিপরীত প্রক্রিয়ায় দীর্ঘায়িত হয়ে অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।

অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি (Antagonistic muscles)

দেহের অঙ্গ সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী যুগ্ম কক্ষালপেশি দুটি পরম্পরের বিপরীতমুখী কাজ করে। এধরনের বিপরীতধর্মী কাজ সম্পাদনকারী পেশিদ্বয়ের একটিকে অপরটির অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি বলে। একই অঙ্গ পরিচালনকারী এরকম দুটি পেশিকে অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি জোড় (Antagonistic muscle partner) বা প্রতিপক্ষীয় পেশি জোড় বলে। এদের সুশৃঙ্খল সম্বয়ের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সম্ভব হয়। এদের একটি যখন সংকোচিত হয় (contracts) অন্যটি তখন শিথিল (relax) হয় এবং বিপরীতক্রম (vice-versa) ঘটনা ঘটে।

ফ্রেক্সর ও একটেনসর পেশি (Flexor and extensor muscles)

যখন কোনো পেশি কোনো অঙ্গকে অঙ্গসঞ্চিতে বাঁকিয়ে এনে ভাঁজ করে তখন তাকে ফ্রেক্সর পেশি বলে। এ পেশির বিপরীত কার্য সম্পাদনকারী পেশি অর্থাৎ অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি যা এ অঙ্গকে সোজা করে বা প্রসারিত করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয় তাকে একটেনসর পেশি বলে। উর্ধ্ববাহুর হিউমেরাসের সাথে অবস্থানকারী বাইসেপস (biceps) ও ট্রাইসেপস (triceps) পেশি যথাক্রমে ফ্রেক্সর ও একটেনসর পেশির উদাহরণ।

**ব্যাখ্যা**

উর্ধ্ববাহুর বাইসেপস ও ট্রাইসেপস অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি জোড়ের কার্যাবলি থেকে ‘পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না’ এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া যায়। উর্ধ্ববাহুর হিউমেরাসের সম্মুখদিকে অবস্থিত বাইসেপস একটি মাঝু আকৃতির কঙ্কালপেশি যার উর্ধ্বাংশ দুটি টেনডন দ্বারা বক্ষ অস্থিত্তের ক্ষ্যাপুলার সাথে যুক্ত থাকে। এর নিম্নাংশ একটি টেনডন দ্বারা নিম্নবাহুর রেডিয়াস অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। বাইসেপস পেশি সংকোচনের ফলে যে টান পরে তাতে নিম্নবাহু কনুই সন্ধিতে ভাঁজ হয়। বাইসেপস-এর অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি হলো ট্রাইসেপস যা উর্ধ্ববাহুর হিউমেরাসের পেছন দিকে অবস্থিত। এর উর্ধ্বাংশ তিনটি টেনডন দ্বারা বক্ষ অস্থিত্তের ক্ষ্যাপুলা ও হিউমেরাসের পেছনে যুক্ত থাকে। এর নিম্নাংশ একটি টেনডন দ্বারা নিম্নবাহুর আলনা অস্থির অলিক্রেনন প্রসেসের সাথে যুক্ত থাকে। ট্রাইসেপস পেশি সংকোচনের ফলে যে টান পরে তাতে নিম্নবাহু কনুই সন্ধির ভাঁজ থেকে প্রসারিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ বাহু সোজা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস-এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীতমূর্তী। বাইসেপস পেশি যখন সংকোচিত হয়ে নিম্নবাহুর উপর টান সৃষ্টি করে তখন ট্রাইসেপস পেশি শিথিল হয়। বিপরীতক্রমে ট্রাইসেপস পেশি যখন সংকোচিত হয়ে নিম্নবাহুর উপর টান সৃষ্টি করে তখন বাইসেপস পেশি শিথিল হয়। বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির সংকোচনের সময় যে টান পড়ে তাতে নিম্নবাহু যথাক্রমে ভাঁজ ও সোজা হয়। কিন্তু পেশিদ্বয়ের শিথিল হওয়ার সময় কোনো ধাক্কা দেয় না এবং নিম্নবাহুর সঞ্চালনে কোনোরূপ ভূমিকা রাখে না।



চিত্র ৭.৩৩ উর্ধ্ববাহুর বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির অ্যান্টাগোনিষ্টিক কার্যাবলি

পেশি সংকোচন-শিথিলের স্নায়ুবিক নিয়ন্ত্রণ:

কঙ্কালপেশির সংকোচন-শিথিল নিজ থেকে সংঘটিত হয় না। স্নায়ুতত্ত্ব থেকে কোনো উদ্বৃত্তি পেশি সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এ স্নায়ু উদ্বৃত্তি মস্তিষ্ক থেকে স্পাইনাল কর্ড ও মটর স্নায়ুর মাধ্যমে পেশির দিকে গমন করে। স্নায়ু উদ্বৃত্তি পেশি সংকোচনের পৌছালে অ্যাকশন পটেনশিয়াল (action potential) সৃষ্টির মাধ্যমে উহা সংকোচিত হয়। পেশিতে স্নায়ু উদ্বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেলে উহা শিথিল হয়।

পেশি সংকোচনের শক্তি:

পেশি সংকোচনের প্রয়োজনীয় শক্তি আসে পেশিকোষে বা শরীরের অন্যান্য স্থানে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে। পেশির প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়। গ্লুকোজের স্বাত শুসনে ATP উৎপন্ন হয় এবং সরাসরি পেশি সংকোচনে ব্যবহৃত হয়।

৭.৫ কঙ্কালের কার্যক্রম ও ‘রডস ও লিভার’ তত্ত্ব

যখন হাত বা পা দেহের কোনো অংশ নড়াচড়া করে তখন যে সরল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অঙ্গ এবং পেশি আন্তঃক্রিয়া করে তাকে লিভার (lever) বলে। মানুষের কঙ্কাল ও পেশিতত্ত্বের কার্যক্রম এমনভাবে নকশা করা যা মানুষের চলন ও বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনে লিভারের মতো কাজ করে। লিভারের চারটি উপাদান থাকে, যথা-

- (১) একটি মজবুত রডস (rods) বা বার,
- (২) একটি ফ্যালক্রাম (fulcrum) বা পিভট যার উপর রডস ক্রিয়া করে,
- (৩) একটি ভার বা বস্তু (load) যা শক্তির বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হয় এবং
- (৪) একটি বল (effort) যা রডস এর সঞ্চালনে শক্তি যোগায়।

লিভারকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা-

১। প্রথম শ্রেণির লিভার: এক্ষেত্রে লিভারের ভার ও বলের মাঝে ফ্যালক্রাম থাকে। মানুষের করোটির অঞ্চলিটাল কভাইলের সাথে মেরুদণ্ডের ১ম কশেরূপকা অ্যাটলাসের সংযুক্তিতে প্রথম শ্রেণির লিভারের সৃষ্টি হয়। এ লিভারের কারণে আমরা মাথাকে সামনে ও পেছনে উঁচু-নিচু করতে পারি।

২। দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার: এক্ষেত্রে লিভারের একপ্রান্তে ফ্যালক্রাম এবং অন্যপ্রান্তে বল থাকে। ফ্যালক্রাম ও বলের মাঝে ভার থাকে। আমরা যখন পয়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে পায়ের গোড়ালিকে উপরে তোলে দাঢ়াই তখন এধরনের লিভারের সৃষ্টি হয়। এ লিভারের কারণে আমরা দ্রুত দৌড়াতে পারি।

৩। তৃতীয় শ্রেণির লিভার: এক্ষেত্রে লিভারের একপ্রান্তে ফ্যালক্রাম এবং অন্যপ্রান্তে ভার থাকে। ফ্যালক্রাম ও ভারের মাঝে বল থাকে। যখন আমরা হাত দ্বারা কোনো বস্তুকে উত্তোলন করি তখন এধরনের লিভার সৃষ্টি হয়। লিভারের কারণে আমরা অন্ত শক্তি ব্যয় করে অধিক ভার উত্তোলন করতে পারি।



প্রথম শ্রেণির লিভার



দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার
চিত্র ৭.৩৪ বিভিন্ন শ্রেণির লিভার



তৃতীয় শ্রেণির লিভার

মানবদেহে বিদ্যমান অস্থি এবং অস্থিসঞ্চিতগুলো একত্রে সঙ্গি এবং লিভারতত্ত্বের মতো কাজ করে। দেহের লম্বা অস্থিগুলো লিভারের কাজ করলে অস্থিসঞ্চিতগুলো লিভারের মাঝে ফ্যালক্রাম বা পিভটের কাজ করে। লম্বা অস্থিগুলো অস্থিসঞ্চিকে কেন্দ্র করে যখন সঞ্চালিত হয় তখন অস্থিসঞ্চি ফ্যালক্রাম হিসেবে কাজ করে। গতি অর্জনের জন্য লিভারে একটি বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয় যাতে লিভারের বিপরীত একটি বিন্দুতে ভার বা ওজন গ্রহণের শক্তিকে প্রশমিত করা যায়। লিভারের যে বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রচেষ্টা বাহু (effort arm) এবং যে বিন্দুকে বল প্রশমিত হয় তাকে প্রতিরোধী বাহু (resistance arm) বলে।

অস্থিসঞ্চির সঞ্চালনের ক্ষমতাকে সঞ্চালন পরিসীমা বলা হয়। বিভিন্ন অস্থিসঞ্চি বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে। অস্থির গঠন, লিগামেন্টের সামর্থ, পেশি ও টেনডনের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে সঞ্চালন পরিসীমা। সঙ্গি এবং লিভারে বিদ্যমান অস্থির গঠন সরাসরি সঞ্চালন পরিসীমাকে প্রভাবিত করে। যেমন কনুই কখনোই 180° বেশি প্রসারিত হতে পারে না, কারণ আলনা অস্থির অলিক্রেনন প্রসেস হিউমেরাসের অলিক্রেনন ফোসাতে আটকা পড়ে। সঙ্গিতে সংযোগকারী লিগামেন্টগুলোও সঞ্চালন পরিসীমা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। লিগামেন্টগুলো ঢিলেচালা হলে অস্থিগুলো যতটা প্রসারিত হতে পারে আটসাট থাকলে ততটা হতে পারে না। অস্থি সংলগ্ন বিভিন্ন টেনডন ও পেশি সঞ্চালন পরিসীমাকে প্রভাবিত করে যেমন, কনুইয়ের ক্ষেত্রে এগুলো অস্থিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালিত করে।

৭.৬ মানুষের হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সম্বয়

প্রাণীর স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে গমনকে চলন বলে। খাদ্যগ্রহণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ও পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিতে প্রাণীর চলন ঘটে। চলন একটি ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চলন নিয়ন্ত্রিত হয়। দুই পা দিয়ে মানুষের চলন সম্পন্ন হলেও অন্যান্য অঙ্গ এর সাথে জড়িত থাকে। তবে মানুষের চলনে পেশি ও কঙ্কালতন্ত্র প্রধান ভূমিকা রাখে। চলনের সময় মুখের ভঙ্গি, হাত ও মাথার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। হাত ও মাথা স্থির রেখে কখনোই স্বাভাবিক চলন সম্ভব নয়। হাত ও পায়ের বিভিন্ন ঐচ্ছিক পেশি, অস্থি এবং অস্থিসঞ্চির যুগপৎ ক্রিয়ায় মানুষের চলন সম্পন্ন হয়।

মানবদেহের কঙ্কালপেশী চলনে অংশগ্রহণ করে। এসব পেশির প্রান্তভাগ রূপান্তরিত হয়ে দৃঢ়, মজবৃত ও হিতিস্থাপক টেনডন (tendon) পরিণত হয়। টেনডন দ্বারা হাত ও পায়ের অস্থিসমূহ একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের লিগামেন্ট (ligament) বলে। ফলে চলনের সময় অস্থিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না।

চলন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী প্রধান পেশিসমূহের কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-



চিত্র ৭.৩৫ মানুষের পায়ের পেশির ক্রিয়া

১। হিউমেরাস ও ফিমার সংলগ্ন বাইসেপস (biceps) পেশি চলনের সময় হাত ও পায়ের নিম্নাংশকে ভাঁজ করে। এদের ফ্রেক্সর পেশি (flexor muscles) বলে। একই স্থানের ট্রাইসেপস (triceps) পেশি হাত ও পায়ের ভাঁজ করা নিম্নাংশকে প্রসারিত করে পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে নেয়। এদের এক্সটেন্সর পেশি (extensor) বলে।

২। ডেল্টয়েড পেশি হাত ও পাকে ডানে কিংবা বামে সরায়। এদের অ্যাবডাক্টর পেশি (abductor) বলে। ল্যাটিসিমাস পেশি হাত ও পা কে পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে আনে। এদের অ্যাডাক্টর পেশি (adductor) বলে।

৩। উরুর গ্লাটিয়েস, হাঁটুর কোয়াড্রিসেপস ফিমরিস, পায়ের তলার সোলিয়েস এবং কাঁধের ট্রাপিজিয়স পেশি শিথিল হয়ে দেহকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। ৪। হাঁটুর গ্যাস্ট্রোকনেমিয়স ও পায়ের তলার সোলিয়েস পেশির সঙ্কোচনে পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে উঠে আসে।

৫। হাঁটুর হ্যামিস্ট্রিৎ ও গ্যাস্ট্রোকনেমিয়স পেশির সঙ্কোচনে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পা মাটি ছেড়ে চলে আসে।

৬। উরুর ইলিওসোয়াস ও রেন্টের ফিমারিস পেশির সঙ্কোচনে শ্রোণি ভাঁজ হয়।

৭। উরুর পিরিফর্মিস পেশি ফিমারকে স্থুরায়। এদের রোটেটর পেশি (rotator) বলে।

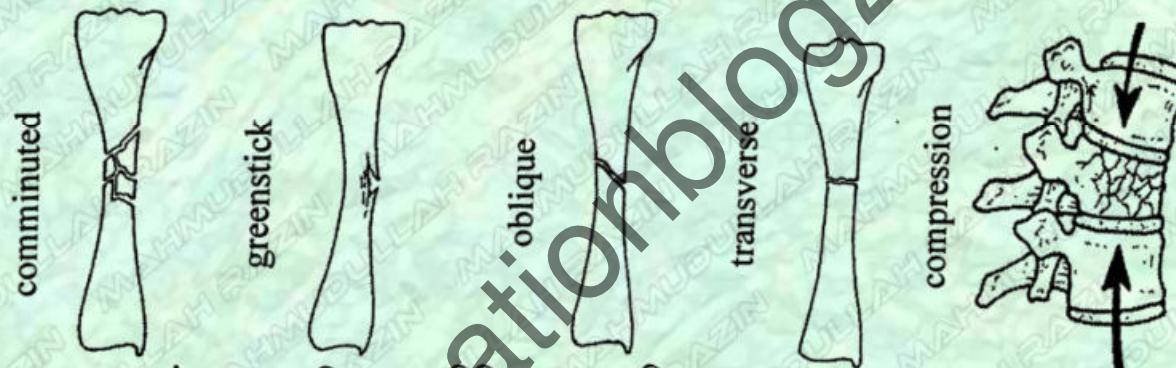
৭.৭ অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা

যখন ব্যাপক চাপে বা আঘাতের ফলে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি অখণ্ডতা হারায় তখন তাকে অস্থিভঙ্গ (bone fracture) বলে। চিকিৎসকগণ একে FRX বা Fx সংকেত দ্বারা প্রকাশ করেন। অস্থিভঙ্গ প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

১। সাধারণ বা বন্ধ ধরনের অস্থিভঙ্গ (Simple/closed bone fracture): এক্ষেত্রে ঢুক অক্ষত থাকে, ফলে ভাঙা অস্থি বাহির থেকে বোঝা যায় না। অনেক সময় অস্থি বেঁকে যায়। একে গ্রিনস্টিক অস্থিভঙ্গ (greenstick fracture) বলে। এ ধরনের জখমে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

২। যৌগিক বা মূক্ত ধরনের অস্থিভঙ্গ (Compound/open bone fracture): এক্ষেত্রে ঢুক ও মাংপেশি ছিঁড়ে গিয়ে ভাঙা অস্থি বাইরে বের হয়ে আসে। এ ধরনের অস্থিভঙ্গ আড়াআড়ি (transverse fracture) বা তির্যক (oblique fracture) হতে পারে। অনেক সময় অস্থি ভঙ্গে একাধিক টুকরায় বিভক্ত হয়ে (comminuted fracture) যায়। এ ধরনের জখমে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়।

৩। জটিল বা চাপা অস্থিভঙ্গ (Complex/compression fracture): কোনো রকম আঘাত ছাড়া যখন কোনো অস্থি রোগের কারণে ভঙ্গে যায় তখন তাকে জটিল বা চাপা অস্থিভঙ্গ বলে। যেমন- অস্টিওপোরোসিসের (osteoporosis) কারণে মেরুদণ্ডের কশেরকার কাঁটা ভঙ্গে যায়।



চিত্র ৭.৩৬ বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ

অস্থিভঙ্গের জটিলতা

অস্থিভঙ্গের ফলে রোগীর নিম্নলিখিত জটিলতা দেখা দিতে পারে-

- ১। জ্বান হারিয়ে ফেলতে পারে, সাময়িকভাবে নড়াচড়া এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- ২। আঘাতপ্রাণ স্থান প্রচণ্ড ব্যথাসহ ঝুলে যেতে পারে কিংবা ব্যথাসহ ব্যাপক রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- ৩। আঘাতপ্রাণ স্থানে সামান্য চাপে নড়াচড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হতে পারে।
- ৪। হাত, পা কিংবা অস্থিসঞ্চি বিকৃত হয়ে যেতে পারে।
- ৫। অস্থি ভঙ্গে মাঝে ও ঢুক ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে পারে।
- ৬। আঘাতপ্রাণ হাত বা পায়ের আঙুল অসাড় কিংবা নীলাত বর্ণের হয়ে যেতে পারে।
- ৭। ভঙ্গুরকৃত অস্থির আঘাতে দেহের অতিসংবেদনশীল অঙ্গ যেমন- মন্তিক, ফুসফুস কিংবা হৃৎপিণ্ড আঘাত প্রাণ হতে পারে।
- ৮। অস্থিভঙ্গের কারণে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি রহিত হয়ে যেতে পারে।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসা

- ১। যদি তাৎক্ষণিক কোনো বিপদের আশঙ্কা না থাকে তবে রোগীকে নিয়ে বেশি নড়াচড়া করা যাবে না।
- ২। রোগী অঙ্গান হয়ে গেলে কিংবা শ্বাস কষ্ট থাকলে রোগীকে হাত পা প্রসারিত করে এমনভাবে শুয়িয়ে দিতে হবে যেন মাথা ঝুকের চেয়ে সামান্য নিচে থাকে।
- ৩। যদি কোনো স্থান দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে তাহলে এটি দ্রুত বন্ধ করার ব্যাস্তা গ্রহণ করতে হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে রক্তপড়া স্থান বেঁধে দিতে হবে। যদি এস্থান দিয়ে অস্থি বের হয়ে থাকে তাহলে জোগে চেপে ধরতে হবে।
- ৪। রক্ত পড়া বন্ধ হলে কাপড় বদলিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে।
- ৫। হাত বা পায়ের অস্থি ভঙ্গে গেলে এদের নিচে বালিশ দিতে হবে যাতে রোগী আরাম অনুভব করে।

৬। বাহর যে অস্থি ভেঙ্গে গেছে সেটি যাতে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য বাঁশের বা কাঠের তৈরি পাত দিয়ে ঢাঁচ (splint) বেঁধে দিতে হবে।

৭। যদি সম্ভব হয় তাহলে অস্থিভঙ্গের স্থানে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এতে ব্যথা ও ফোলা কম হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন বরফ সরাসরি তুকের সংস্পর্শে না আসে।

৮। ডাঙুরের পরামর্শ ছাড়া রোগীকে কোনো কিছু খাওয়ানো বা পান করানো যাবে না।

৯। প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

৭.৮ অস্থিসংক্রিত আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা

অস্থিসংক্রিত স্থানচ্যুতি (Joint dislocation)

যখন কোনো আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দেহের অস্থিসংক্রিত গঠনকারী কোনো অস্থি সরে যায় তখন তাকে অস্থিসংক্রিত স্থানচ্যুতি বা লাক্সেশন (luxation) বলে। সড়ক দুর্ঘটনা, পড়ে যাওয়া, খেলাধুলা, ক্ষিপ্র গতির কোনো আঘাত কিংবা চলনের অসামঞ্জস্যতার কারণে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। এতে সংক্ষিতে বিদ্যমান পেশি ও লিগামেন্টগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে। X-ray এর মাধ্যমে অস্থির স্থানচ্যুতি এবং এসময় কোনো অস্থি ভঙ্গ হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা হয়। স্থানচ্যুতি নিশ্চিত হওয়ার পর একে সঠিক স্থানে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এসময় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এজন্য অনেকসময় লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহার করা হয়। পূর্বে আঘাতপ্রাণ্ত কোনো অস্থিসংক্রিত থেকে অস্থির স্থানচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ এখানকার পেশি ও লিগামেন্টগুলো দুর্বল হয়ে থাকে। সাধারণত কাঁধ, কনুই, হাঁটু বা নিতম্বের সংক্রিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে।

প্রকারভেদ: প্রধানত চার ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে, যেমন-

১। জন্মগত চ্যুতি (Congenital dislocation): শিশু জন্মের সময় অস্থিচ্যুতি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

২। আঘাতজনিত চ্যুতি (Traumatic dislocation): দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে আঘাত প্রাণ্ত হয়ে অস্থি চ্যুতি ঘটতে পারে। সাধারণত কাঁধ, কনুই, হাঁটু বা নিতম্বের সংক্রিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে।

৩। রোগজনিত চ্যুতি (Pathological dislocation): কিছু রোগের কারণে অনেকসময় অস্থিচ্যুতি ঘটে। নিতম্বের সংক্রিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে।

৪। বাতব্যাদিগ্রস্থ চ্যুতি (Paralytic dislocation): বাতব্যাদির কারণে পেশির ভারসাম্য হারালে নিতম্বের সংক্রিতে অস্থিচ্যুতি ঘটে।

লক্ষণ

১। অস্থিচ্যুতি ঘটলে স্থান ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

২। অস্থিচ্যুতির প্রাথমিক লক্ষণ হলো ঐ অস্থি তার কাজে অক্ষম হয়ে যায়।

৩। হাতে আঙুলের অস্থিচ্যুতি ঘটলে গোটা হাত কাজ করতে অক্ষম হয়ে যায়।

৪। কাঁধ ও নিতম্বের অস্থিচ্যুতি ঘটলে হাত ও পা নড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

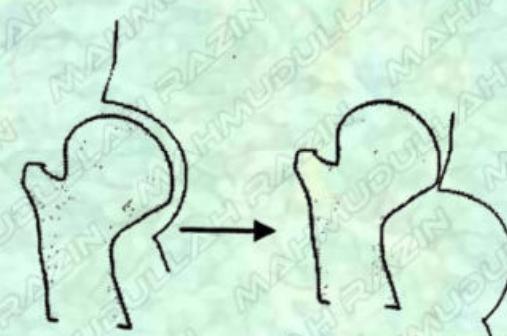
৫। বিচ্যুত অস্থি অনেকসময় বাহির থেকে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। সকল ধরনের অস্থিচ্যুতির জন্য যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

২। কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসক বা প্রশিক্ষিত প্রাণ্ত লোকের সহায়তা ছাড়া বিচ্যুত অস্থিকে পূর্বের স্থানে বসানোর চেষ্টা করা যাবে না। এতে লিগামেন্ট বা পেশি ছিঁড়ে গিয়ে পরিণতি আরো খারাপ হতে পারে।

৩। কাঁধ বা গোড়ালির অস্থিচ্যুতি ঘটলে বিচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসানোর পর ঐ স্থানে ঢাঁচ বা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে এর পুনরায় চ্যুতি না ঘটে।



চিত্র ৭.৩৭ অস্থিসংক্রিত স্থানচ্যুতি

৪। যদি সম্ভব হয় তাহলে অস্থিচ্যাতির স্থানে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এতে ব্যথা ও ফোলা কম হবে। শক্ত রাখতে হবে যেন বরফ সরাসরি তুকের সংস্পর্শে না আসে।



চিত্র ৭.৩৮ অস্থিসন্ধির স্থানচ্যাতির প্রাথমিক চিকিৎসা

অস্থিসন্ধির মচকানো (Joint sprain)

অস্থিসন্ধিতে দুই বা ততোধিক অস্থি মজবুত, স্থিতিস্থাপক কতগুলো পেশিতত্ত্ব দ্বারা পরম্পর যুক্ত থাকে। এদের লিগামেন্ট বা সন্ধিবদ্ধনী বলে। কোনো কারণে অস্থিসন্ধির লিগামেন্ট আঘাতপ্রাণী হলে তাকে মচকানো বা স্প্রেইন বলে। মচকানো অস্থিসন্ধিস্থল ফুলে গিয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে।

মচকানোর কারণ: যখন অস্বভাবিক কোনো অবস্থানে যাওয়ার জন্য অস্থিসন্ধিতে বল প্রয়োগ করা হয় তখন লিগামেন্টগুলো অতি প্রসারিত হয়ে মচকিয়ে যায়। যেমন- পায়ের গোড়ালিতে মোচর লাগলে এর লিগামেন্টগুলো মচকিয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: মচকানো অস্থি মাঝার হলে ঘরেই চিকিৎসা করা যায়। রোগীকে প্রথমে বিশ্রামে যেতে হবে। যতক্ষণ ব্যথা না করে ততক্ষণ মচকানো স্থানে 30 মিনিট অন্তর অন্তর বরফ দিতে হবে। ব্যথা করে গেলে পর্যায়ক্রমে সক্রোচন ও প্রসারণ দ্বারা মচকানো থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিমাঝার মচকিয়ে গেলে কিংবা লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে ডাঙ্গারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে হবে।

পা মচকাণ্ডে করণীয়: পায়ের অস্থিসন্ধিগুলো কয়েকটি লিগামেন্ট দ্বারা পরম্পর যুক্ত থাকে। হাটা বা দৌড়ানোর সময় অথবা অসাবধানতার কারণে অনেকসময় পায়ের লিগামেন্টগুলো মচকিয়ে যায়। পায়ের মচকানো সুস্থ হতে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ লেগে যায়। পা মচকানোর প্রাথমিক চিকিৎসা হলো:

- ১। যতটুকু সম্ভব পা কে বিশ্রামে রাখতে হবে। যতটুকু পারা যায় বসে বসে সময় কাটাতে হবে।
- ২। পা কে বুকের সমান্তরালে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। শুবার সময় পায়ে গোড়ালির নিচে বালিশ দিতে হবে যাতে পায়ের পাতায় চাপ না পড়ে।
- ৩। প্রথম দুই দিন 30 মিনিট পর পর পায়ের পাতায় বরফ ঠাণ্ডা প্রয়োগ করতে হবে, এতে পা ফোলা ও ব্যথা কম হবে।
- ৪। দুই দিন পর মাঝে মধ্যে পায়ে গরম কাপড় দিয়ে সেক দিতে হবে, এতে পায়ে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাবে।
- ৫। প্রথম সপ্তাহ লাঠি বা ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে।
- ৬। হাঁটার সময় পায়ে একটি অতিরিক্ত ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ পড়লে ভালো হয়।

সারসংক্ষেপ

■ **কঙ্কালতত্ত্ব:** জ্বরীয় মেসোডার্ম উদ্ভূত বিশেষ ধরনের যোজককলা অস্থি ও কোমলাস্থি নির্মিত যে তত্ত্ব মানবদেহের প্রধান শাঠামো গঠন করে, দেহের গুরুত্বপূর্ণ নরম অঙ্গাদি ধারণ করে, দেহের ভারবহন করে এবং পেশি সংযোজনের তল সৃষ্টি করে তাকে কঙ্কালতত্ত্ব বলে।

■ **ফন্টানেল:** জন্মের সময় শিশুর করোটিকার অস্থিগুলো আলাদা থাকে। ফলে মন্তকে ৬টি ফাঁকা স্থান থাকে। এদের ফন্টানেল বলে।

■ **হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র:** হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একক। এটি একটি হ্যাভারসিয়ান নালি, কতগুলো ল্যামিলি, ল্যাকুনি, ক্যানালিকুলি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের কেন্দ্রে একটি নালি থাকে। একে হ্যাভারসিয়ান নালি বলে। এ নালির মধ্য দিয়ে শিরা, ধমনি, লসিকানালি ও স্নায়ুতন্ত্র প্রসারিত হয়।

■ **পেশি কলা:** যেসব কলা সঙ্কোচন-প্রসারণক্রম তন্ত্রসদৃশ অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত এবং যাদের ক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে তাদেরকে পেশি কলা বলে। মানবদেহের যেসব কলা মানুষের ইচ্ছেমতো সঙ্কোচিত বা প্রসারিত হতে পারে তাদের ঐচ্ছিক পেশি বলে। যেসব পেশিকলার সঙ্কোচন-প্রসারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। যেসব পেশিকলা হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠনে অংশ নেয় তাদের হৃৎপেশি বলে।

■ **লিভার:** যখন হাত বা পা দেহের কোনো অংশ নড়াচড়া করে তখন যে সরল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অস্থি এবং পেশি আন্তঃক্রিয়া করে তাকে লিভার বলে। মানুষের কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্রের কার্যক্রম এমনভাবে লকশ্য করা যা মানুষের চলন ও বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনে লিভারের মতো কাজ করে।

■ **অস্থিভঙ্গ:** যখন ব্যাপক চাপে বা আঘাতের ফলে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি অখণ্ডতা হারায় তখন তাকে অস্থিভঙ্গ বলে। চিকিৎসকগণ একে FRX বা Fx সংকেত দ্বারা প্রকাশ করেন।

■ **হ্যাসিকির ছান্ত্যাতি:** যখন কোনো আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দেহের অস্থিসংক্রিতি গঠনকারী কোনো অস্থি সরে যায় তখন তাকে অস্থিসংক্রিত ছান্ত্যাতি বা লাঙ্গেশন বলে।

■ **মচকানো:** অস্থিসংক্রিতে দুই বা ততোধিক অস্থি মজবুত, স্থিতিশাপক কতগুলো পেশিতন্ত্র দ্বারা পরম্পর যুক্ত থাকে। এদের লিগামেন্ট বা সংক্ষিপ্তনী বলে। কোনো কারণে অস্থিসংক্রিত লিগামেন্ট আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাকে মচকানো বা স্প্রেইন বলে।

- যদিও 25 বছর বয়সের পর মানুষের অস্থির কোনো বৃক্ষি হয় না কিন্তু তুকের মতো এগুলো সর্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনর্গঠিত হয়, ফলে প্রকৃতপক্ষে প্রতি 7 বছর পর পর আমরা দেহে নতুন অস্থি পাই।
- মানুষের দাঁত কঙ্কালতন্ত্রের অংশ হলেও এদেরকে অস্থি হিসেবে গণনা করা হয় না।
- অস্থিমজ্জা দেহভরের 4% গঠন করে, আলো অস্থিমজ্জা থেকে প্রতিদিন 5 বিলিয়ন লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়।
- অস্থির 70%ই মৃত শক্ত পদার্থ যা প্রধানত ক্যালসিয়াম দিয়ে গঠিত। এজন্য অস্থি মজবুত ও সুস্থ রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতিপ্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান।
- মানবদেহের একমাত্র সংক্ষিপ্তিহীন অস্থি হলো হাইয়ায়েড অস্থি যা জিহ্বার গোড়ায় অবস্থান করে।
- অস্থির অনিয়ন্ত্রিত গঠন বা অস্থাভাবিকতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণত X রে, MRI, ডেনসিটি টেস্ট, আর্দ্রাক্ষেপি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।
- মানবদেহে প্রায় 600টির মতো পেশি আছে যেগুলো টেনডন দ্বারা অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং দেহভরের 40% গঠন করে।
- দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশি জিহ্বা, পরিশ্রমী পেশি হৃৎপেশি, লম্বা (30 সেন্টিমিটার) পেশি উরুর সারটোরিয়াস পেশি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

1. মানুষের করোটিকার অস্থির সংখ্যা কয়টি?

ক. ১২টি	খ. ১০টি	গ. ৮টি	ঘ. ৯টি
---------	---------	--------	--------
2. উরুর পিরিফর্মিস পেশি ফিমারকে ঘূরায়। এদেরকে বলে-

ক. রোটেটর পেশি	খ. অ্যাডাকটর পেশি	গ. অ্যাবডাট্টর পেশি	ঘ. ফ্লেক্সর পেশি
----------------	-------------------	---------------------	------------------
3. বক্ষ অস্থিচক্রের কাজ-
 - i. অগ্রপদকে ধারণ করে,
 - ii. দেহের উর্ধ্বাংশের অবকাঠামো গঠন করে,
 - iii. হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও অন্যান্য নরম অঙ্গকে সুরক্ষা প্রদান করে।

- নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii	গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii
কিছু শক্ত ও নিরেট এবং কিছু কোমল প্রকৃতির স্থিতিস্থাপক মজবুত গঠন আমাদের দেহের অবকাঠামো গঠন করে। এগুলো দেহের কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজেও অংশগ্রহণ করে।			
-উদ্বীপকের আলোকে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।			
৮. উদ্বীপকে উল্লেখিত শক্ত ও নিরেট গঠনগুলোর আবরণের নাম-			
ক. পেরিকন্ড্রিয়াম	খ. এভোস্টিয়াম	গ. পেরিঅস্টিয়াম	ঘ. পেরিকার্ডিয়াম
৫. উদ্বীপকে উল্লেখিত কোমল-স্থিতিস্থাপক গঠনটির বৈশিষ্ট্য নয় -			
i. অর্ধকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক, ii. পেরিকন্ড্রিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে, iii. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বিদ্যমান,			
- নিচের কোনটি সঠিক?			
ক. i ও ii	খ. i ও iii	গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii
৬. বক্ষপিণ্ডের গঠনকারী অঙ্গের সংখ্যা কয়টি?			
ক. ২১টি	খ. ২৫টি	গ. ৩১টি	ঘ. ৩৫টি
৭. হৎপেশির সংকোচনে কোন উপাদানটি কাজ করে?			
ক. পেরিমাইসিয়াম	খ. মায়োফাইব্রিল	গ. ইন্টারক্যালেটিড ডিস্ক	ঘ. সারকোলেমা
৮. মানব কঙ্কালতত্ত্বে তৃতীয় শ্রেণির লিভার কোন অঙ্গে কার্যকরি?			
ক. হাতের কনুই সঞ্চালনে	খ. পায়ের গোড়ালি সঞ্চালনে	গ. মানুষের মাঝে সঞ্চালনে	ঘ. মানুষের কোমর সঞ্চালনে
৯. হিউমেরাস ও ফিমারের মন্তকে কোন ধরনের তরঙ্গান্তি থাকে?			
ক. হায়ালিন	খ. পীত তন্ত্রময়	গ. শ্বেত তন্ত্রময়	ঘ. ক্যালসিফাইড
১০. মানবদেহে গ্রিনয়েড গহ্বর কোথা থাকে?			
ক. অগ্রপদে	খ. পশ্চাত্পদে	গ. বক্ষান্তি চক্রে	ঘ. শ্বেতচক্রে
১১. পেশি কলার আবরণ কোনটি?			
ক. নিউরোলেমা	খ. সারকোলেমা	গ. প্লাজমালেমা	ঘ. পেরিটোনিয়াম
১২. পেশি ও অঙ্গ নিচের কোন অংশের মাধ্যমে যুক্ত হয়?			
ক. লিগামেন্ট	খ. টেনডন	গ. সাইনোভিয়াল	ঘ. মায়োফাইব্রিল
১৩. নিচের কোনটি করোটির অঙ্গ নয়?			
ক. প্যারাইটাল	খ. ট্রান্সভার্স প্রসেস	গ. ফ্রন্টাল	ঘ. অক্সিপিটাল

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১। সজীব নিয়মিত খেলাধূলা করে। সে স্থানীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন। কিন্তু এবছর সে কোনো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কারণ মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তার বাম পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং ডান পায়ের পেশি ছিঁড়ে গেছে। ডাঙ্কার তাকে এক বছর খেলাধূলা থেকে বিরত থাকতে বলেছে।

(ক) সারকোলেমা কী?

(খ) কঙ্কালতত্ত্বের পাঁচটি কাজ লেখ।

(গ) উদ্বীপকে উল্লেখিত সজীবের যে গঠনটি ভেঙ্গে গেছে তার একক গঠন বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্বীপকে উল্লেখিত সজীবের ভেঙ্গে যাওয়া গঠনের সাথে ছিঁড়ে যাওয়া গঠনটি কীভাবে মানুষের চলচলে ভূমিকা রাখে বিশ্লেষণ কর।

২। অব্দেষা রিকসা হতে তড়িঘড়ি করে নামতে গিয়ে পায়ের গোড়ালীতে প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গোড়ালী ফুলে গেল এবং সে ভালোভাবে হাঁটতে পারছিলো না। ডাঙ্কারের শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন “তার হাড় ভাঙ্গেনি বা স্থানচ্যুত হয়নি”।

(ক) কঙ্কালতত্ত্ব কী?

(খ) হ্যাভারশিয়ান তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্বীপকে উল্লেখিত অব্দেষার সমস্যাটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্বীপকের সমস্যাটি নিরাময়ে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর?

অধ্যায় ৮

মানব শারীরতন্ত্র: সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো মানুষও দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করে। এটি দেহের সাম্যাবস্থা রক্ষা এবং অঙ্গে অঙ্গে রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা। দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেহস্থ আন্তঃকোষীয় সমন্বয় দ্বারা পরিচালিত হয়। দেহের আন্তঃকোষীয় সমন্বয় প্রধান দুটি উপায়ে সংঘটিত হয়, যথা- স্নায়ুবিক সমন্বয় (neural coordination) এবং রাসায়নিক সমন্বয় (chemical coordination)। এ অধ্যায়ে মানবদেহের সমন্বয় ব্যবস্থা এবং এদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



প্রধান শব্দাবলি (Keywords): নিউরন, নিউরোট্রান্সমিটার, সিন্যাপস, মন্তিক্ষ, করোটিক স্নায়ু, কর্নিয়া, কোরয়েড, রেটিনা, ইউস্টেশিয়ান নালি, অরগান অব কর্টি, হরমোন।

পি঱িয়ড সংখ্যা ১২। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল) -

- স্নায়ুবিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মন্তিক্ষের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে।
- রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা প্রতিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৮.১ স্নায়ুবিক সমন্বয় (Neural coordination)

স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, তন্ত্র, কলা ও কোষের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তাকে স্নায়ুবিক বা নিউরাল সমন্বয় বলে। এক্ষেত্রে স্নায়ু কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক উদ্বীপনা এক কোষ থেকে অন্য কোষে পরিবাহিত হয়। এ বৈদ্যুতিক উদ্বীপনা পরিশেষে স্নায়ুকোষের প্রাণ্তে নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণের মাধ্যমে রাসায়নিক উদ্বীপনায় পরিণত হয়। যেমন, পেশি সঙ্কোচনের জন্য মটর স্নায়ুর মাধ্যমে যে বৈদ্যুতিক উদ্বীপনা প্রেরিত হয় উহা পরিশেষে স্নায়ুপেশির সংযোগস্থলে (neuromuscular junction) অ্যাসিটালকোলিন হিসেবে মুক্ত হয়। এ অ্যাসিটালকোলিন পেশি মেম্ব্রেনের উপর ক্রিয়া করে, ফলে পেশি সঙ্কোচিত হয়।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

জগীয় এক্ষেত্রার্থ থেকে উদ্ভৃত মানবদেহের যে তন্ত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশের ও দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন উদ্বীপনায় সাড়া দিয়ে দৈহিক, মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় ঘটায় তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত দুভাবে কাজ করে, যেমন-

১। বিভিন্ন সংবেদী উপাত্ত (sensory data) সংগ্রহ ও প্রতিবেদন সৃষ্টি করা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। স্নায়ুতন্ত্র যেসব সংবেদী উপাত্তের প্রতি সাড়া দেয় সেগুলো হলো-

- দেহতল দ্বারা-গরম, ঠাণ্ডা, স্পর্শ, চাপ, ব্যথা ইত্যাদি।
- দূরবর্তী ঘটনা- গন্ধ, আলো, শব্দ ইত্যাদি।
- দেহাভ্যন্তরে- উত্তেজনা, মানসিক চাপ, ব্যথা, রক্তচাপ, রক্তে শ্বসন গ্যাস, হরমোন ও গ্লুকোজের মাত্রা।

২। স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন চেষ্টীয় (motor) কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন- (i) সকল পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ; (ii) সকল গ্রহিত ক্ষরণ; (iii) সকল আন্তর্যন্তীয় (visceral) অঙ্গের কার্যকলাপ ইত্যাদি।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ

১। অঙ্গসংযোগিক দিক থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, যথা-

(ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system-CNS): এটি মস্তিষ্ক (brain) এবং সুমন্দাকাণ্ড (spinal cord) নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে জটিল অংশ। এটি করোটিকার (cranium) মধ্যে সুরক্ষিত থাকে এবং নিউরন (100 বিলিয়ন), নিউরোগ্লিয়া ও এপেনডাইমা সমন্বিত নিউরাল কলা দ্বারা গঠিত। এর অভ্যন্তরে তরলপূর্ণ চারটি গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল থাকে। মস্তিষ্কের পেছন হতে একটি তরলপূর্ণ নালি সুমন্দাকাণ্ড (spinal cord) সৃষ্টি হয়ে সমষ্টি মেরুদণ্ড ব্রাবৰ প্রসারিত থাকে। এটি মেরুদণ্ডের নিউরাল আর্চ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং নিউরন (1 বিলিয়ন), শ্বয়ান কোষ (Schwann cell) ও সেটেলাইট কোষ (satellite cell) সমন্বিত নিউরাল কলা দ্বারা গঠিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মেনিঙ্গেস (meninges) নামক দৃঢ় ও মজবুত পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। মস্তিষ্কের গহ্বর ও সুমন্দাকাণ্ডের নালিতে (নিউরাল নালি) বিদ্যমান তরলকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লাইড (cerebrospinal fluid) বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র হতে সংবেদ অঙ্গে করে এবং উপর্যুক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে।

(খ) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system-PNS): কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে অবস্থিত সকল স্নায়ু এবং স্নায়ুকোষ নিয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এটি মস্তিষ্ক হতে উত্তৃত 12 জোড়া করোটিক স্নায়ু (cranial nerves), সুমন্দাকাণ্ড হতে উত্তৃত 31 জোড়া সুমন্দাকাণ্ড স্নায়ু (spinal nerves), বিভিন্ন সিমপ্যাথেটিক ও অটোনোমিক স্নায়ু এবং এদের গ্যাংলিয়া ও প্লেক্স নিয়ে গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুগুলো মূলত নিউরনের অ্যাক্সন অংশ দিয়ে গঠিত। এসব কোষের মূলদেহের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং কিছু কিছু গ্যাংলিয়াতে অবস্থান করে। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দেহাভ্যন্তর ও পরিবেশ হতে সংবেদ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সৃষ্টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অঙ্গে প্রেরণ করে।

২। শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে স্নায়ুতন্ত্র দুই ধরনের, যথা-

(ক) সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic nervous system): এরা দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন- পেশি, ত্বক, মিউকাস পর্দা, টেনডন, সঙ্কি ইত্যাদিতে প্রসারিত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য এদের স্বয়ংক্রিয় বা ভলান্টারি স্নায়ুতন্ত্র বলে। সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ।

(খ) ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র (Visceral nervous system): এরা দেহের বিভিন্ন ভিসেরাল অংশ যেমন- গ্রস্তি, পৌষ্টিকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র ইত্যাদিতে প্রসারিত থেকে সংবেদ সংগ্রহ করে এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ।

স্নায়ুকলার গঠন (Structure of nervous tissue)

স্নায়ুকলা দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। নিউরন (neurone) নামক একক কোষ দিয়ে স্নায়ুকলা গঠিত। তবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনকে অবলম্বন দেয়ার জন্য নিউরোগ্লিয়া (neuroglia) নামক বিশেষ ধরনের কলা থাকে।

নিউরন (Neurone)

স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যাবলি উহার গাঠনিক উপাদান নিউরন কোষ দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রতিটি নিউরনই কাজের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সমতুল্য। তাই নিউরনকে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয়। সাধারণ কোষের মতো স্বাভাবিক উপাদান দিয়েই নিউরন গঠিত হলেও এরা পরম্পর সংযুক্ত হয়ে একটি জটিল নেটওয়ার্ক গঠন করে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নিউরন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- (ক) সোমা, (খ) আক্সন ও (গ) ডেনড্রাইট।

(ক) সোমা (Soma/cell body): নিউরনের যে অংশে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে সোমা বা কোষদেহ বলে। এটি যে কোষঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে তাতে রিসেপ্টর ও আয়ন চ্যানেল থাকে। কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াস বৃহৎ এবং বারক্স (Barr bodies) সমৃদ্ধ। নিউরনের সাইটোপ্লাজমকে নিউরোপ্লাজম (neuroplasm) বলে। দেহের অন্য কোষের মতো এটি

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলগি বস্তু ও অসংখ্য মাইটোকভিয়া সমৃদ্ধ থাকে। এছাড়া নিউরোপ্লাজমে অসংখ্য নিউরোফাইব্রিল (neurofibrils) ও নিস্ল দানা (nissl granules) থাকে। নিসল দানা প্রকৃতপক্ষে রাইবোসোম গুচ্ছ যেগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

(খ) অ্যাক্সন (Axon): নিউরনের সোমা হতে সৃষ্টি বেশ লম্বা অভিক্ষেপকে অ্যাক্সন বলে। সোমার যে স্থান থেকে অ্যাক্সন সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাক্সন হিলোক (axon hillock) বলা হয়। অ্যাক্সনটি নিউরোলেমা (neurolema) নামক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

নিউরোলেমার নিচে প্রোটিন-লিপিড নির্মিত একটি বিচ্ছিন্ন আবরণ থাকে। একে মেডুলারি আবরণ (medulary sheath) বা মায়েলিন আবরণ (myelin sheath) বলে। তবে সব অ্যাক্সনে মেডুলারি আবরণ থাকে না। মেডুলারি আবরণের বিচ্ছিন্ন স্থানে নিউরোলেমা অ্যাক্সনের সংস্পর্শে চলে আসে। এতে অ্যাক্সনের বাইরের দিকে কতগুলো সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এসব সংকোচনকে র্যানভিয়ারের নোড (node of Ranvier) বলে। অ্যাক্সনের প্রান্তভাগ শাখাবিত্ত এবং প্রতিটি শাখার শীর্ষভাগ ফীত হয়ে টার্মিনাল নব (terminal knobs) বা টার্মিনাল বাটন গঠন করে। অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্বীপনা সোমা হতে অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের দিকে প্রেরিত হয়।

(গ) ডেনড্রাইট (Dendrites): নিউরনের সোমা হতে সৃষ্টি খাটো ও শাখাবিত্ত অভিক্ষেপকে ডেনড্রাইট বলে। কোষে সাধারণত এদের সংখ্যা একাধিক থাকে, তবে কোনো কোনো নিউরন ডেনড্রাইট বিহীন। সেনসরি নিউরনে একটি লম্বা ও সরু ডেনড্রাইট থাকে। মটর নিউরনে অনেকগুলো মোটা ডেনড্রাইট থাকে। ডেনড্রাইটে দানাদার ও তন্ত্রময় নিউরোপ্লাজম প্রসারিত থাকে। সকল ডেনড্রাইটের প্রান্তভাগ শাখাবিত্ত থাকে যার মাধ্যমে উহা অন্য একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে। ডেনড্রাইটের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্বীপনা সোমার দিকে প্রেরিত হয়।

. স্নায়ুতত্ত্বে নিউরনের সোমা বা কোষদেহ ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে ঘে ম্যাটার (grey matter) এবং অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট একত্রিত হয়ে হোয়াইট ম্যাটার (white matter) সৃষ্টি করে। মানবদেহের সবচেয়ে পুরাতন ও লম্বা কোষ হলো নিউরন। নিউরনের আকার অনেক বড় হতে পারে, যেমন- কর্টিকোস্পাইনাল বা প্রাইমারি অ্যাফারেন্ট নিউরন কয়েক ফুট লম্বা হয়ে থাকে। যদিও দেহের অন্যসব কোষের মৃত্যু ও প্রতিস্থাপন ঘটে কিন্তু নিউরনের মৃত্যু হলে প্রতিস্থাপন ঘটে না।

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
১। একটি নিউরনে একটি অ্যাক্সন থাকে।	১। একটি নিউরনে এক বা একাধিক ডেনড্রাইট থাকে।
২। কোষের অ্যাক্সন হিলোক থেকে উৎপন্ন হয়।	২। কোষের যে কোন স্থান থেকে উৎপন্ন হয়।
৩। আকারে লম্বা (০.২৫-১০মিমি এর উপরে), সম ব্যাস সম্পর্কে।	৩। আকারে খাটো (১.৫মিমি এর নিচে), প্রান্তের দিকে ক্রমশ সরু।



চিত্র ৮.১ একটি নিউরন

অ্যাক্সন

৪। সাধারণত অশাখ; শাখাবিত হলে সংখ্যায় কম ও দূরে বিস্তৃত।

৫। প্রান্তভাগ শাখাবিত এবং প্রতিটি শাখার শীর্ষভাগ স্কীত হয়ে টার্মিনাল নব গঠন করে।

৬। প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে।

৭। মটর বা আজ্ঞাবহ অর্থাৎ স্নায়ু উদ্দীপনা সোমা থেকে প্রেরিত হয়।

৮। মায়েলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

ডেন্ড্রাইট

৪। সাধারণত শাখাবিত ও নিকট বিস্তৃত।

৫। প্রান্তভাগ শাখাবিত কিন্তু কোন টার্মিনাল নব গঠন কওন না।

৬। প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে না।

৭। সেনসরি বা সংবেদী অর্থাৎ স্নায়ু উদ্দীপনা সোমার দিকে প্রেরিত হয়।

৮। কোন মায়েলিন আবরণ থাকে না।

গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার কেন?

স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনের অসংখ্য কোষদেহ ও অল্প সংখ্যক অ্যাক্সন ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে গ্রে ম্যাটার গঠন করে। জীবত গ্রে ম্যাটার প্রকৃতপক্ষে সামান্য হলুদ বা গোলাপী দাগসহ হালকা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রক্তের কৈশিক জালিকা ও নিউরন কোষদেহের সমন্বয়ে এ বর্ণের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অসংখ্য মায়েলিনযুক্ত অ্যাক্সন ও ডেন্ড্রাইট এবং অল্প সংখ্যক কোষদেহ একত্রিত হয়ে হোয়াইট ম্যাটার সৃষ্টি করে। জীবত হোয়াইট ম্যাটার সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। অ্যাক্সনের মায়েলিন আবরণের সাদা বর্ণের কারণে হোয়াইট ম্যাটার সাদা দেখায়।

নিউরনের প্রকার

(ক) অভিক্ষেপের সংখ্যানুযায়ী নিউরন ৫ ধরনের, যেমন-

১। অমেরু নিউরন (Apolar): এক্ষেত্রে নিউরনের কোন ডেন্ড্রাইট থাকে না। অ্যাডরেনাল মেডুলার ক্রোমাফিন নিউরন এ প্রকৃতির।

২। একমেরু নিউরন (Unipolar): এক্ষেত্রে নিউরনের একটি প্রলম্বিত অভিক্ষেপ থাকে। স্পাইনাল কর্ড ও সকল বর্ধনশীল স্নায়ুকোষই এ প্রকৃতির।

৩। ভাস্ত-মেরু নিউরন (Pseudo-polar): এ ধরনের নিউরনে অ্যাক্সন ও ডেন্ড্রাইট একত্রে মিলিত হয়ে T আকৃতির গঠন সৃষ্টি করে। স্পাইনাল কর্ডে পাওয়া যায়।

৪। দ্বিমেরু নিউরন (Bipolar): এক্ষেত্রে নিউরনের একদিকে একটি অ্যাক্সন ও অন্যদিকে একটি ডেন্ড্রাইট থাকে। চোখের রেটিনার স্নায়ুতে, অত্কণ ও অলফ্যাট্টির স্নায়ুতে এ ধরনের নিউরন থাকে।

৫। বহুমেরু নিউরন (Multipolar): এ ধরনের নিউরনে একটি প্রলম্বিত অ্যাক্সন ও কয়েকটি খাটো ডেন্ড্রাইট থাকে। মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের অধিকাংশ নিউরনই এ প্রকৃতি।

(খ) কাজের উপর ভিত্তি করে নিউরন ৩ ধরনের, যথা-

১। সংজ্ঞাবাহী নিউরন (Sensory neurons): এরা বিভিন্ন সংবেদ প্রাহক অঙ্গ (ত্বক, চোখ, নাক, জিহ্বা, কান) থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে।

২। আজ্ঞাবাহী নিউরন (Motor neurons): এরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা ইফেক্টর অঙ্গে (পেশি, গ্রহি) প্রেরণ করে।

৩। আন্তঃসংযোগী নিউরন (Inter neurons): এরা সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অধিকাংশ আন্তঃসংযোগী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থিত।

নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (central nervous system) নিউরনগুলোকে সমর্থন দেয়ার জন্যে বিশেষ ধরনের কিছু স্নায়ুকুলা থাকে, এদের নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরোগ্লিয়াতে তিনি ধরনের কোষ থাকে, যেমন- অ্যাস্ট্রোসাইট, অলিগোডেনড্রোসাইট ও জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র-৩০



চিত্র ৮.২ বিভিন্ন ধরনের নিউরন

মাইক্রোগ্লিয়া। এসব কোষ কোন সিন্যাপস গঠন করে না কিন্তু বিভাজিত হতে পারে, তবে এদের কোন উদ্দীপনা পরিবহন ক্ষমতা নেই। মানুষের মন্ডিলে যে টিউমার হয় উহা মূলত নিউরোগ্লিয়ার অ্যাস্ট্রোসাইট কোষের অস্থাভাবিক বিভাজনের ফল।

১। **অ্যাস্ট্রোসাইট (Astrocytes):** এ কোষগুলো তারকাকৃতির এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত অসংখ্য সাইটোপ্লাজমিক অভিক্ষেপযুক্ত। অন্যান্য কোষের মতো সকল অঙ্গাদুই এগুলোতে বিদ্যমান। এদের অভিক্ষেপ দ্বারা এরা একদিকে রক্তজালিকা এবং অন্যদিকে নিউরনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে।

২। **অলিগোডেনড্রোসাইট (Oligodendrocytes):** এ কোষগুলো আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট এবং কম অভিক্ষেপযুক্ত। এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণী গঠন করে।

৩। **মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia):** এগুলো ক্ষুদ্র কোষ। এদের দেহে অসংখ্য লম্বা, সরু ও জটিল আঁকাবাঁকা ধরনের অভিক্ষেপ থাকে। রক্ত থেকে এদের উৎপত্তি হয় বলে ধারণা করা হয়। এরা গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটেসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।



চিত্র ৮.৩ বিভিন্ন ধরনের নিউরোগ্লিয়াল কোষ।

নিউরোট্রাসমিটার (Neurotransmitters)

যে সব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃস্ত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা কোনো প্রতিক্রিয়াকারী কোষে পরিবহন করে তাদের নিউরোট্রাসমিটার বলে। নিউরন নিঃস্ত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য যখন রক্তে প্রবেশ করে এবং হরমোনের মত কাজ করে তখন তাকে নিউরোহর্মোন (neurohormone) বলে। স্নায়ু প্রাণ্ত থেকে নিঃস্ত রাসায়নিক বস্তু যখন বহিকোষীয় তরল (ECF) বা কোনো সুনির্দিষ্ট অঙ্গে মুক্ত হয় তখন তাকে নিউরোসিক্রেশন (neurosecretion) বলে। দেহে অসংখ্য রাসায়নিক বস্তু আছে যেগুলো স্নায়ুতন্ত্রে ট্রান্সমিটার হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু কেবল নিউরোট্রাসমিটার হিসেবে সে সব রাসায়নিক পদার্থই গণ্য হয় যেগুলো-

(i) কেবল সংশ্লিষ্ট নিউরনে সংশ্লিষ্ট হয়। (ii) প্রিসিন্যাপটিক প্রান্তে সংঘিত থাকতে পারে। (iii) কেবল সিন্যাপসে মুক্ত হয়। (iv) পোস্টসিন্যাপটিক মেম্ব্রেনে সুনির্দিষ্ট রিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয়। (v) ক্রিয়া শেষে খুব দ্রুত উপযোগী মাধ্যম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কয়েকটি নিউরোট্রাসমিটার হলো:

জৈব অ্যামিন

: ইপিনেফ্রিন, ডোপামিন, হিস্টামিন, সেরোটোনিন, নরইপিনেফ্রাইন।

পেপটাইড

: এন্ডোরফিন, ডাইনোফিন, সাব্সটেল-P, নিউরোটেনসিন, সোমাটোস্টেটিন।

অ্যামিনো অ্যাসিড

: GABA, গ্লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড।

অন্যান্য-

: অ্যাডিনোসিন, ATP, নাইট্রিক অক্সাইড, CO, অ্যাসেটিলকোলিন, প্রোস্টাগ্লাবিন।

সিন্যাপস (Synapse: Greek, *syn*: union, association)

দুটি নিউরনের সংযোগস্থল, যার মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা বা তথ্য এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে প্রেরিত হয় তাকে সিন্যাপস বলে। ব্রিটিশ নিউরোলজিস্ট Charles Sherrington (1897) সর্বপ্রথম সিন্যাপস শব্দটি ব্যবহার করেন। এগুলো স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কার্যকরি উপাদান। নিউরনগুলোর তড়িৎরাসায়নিক যোগাযোগ এখানেই ঘটে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই প্রান্তীয় স্নায়ু দ্বারা গৃহীত উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং কেন্দ্রের নির্দেশাবলি প্রান্তের সুনির্দিষ্ট অঙ্গে পৌছায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল উচ্চতর কার্যাবলি যেমন- সমন্বয়, শিক্ষণ, স্মৃতি ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভব হয় কেবল সিন্যাপসের কারণে। নতুন সিন্যাপস সৃষ্টি কিংবা সিন্যাপসের পরিবর্তন প্রাণীর জীবনকালব্যাপী অবিরাম চলতে থাকে।

সিন্যাপসের গঠন

দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে প্রিসিন্যাপটিক নিউরন বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনকে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন বলে।

প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের প্রিসিন্যাপটিক মেম্ব্রেন এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের পোস্টসিন্যাপটিক মেম্ব্রেন সম্পর্কিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি মেম্ব্রেনের মাঝে প্রায় 20 ন্যানেমিটার ফাঁক থাকে। এ ফাঁককে সিন্যাপটিক ক্লেফট (synaptic cleft) বলে। প্রিসিন্যাপটিক মেম্ব্রেন প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে সিন্যাপটিক নব (synaptic knob) বলে। এ নবের ভেতরে অসংখ্য নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ও মেম্ব্রেন আৰুত সিন্যাপটিক ভেসিকল (synaptic vesicles) থাকে। এছাড়া এতে মাইটোকন্ড্রিয়া, মসৃণ এডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মাইক্রোফিলামেন্ট ও নিউরোফিলামেন্ট বিদ্যমান থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক মেম্ব্রেন সংশ্লিষ্ট নিউরনের সোমা বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

সিন্যাপসের প্রকারভেদ

স্নায়ুতন্ত্রে সিন্যাপস অসংখ্য এবং ধারণা করা হয় এদের সংখ্যা প্রায় 10^{14} । এসব সিন্যাপস বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন নামের হয়ে থাকে। নিউরন অংশের সংযুক্তির ধরন অনুযায়ী সিন্যাপস 4 প্রকার, যথা-

১। **অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক (Axodendritic):** একেতে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে।

২। **অ্যাক্সোসোমাটিক (Axosomatic):** একেতে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের সোমা বা কোষদেহের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩। **অ্যাক্সোঅ্যাক্সোনিক (Axoaxonic):** একেতে একটি নিউরনের অ্যাক্সন অংশ অন্য নিউরনের অ্যাক্সনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৪। **ডেনড্রোডেনড্রাইটিক (Dendrodendritic):** একেতে একটি নিউরনের ডেনড্রাইট অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে।

সিন্যাপসের কাজ:

১। এগুলো এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে স্নায়ু উদ্বীপনা প্রেরণ করে এবং তথ্যের প্রেরণ কেন্দ্র (relay station) হিসেবে কাজ করে।

২। এরা নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ ক্ষরণ করে এবং প্রচঙ্গ উত্তেজনায় এসব ক্ষরণ হ্রাস করে স্নায়ু উদ্বীপনা নিয়ন্ত্রণ করে।

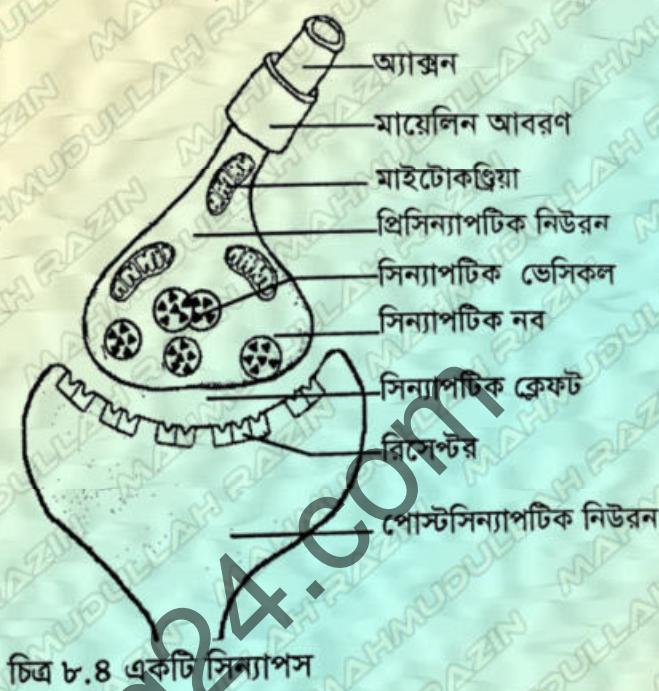
৩। এরা স্নায়ু উদ্বীপনা বাছাই করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে এবং উদ্বীপনার একমূখ্য প্রবাহের নিশ্চিত করে।

৪। এরা বিভিন্ন নিউরনের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় এবং স্নায়ু উদ্বীপনার গতিপথ নির্ধারণ করে।

স্নায়ু উদ্বীপনা পরিবহন (Nerve impulse transmission)

অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্বীপনা পরিবহন (Axonal transmission)

স্নায়ু উদ্বীপনা কতগুলো ধারাবাহিক রাসায়নিক ক্রিয়ার সমাহার। প্রতিটি নিউরন স্নায়ু উদ্বীপনা গ্রহণ করে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করে এবং অবিরাম উদ্বীপনা প্রবাহ নিশ্চিত করে। কতগুলো রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নিউরনের ডেনড্রাইট স্নায়ু উদ্বীপনা গ্রহণ করে এবং অ্যাক্সনের মাধ্যমে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করে। একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু উদ্বীপনা প্রবাহিত



চিত্র ৮.৪ একটি সিন্যাপস



চিত্র : ৮.৫ বিভিন্ন ধরনের সিন্যাপস

হতে 7 মিলিসেকেন্ড সময় লাগে যা আলোর গতির চেয়ে বেশি। অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্বৃত্তি পরিবহন নিম্নে বর্ণনাকৃত 6টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১। পোলারাইজেশন (Polarization): নিউরন যখন উদ্বৃত্তি থাকে না তখন তাকে পোলারাইজড (polarized) অবস্থা বলে। এ অবস্থায় নিউরন পর্দার বাইরের দিক ধনাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত (+) এবং ভেতরের দিক ঋণাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত (-) থাকে। অ্যাক্সনের ভেতরের তরল বা অ্যাক্সোপ্লাজমে K^+ অধিক ঘনত্বে এবং অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে Na^+ অধিক ঘনত্বে বিরাজ করে। এ অবস্থায় নিউরন পর্দায় একটি Na^+/K^+ চাপ থাকে যা K^+ কে ভেতরে এবং Na^+ কে বাইরে পাঠায়।

২। স্থির বিভব (Resting potential): নিউরন পোলারাইজড থাকা অবস্থায় অ্যাক্সনের বাইরে ও ভেতরে তড়িৎ চার্জের পার্থক্যের কারণে অ্যাক্সন মেম্ব্রেনে যে তড়িৎ বিভব বজায় থাকে তাকে স্থির বিভব বলে। নিউরন উত্তোজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা বজায় থাকে।

৩। ক্রিয়া বিভব (Action potential): পোলারাইজড নিউরনের অ্যাক্সন মেম্ব্রেনের কোনো স্থান উদ্বৃত্তি হলে সেস্থানের ভেদ্যতার ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে মেম্ব্রেনের বাইরের Na^+ আয়ন অ্যাক্সনের ভেতরে প্রবেশ করে ডিপোলারাইজেশন (depolarization) ঘটায় অর্থাৎ মেম্ব্রেনের বাইরের দিক ঋণাত্মক ও ভেতরের দিক ধনাত্মক তড়িৎ চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে। এসময় অ্যাক্সন মেম্ব্রেনে যে তড়িৎ বিভব (পার্থক্য) সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিয়া বিভব বলে।



চিত্র ৮.৬ অ্যাক্সনের মধ্যদিয়ে স্নায়ু উদ্বৃত্তি পরিবহন

৪। রিপোলারাইজেশন (Repolarization): অ্যাক্সোপ্লাজম Na^+ দ্বারা সম্পৃক্ত হলে নিউরনের অ্যাক্সন মেম্ব্রেনের একই পথে অ্যাক্সোপ্লাজম থেকে K^+ বের হয়ে যেতে থাকে। এভাবে এক সময় অ্যাক্সন মেম্ব্রেনের উভয় দিকের তড়িৎ সাম্যাবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়। এটি পোলারাইজেশন অবস্থার বিপরীত বলে একে রিপোলারাইজেশন বলে।

৫। হাইপারপোলারাইজেশন (Hyperpolarization): রিপোলারাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে নিউরন পর্দার বাইরে ও ভেতরে যথাক্রমে K^+ ও Na^+ পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে। একে হাইপারপোলারাইজেশন বলে। এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী হয়।

৬। রিফ্রাক্টরি পিরিয়ড (Refractory period): স্নায়ু উদ্বৃত্তি নিউরন অতিক্রম করার সাথে সাথে ক্রিয়া বিভবের সমাপ্তি ঘটে এবং নিউরন পর্দা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ পর্দার বাইরের Na^+ ও ভেতরের K^+ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। একে নিউরনের রিফ্রাক্টরি পিরিয়ড বলে এবং এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মায়েলিন আবরণযুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা স্নায়ু উদ্বৃত্তি পরিবহন

অ্যাক্সন মায়েলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকলে উহা বহিঃকোষীয় তরলের সংস্পর্শে আসতে পারে না। কেবল র্যান্ডিয়ারের নোড বরাবর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং স্নায়ু উদ্বৃত্তি এক নোড হতে অন্য নোডে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিবাহিত হয়। এতে স্নায়ু উদ্বৃত্তি পর্দার স্বাভাবিক গতি দ্রুত হয়। মায়েলিন আবরণযুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা এধরনের দ্রুত গতির স্নায়ু উদ্বৃত্তি পরিবহনকে লাফিয়ে লাফিয়ে সঞ্চালন বা স্যাল্টাটরি কনডাকশন (saltatory conduction; Latin *saltare*, to leap) বলে।

সিন্যাপ্সের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্বীপনা পরিবহন (Synaptic transmission)

সিন্যাপ্সের মাধ্যমে উদ্বীপনা পরিবহন পদ্ধতিকে synaptic transmission বলে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এটি নিম্নরূপে সংঘটিত হয়-

১। স্নায়ু উদ্বীপনা প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের সাইন্যাপটিক নবে পৌছালে উহার মেম্ব্রেন উত্তেজিত হয় এবং এর ভেদ্যতা বেড়ে যায়।

২। এতে বহিঃকোষীয় তরল থেকে প্রচুর পরিমাণ Ca^{++} সিন্যাপটিক নবে প্রবেশ করে। এখানে Ca^{++} মাইটোকন্ড্রিয়ার ATP-age এনজাইমকে সক্রিয় করে।

৩। ATP-age এনজাইম ATP থেকে জৈবশক্তি মুক্ত করে যা সিন্যাপটিক নবে বিদ্যমান ভেসিকলগুলোকে বিদীর্ণ করে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থসমূহ (অ্যাসিটালকোলিন) বিমুক্ত করে।

৪। নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থসমূহ ব্যাপন পদ্ধতিতে সিন্যাপটিক ক্লেফট অতিক্রম করে পোস্ট সিন্যাপটিক মেম্ব্রেনে অবস্থিত রিসেপ্টরের সাথে মিশে নিউরোট্রান্সমিটার-রিসেপ্টর যোগ গঠন করে।

৫। যোগটি পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন পর্দার ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে বহিঃকোষীয় তরল থেকে Na^{+} আয়ন পর্দার ভেতরে প্রবেশ করে এবং একই সাথে K^{+} পর্দার বাইরে চলে আসে।

৬। Na^{+} ও K^{+} আদান-প্রদানে পোস্টসিন্যাপটিক মেম্ব্রেন-এ membrane potential বা action potential সৃষ্টি হয় যা একটি সংকেত সৃষ্টির মাধ্যমে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের দিকে প্রবাহিত হয়।

প্রত্যাখ্যাত কোলিন পুণঃশোষণ

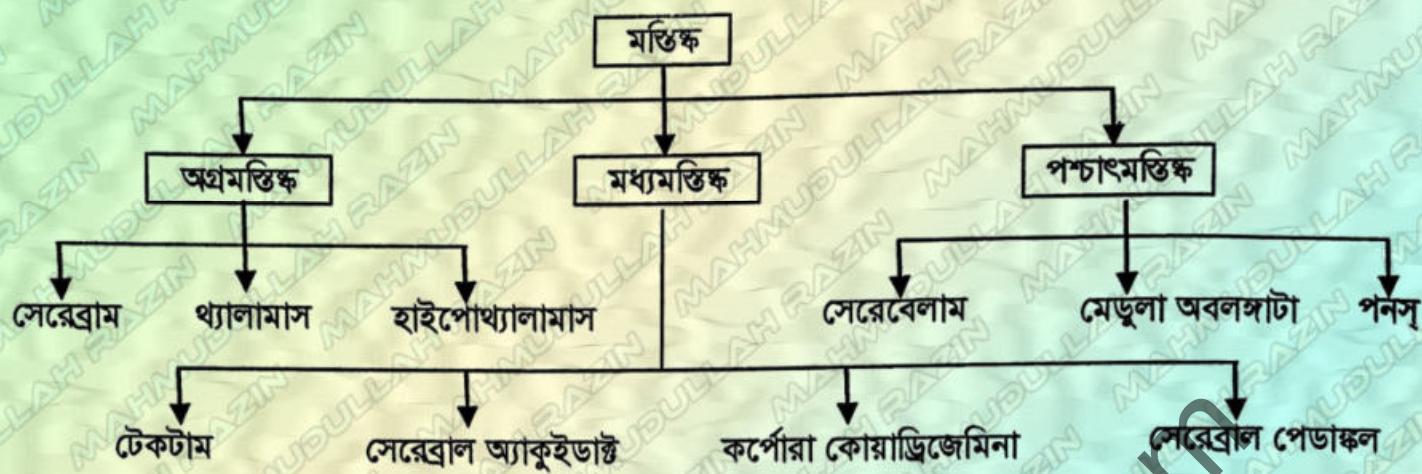


৮.২ মন্তিক: গঠন ও কাজ (Brain: Structure and Functions)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষীত, বৃহৎ ও জটিল অংশ মানুষের করোটির (skull) সুরক্ষিত করোটিকার (cranium) মধ্যে অবস্থান করে এবং দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, বিশাল তথ্যরাশির প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ করে তাকে মন্তিক বা ব্রেইন বা এনসেফালন (brain or encephalon) বলে। জ্ঞানীয় বিকাশের সময় এন্টোডার্ম থেকে সৃষ্টি নিউরাল টিউবের সামনের অংশ ক্ষীত হয়ে মন্তিক গঠন করে। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব মন্তিকই সবচেয়ে জটিল। এর জটিলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ Sir Charles Sherrington একে “great ravelled knot” বা ‘বৃহৎ জটপাকানো গাঁট’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাণীবয়স্ক মানুষের মন্তিকের আয়তন পুরুষের প্রায় 1500 সিসি ও মহিলাদের প্রায় 1300 সিসি এবং গড় ওজন প্রায় 1.3-1.4 কেজি যা দেহের মোট ওজনের 2% গঠন করে। এতে প্রায় 100 বিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) নিউরন এবং 1 বিলিয়ন (একশত কোটি) সমর্থনকারী কোষ নিউরোগ্লিয়া থাকে।

মানব জগের প্রাথমিক অবস্থায় মন্তিক প্রধান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ মানুষে এটি আরো জটিলরূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। মানব জগের মন্তিকের গঠনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মন্তিকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

- ১। অগ্রমন্তিক বা প্রোসেনসেফালন (Fore brain or procencephalon),
- ২। মধ্যমন্তিক বা মেসেনসেফালন (Mid brain or mesencephalon) এবং
- ৩। পশ্চাত্মন্তিক বা রম্বেনসেফালন (Hind brain or rhombencephalon)।



১। অগ্রমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন: অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা-সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস।

(ক) সেরেব্রাম বা টেলেনসেফালন (Cerebrum or telencephalon): সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে উপরের অংশ। এটি মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 80% গঠন করে এবং অন্যান্য অংশকে টেকে রাখে। একটি অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ দ্বারা বিভক্ত দুটি সেরেব্রাল হেমিফিয়ার (cerebral hemisphere) সমন্বয়ে সেরেব্রাম গঠিত। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ (lateral ventricle) বলে। সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তরকে সেরেব্রাল কর্টেক্স (cerebral cortex) বলে। এর ভেতরের অপেক্ষাকৃত পাতলা ও স্নায়ুতন্ত্র সমৃদ্ধ হোয়াইট ম্যাটার (white matter) নির্মিত স্তরকে সেরেব্রাল মেডুলা (cerebral medulla) বলে।

সেরেব্রাল কর্টেক্সের বহির্ভূত কুণ্ডলিত হয়ে অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি করে। এসব ভাঁজের উচু স্থানসমূহকে জাইরি (বহুবচন-gyri, একবচন-gyrus) এবং নিচু স্থানসমূহকে সালকি (বহুবচন-sulci, একবচন-sulcus) বলে। এতে সেরেব্রামকে 5টি খঙ্গে বা লোবে বিভক্ত দেখা যায়। যেমন- ফ্রন্টাল লোব (frontal lobe), প্যারাইটাল লোব (parietal lobe), টেম্পোরাল লোব (temporal lobe), অক্সিপিটাল লোব (occipital lobe) এবং লিম্বিক লোব (limbic lobe)।

সেরেব্রামের কাজ: সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, সূজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রযুক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এটি দেহের সকল ঐচ্ছিক পেশির সংঘালন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই মস্তিষ্কের এ অঞ্চল আঘাত প্রাপ্ত হলে মানুষ প্যারালাইজড হয়ে যায়।

(খ) থ্যালামাস (Thalamus): সেরেব্রামের নিচের দিকে মেডুলা সংলগ্ন দুটি ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকৃতির থ্যালামাস থাকে। এগুলো প্রে ম্যাটার (grey matter) দিয়ে গঠিত। একটি স্নায়ুরজ্জুর যোজক দ্বারা এরা পরম্পর সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি থ্যালামাসের সাথে প্রে ম্যাটারে পঠিত একটি পিণ্ডাকার বেসাল গ্যাংগলিয়া (basal ganglia) যুক্ত থাকে।

থ্যালামাসের কাজ: এটি গন্ধ ব্যতীত সকল সংবেদী উপাত্তকে সমন্বয় করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে। এটি স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। এটি বিভিন্ন ভিসেরাল ও সোমাটিক কাজের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এটি ব্যক্তির সচেতনতার মাত্রা ও সতর্কতার সাথে জড়িত।

(গ) হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus): থ্যালামাসের নিচে প্রে ম্যাটারের কতগুলো গুচ্ছ নিয়ে হাইপোথ্যালামাস গঠিত। এটি মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের মেঝে ও পার্শ্বপ্রাচীর গঠন করে। এর একটি অংশ নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে পিটুইটারি গ্রহি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

হাইপোথ্যালামাসের কাজ: স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রহির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ত্বক্ষা, ক্ষুধা, যৌন আকাঙ্ক্ষা জাহাত করে। ক্রোধ, ভয় ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সিটোসিন, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (antidiuretic hormone-ADH) ক্ষরণ করে। দেহের

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি (biological clock) বলে।

২। মধ্যমস্তিক্ষ (Mid brain): হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সক্ষেচিত অংশকে মধ্যমস্তিক্ষ বা মেসেনসেফালন বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত এবং মস্তিক্ষের কেন্দ্রীয় গহবরকে ধরে রাখে। অঙ্কিয়দিকে এটি একটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা পনস ও সেরেবেলামকে সেরিব্রাম হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে। মধ্যমস্তিক্ষ নিম্নের অংশগুলো নিয়ে গঠিত:

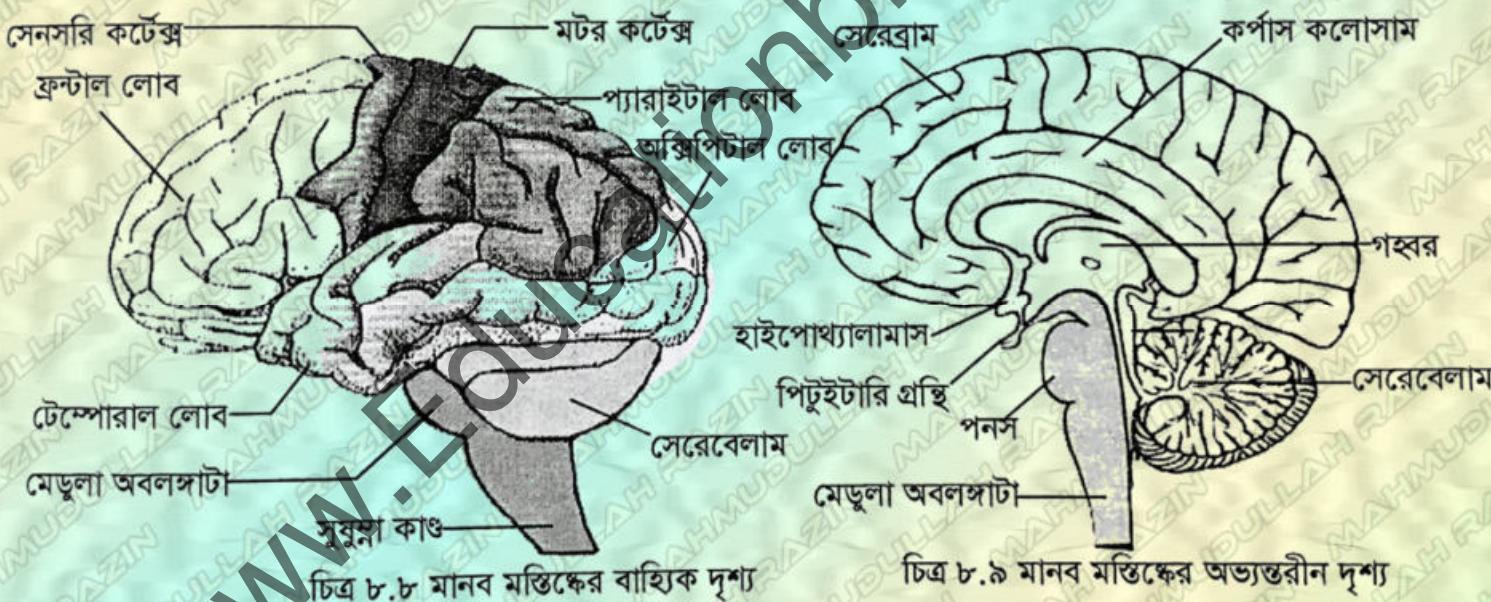
(ক) টেকটাম (Tectum): এটি মধ্যমস্তিক্ষের পৃষ্ঠীয় অংশ।

(খ) সেরেব্রাল আকুইডাক্ট (Cerebral aqueduct): এটি মধ্যমস্তিক্ষের ভেতরে অবস্থিত এবং মস্তিক্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ গহবরকে সংযুক্ত করে।

(গ) কর্পোরা কোয়াড্রেজিমিনা (corpora quadrigemina): এটি মধ্যমস্তিক্ষের পৃষ্ঠাদিকে দুটি গোলাকার খও নিয়ে গঠিত।

(ঘ) সেরেব্রাল পেডাক্যুল (cerebral peduncle): এটি মধ্যমস্তিক্ষের অঙ্কিয়ে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।

মধ্যমস্তিক্ষের কাজ: এটি অগ্র ও পশ্চাত্মস্তিক্ষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। বিভিন্ন ভিজুয়েল (দর্শন) ও অডিটরি (শ্রবণ) তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।



৩। পশ্চাত্মস্তিক্ষ (Hind brain): পশ্চাত্মস্তিক্ষ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা- সেরেবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলঙ্গাটা।

(ক) **সেরেবেলাম (Cerebelum):** করেটিকার নিম্ন-পশ্চাত্ম অংশে সেরেবেলাম অবস্থিত। এটি মস্তিক্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ যা মস্তিক্ষের প্রায় 11% গঠন করে এবং বাইরের প্রে ম্যাটার নির্মিত কর্টেক্স ও ভেতরের হোয়াইট ম্যাটার নির্মিত মেডুলারি বড়ি নিয়ে গঠিত। পরিণত মানুষের সেরেবেলামের গড় ওজন 150 থাম। একটি পেডাক্যুল বা বোঁটার সাহায্যে এটি পনসের সাথে যুক্ত থাকে। দুটি গোলাকৃতির সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ে সেরেবেলাম গঠিত যারা একটি সরু ভার্মিস (vermis) নামক স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে।

সেরেবেলামের কাজ: এটি দেহের প্রায় সকল ধরনের অনৈচ্ছিক কার্যাবলি যেমন- হাঁচি, কাশি, হেচকি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি পেশির টান, দেহের ভারসাম্য ও ভঙ্গিমা রক্ষা করে। দেহের সকল ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মাথা ও চোখের সংঘালন নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবর্ত মটর ক্রিয়ার স্মৃতি ধারণ করে।

(খ) **মেডুলা অবলঙ্গাটা (Medula oblongata):** এটি মস্তিক্ষের সবচেয়ে পেছনের অংশ। এটি একটি পিরামিড আকৃতির পুরু গঠন বিশেষ যার প্রশস্ত অংশ উপরের পনসের দিকে ক্রমশ সরু পশ্চাত্ম অংশ স্পাইনাল কর্ডের সাথে সংযুক্ত। মেডুলা

অবলঙ্গাটা লম্বায় প্রায় 3 সেন্টিমিটার, প্রস্থে 2 সেন্টিমিটার এবং পুরুষে 1.2 সেন্টিমিটার। মেডুলা অবলঙ্গাটা হতে 8টি অর্থাৎ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ও XII করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি ঘটে।

মেডুলা অবলঙ্গাটার কাজ: এটি সুস্থলাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ রচনা করে বিভিন্ন সংবেদ আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এটি খাদ্য গলাধংকরণ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তনালির সক্ষেচন-শুথন, হৎস্পন্দন, ফুসফুসের সক্ষেচন-প্রসারণ, লালাত্রাস্থির ক্ষরণ, মল-মৃত্য ত্যাগ, বমি ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

(গ) পনস (Pons): এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত সেরেবেলামের অক্ষভাগে মেডুলার সামনের দিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি স্ফীত পিণ্ডাকার গঠন। এতে বিদ্যমান পুরু স্নায়ুতন্ত্র সেরেবেলাম, মেডুলা ও সেরেব্রামের সাথে যুক্ত থাকে। পনসের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুতন্ত্রগুলো আড়াআড়িভাবে একে অপরকে অতিক্রম করে। এ আড়াআড়ি অতিক্রমের কারণে মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

পনসের কাজ : এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্র (reflex center) হিসেবে কাজ করে, শ্বসন কার্য নিয়ন্ত্রণ করে, স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ পথ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

কাজ: মস্তিষ্কের প্রধান প্রধান অংশের নাম ও এদের কাজ উল্লেখ করে একটি চার্ট তৈরি কর।

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামের মধ্যে পার্থক্য

সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
১। এটি অগ্রমস্তিষ্কের অংশ এবং পৃষ্ঠাদিকে অবস্থিত।	১। এটি পশ্চাত্মস্তিষ্কের অংশ এবং অক্ষদিকে অবস্থিত।
২। এটি মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 80% গঠন করে।	২। এটি মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের প্রায় 11% গঠন করে।
৩। দুটি সেরেব্রাল হেমিফিয়ার নিয়ে গঠিত। এরা কর্পাস ক্যালোসাম নামক পুরু স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।	৩। দুটি সেরেবেলার হেমিফিয়ার নিয়ে গঠিত। এরা ভার্মিস নামক সরু স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে।
৪। ঘে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের ভেতরে প্রবেশ করে বেসাল নিউক্লিই (basal nuclei) গঠন করে।	৪। হোয়াইট ম্যাটার ঘে ম্যাটারের ভেতরে প্রবেশ করে বৃক্ষ সদৃশ্য অ্যারবোর ভাইটি (arbor vitae) গঠন করে।
৫। সকল সংবেদী উত্থকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। এটি এক্ষেত্রে প্রেশার সংযোগ সংযোগ করে।	৫। দেহের প্রায় সকল ধরনের অনৈচ্ছিক কার্যাবলি যেমন- হাঁচি, কাশি, হেচকি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগ তরলপূর্ণ গহ্বর সমৃদ্ধ। এ গহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের এসব প্রকোষ্ঠকে ভেন্ট্রিকল (ventricles) সেরেব্রাল ভেন্ট্রিকল (Cerebral ventricles) বলে। মস্তিষ্কে মোট চারটি ভেন্ট্রিকল আছে। এদের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলে। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে পার্শ্বীয় বা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল বলে। মস্তিষ্কের গহ্বরের তরলকে সেরিব্রোস্পাইনাল তরল (cerebrospinal fluid- CSF) বলা হয়।

১। পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (Lateral ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিফিয়ারের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠদ্বয়কে (১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকল) ল্যাটারাল বা পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল বলে। দুটি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন অব মনরো (foramen of Monro) দ্বারা এরা পৃথকভাবে মধ্যমস্তিষ্কের ৩য় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকলের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

২। তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (Third ventricle): অগ্রমস্থিকের হাইপোথ্যালামাসের গহ্বরকে ৩য় ভেন্ট্রিকল বলে। এটি একটি অ্যাকুইডাষ্ট অব সিলভিয়াস (aqueduct of Silvius) দ্বারা চতুর্থ ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

৩। চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Fourth ventricle): এটি পশ্চাত্মস্থিকের মেডুলা অবলসাটার গহ্বর। এটি পশ্চাত্ম দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালির সাথে যুক্ত থাকে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মন্তিক ও স্পাইনাল কর্ড করোটিকা ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। একে মেনিনজেস বলে। মেনিনজেস তিনটি খিল্লি দ্বারা গঠিত। এছাড়া এতে রক্তনালিকা ও সেরিব্রোস্পাইনাল তরল বিদ্যমান থাকে। মেনিনজেসের খিল্লিগুলো হলো-

১। ড্যুরা ম্যাটার (Dura mater): এটি মেনিনজেসের সর্ববহিঃস্থ খিল্লিকে ড্যুরা ম্যাটার বা প্যাকাইমেনিন্স (pachymeninx) বা ড্যুরা (dura) বলে। এটি মজবুত ও পুরু এবং এতে শিরা ও সাইনাস প্রসারিত থাকে। মন্তিকের ক্ষেত্রে ড্যুরা ম্যাটার দ্বিতীয় এবং করোটিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটি একক্ষেত্রী এবং এর বাইরের ও ভেতরের দিকে ফাঁকা স্থান থাকে যাদেরকে যথাক্রমে এপি-ড্যুরাল (epi-dural) ও সাব-ড্যুরাল (sub-dural) স্পেস বলে।

[অঙ্গোপচারের সময় মানুষকে অঙ্গান করার জন্য (অ্যানেস্থেসিয়া) এপি-ড্যুরাল স্পেসে ইনজেকশনের মাধ্যমে চেতনাশক প্রদান করা হয়।]

২। অ্যারাকনয়েড (Arachnoid). মেনিনজেসের মধ্যবর্তী খিল্লিকে অ্যারাকনয়েড বলে। এটি তন্ত্রময় কলা দ্বারা গঠিত একটি অভেদ্য, পাতলা ও স্বচ্ছ খিল্লি যা কতগুলো চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। কতগুলো তরলপূর্ণ স্থান এ খিল্লি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এসব তরলপূর্ণ স্থানকে সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস (subarachnoid space) বলে। কোনো কোনো স্থানে সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস অধিক প্রসারিত থাকে। এদের সিস্টারনি (cisternae) বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রক্তনালিকাগুলো এসব স্পেসের মধ্য দিয়ে প্রসারিত থাকে।

৩। পায়া ম্যাটার (Pia mater): মেনিনজেসের সর্ব অন্তঃস্থ খিল্লিকে পায়া ম্যাটার বা পায়া বলে। এটি মন্তিক ও সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠতলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। এটি তন্ত্রময় কলা দ্বারা গঠিত একটি অভেদ্য ও অত্যন্ত পাতলা খিল্লি যার মধ্য দিয়ে রক্তনালি মন্তিক ও স্পাইনাল কর্ডকে যান্ত্রিক আঘাত হতে রক্ষা করে।

মেনিনজেসের কাজ: এটি মন্তিক ও স্পাইনাল কর্ডকে যান্ত্রিক আঘাত হতে রক্ষা করে। এটি মন্তিকের সঞ্চালনকে করোটিকার অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাকে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৃষ্ঠি পদার্থ সরবরাহ করে। এটি সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।

মেনিনজাইটিস কি?

মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে মেনিনজাইটিস (meningitis) বলে। ভাইরাস, ব্যকটেরিয়া বা অন্যকোন জীবাণু দ্বারা মেনিনজেস সংক্রমিত হলে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। *Neisseria meningitidis* নামক ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা মেনিনজেস স্বচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। মেনিনজাইটিসের প্রধান লক্ষণ হলো মাথা ব্যথা ও গ্রীবা শিথিল হয়ে যাওয়া। এছাড়া মনযোগে বিঘ্নতা, বমি, আলোক ও শব্দ সহনহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।



চিত্র ৮.১০ মন্তিকের গহ্বরসমূহ

মেনিনজেস (Meninges)



চিত্র ৮.১১ মেনিনজেসের প্রস্তুতি

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লাইড (Cerebrospinal fluid-CSF)

মন্তিক্ষের গহ্বর, সুমন্দূকাওরে কেন্দ্রীয় নালি, সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস ও সাব-অ্যারাকনয়েড সিস্টারনি যে তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লাইড বলে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্রাচীর থেকে প্রতিদিন প্রায় 500 মিলিলিটার CSF ক্ষরিত হয়। মেনিনজেস CSF ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর পরিমাণ সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়। একজন পরিণত মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সর্বদা প্রায় 120-150 মিলিলিটার CSF থাকে। এটি পানির মতো স্বচ্ছ তবে এতে কিছু লিফ্ফোসাইট কোষ থাকে। এর pH মাত্রা প্লাজমা থেকে সামান্য কম থাকে। রাসায়নিকভাবে CSF-তে প্রোটিন 20-40mg/dL, গ্লুকোজ 45-80mg/dL এবং ক্লোরাইড 720-750mg/dL থাকে। এছাড়া প্লাজমাতে বিদ্যমান সকল উপাদানই এতে বিদ্যমান থাকে। (dL=deciliter)

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লাইড এর কাজ :

- ১। **সুরক্ষা (Protection):** এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভেতরে ও বাইরে থেকে উহাকে বিভিন্ন যান্ত্রিক আঘাত হতে রক্ষা করে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।
- ২। **ভাসা (Buoyancy):** এটি মন্তিক্ষকে ভাসিয়ে রেখে এর প্রকৃত ওজন 1500 gm থেকে 50 gm-এ হ্রাস করে।
- ৩। **অপসারণ (Elimination):** এটি মন্তিক্ষ থেকে বর্জ্য পদার্থ, ইপিনেফ্রাইন ও কিছু ঔষধ অপসারণ করে।
- ৪। **পরিবহন মাধ্যম (Transport medium):** মন্তিক্ষের বিভিন্ন স্থানে হরমোন ও পুষ্টি পরিবহনে CSF মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৮.৩ করোটিক স্নায়ু (Cranial nerves)

যেসব স্নায়ু মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপন্নি লাভ করে করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে। করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্র পথে বিস্তৃত হয় বলে এদের নাম করোটিক স্নায়ু। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর করোটিক স্নায়ু 12 জোড়া। রোমান ফ্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহকে সাংকেতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। এদের কিছু সংখ্যক সেনসরি বা সংবেদী, কিছু সংখ্যক মটর বা আজ্ঞাবাহী/চেষ্টীয় এবং অন্যগুলো মিশ্র বা মিল্লড প্রকৃতির হয়ে থাকে।

- **সেনসরি স্নায়ু (Sensory nerve):** যে সব স্নায়ু কোনো সংবেদী অঙ্গ থেকে উদ্বীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা মন্তিক্ষে পৌছে দেয় তাদের সংবেদী বা সেনসরি স্নায়ু (sensory nerve) বা অ্যাফারেন্ট নার্ভ (afferent nerves) বলে। যেমন- অলফ্যাট্রি ও অপটিক স্নায়ু।
- **মোটর স্নায়ু (Motor nerve):** যে সব স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো নির্দেশ বহন করে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে পৌছে দেয় তাদের চেষ্টীয় বা আজ্ঞাবাহী বা মোটর স্নায়ু (motor nerve) বা ইফারেন্ট নার্ভ (efferent nerves) বলে। যেমন- অকুলোমোটর ও ট্রাইকলিয়ার স্নায়ু।
- **মিল্লড স্নায়ু (Mixed nerve):** কিছু স্নায়ু সংবেদী এবং আজ্ঞাবাহী উভয় ধরনের কাজ করে, এদের মিশ্র বা মিল্লড স্নায়ু (mixed nerve) বলে। যেমন- ফ্যাসিয়াল ও ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু।

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎপন্নি স্থান, শাখা, বিস্তার ও কাজ

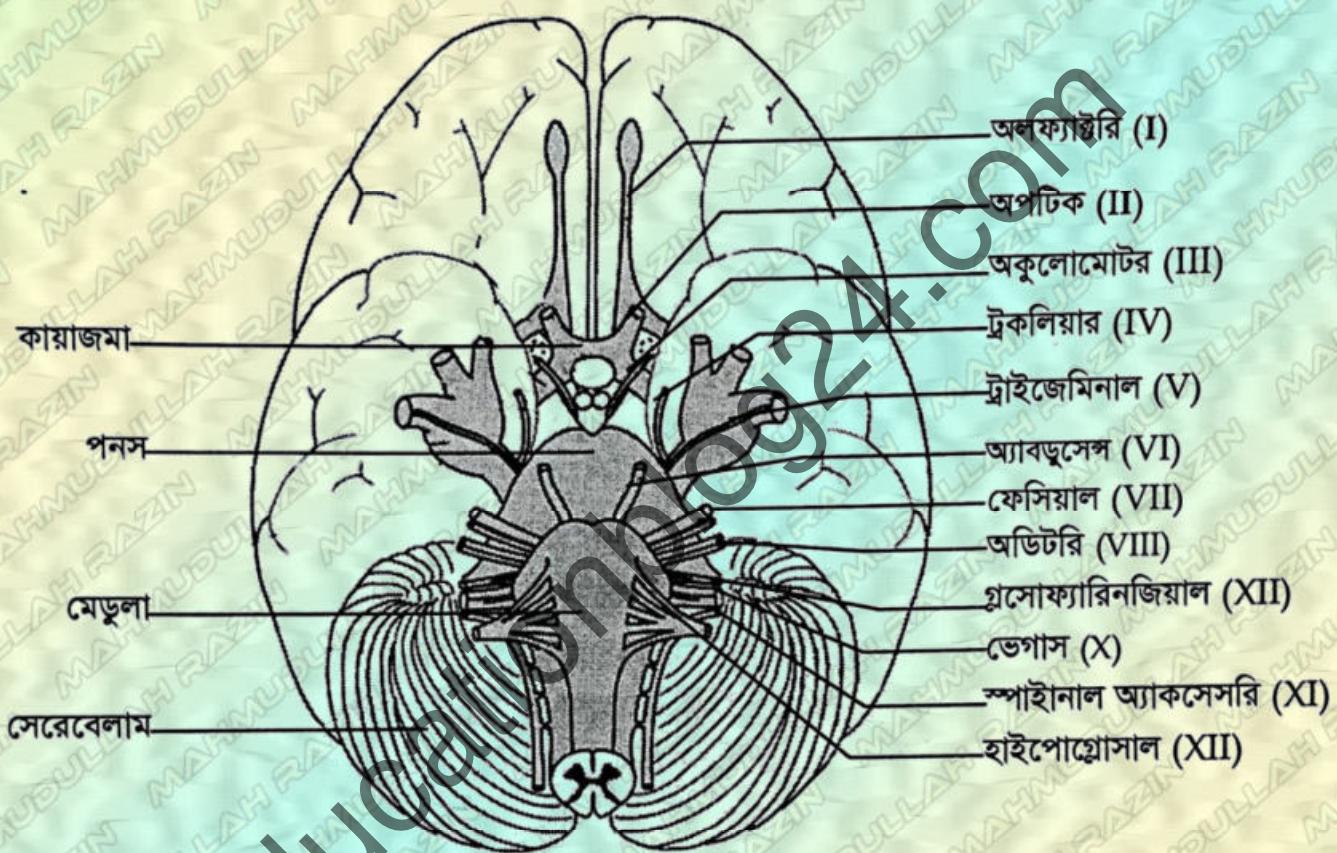
- I. **অলফ্যাট্রি (Olfactory):** এটি সেরেব্রামের অলফ্যাট্রি লোব হতে উৎপন্নি লাভ করে নাসিকা গহ্বরের মিউকাস পর্দায় বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।
- কাজ: আণ সংবেদ বহন করা এর প্রধান কাজ।
- II. **অপটিক (Optic):** এটি অগ্রমন্তিক্ষের অপটিক লোব হতে উৎপন্নি লাভ করে X আকৃতির আড়াআড়ি কায়াজমা সৃষ্টি করে চোখের রেটিনাতে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।
- কাজ: দর্শন সংবেদ বহন করা এর প্রধান কাজ।

III. অকুলোমোটর (Oculomotor): এটি মধ্যমস্তিক্ষের অক্ষ-পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি আজ্ঞাবাহী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: এটি চক্ষুপেশির সংগ্রালন নিয়ন্ত্রণ করে।

IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear): এটি মধ্যমস্তিক্ষের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি আজ্ঞাবাহী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: এটি চক্ষুপেশির সংগ্রালন নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৮.১২ মস্তিক্ষ হতে বিভিন্ন কর্ণোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি

V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal): এটি মেডুলা অবলঙ্গটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে, যেমন-

(ক) অপথ্যালমিক (Ophthalmic): এটি অক্ষিপ্ল্যাব ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীরে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি চক্ষুপ্ল্যাব ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীর থেকে সংবেদ মস্তিক্ষে প্রেরণ করে।

(খ) ম্যাক্সিলারি (Maxillary): এটি অক্ষিপ্ল্যাব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি অক্ষিপ্ল্যাব উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল থেকে সংবেদ মস্তিক্ষে প্রেরণ করে।

(গ) ম্যান্ডিবুলার (Mandibular): এটি মুখবিবরের অক্ষীয়দেশের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এটি নিম্ন চোয়ালের সংগ্রালন নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন মস্তিক্ষে প্রেরণ করে।

VI. আবডুসেন্স (Abducens): এটি মেডুলা অবলঙ্গটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চক্ষুপেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ: এটি চক্ষুপেশির সংগ্রালন নিয়ন্ত্রণ করে।

VII. ফ্যাসিয়াল (Facial): এটি মেডুলা অবলঙ্গটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে, যেমন-

(ক) প্যালেটাইন (Palatine): এটি মুখবিবরের ছাদে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু। এটি স্বাদ গ্রহণ করে।

(খ) হায়োম্যাভিবুলার (Hayomandibular): এটি মুখবিবর ও নিম্নচোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি স্বাদ গ্রহণ ও গ্রীবা সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

VIII. অডিটরি (Auditory): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে অন্তঃকর্ণ বিস্তৃতি লাভ করে। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়।

কাজ: এটি শ্রবণ সংবেদ গ্রহণ ও ডারসাম্য রক্ষা করে।

IX. গ্লসোফ্যারিনজিয়েল (Glossopharyngeal): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে জিহ্বা ও গলবিলে বিস্তৃতি লাভ করে। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি স্বাদ গ্রহণ ও গলবিল সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

X. ভেগাস (Vagus): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ গমন করে, যেমন-

(ক) ল্যারিঙ্গিয়েল (Laryngeal): এটি স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি স্বরযন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) কার্ডিয়াক (Cardiac): এটি হৃৎপিণ্ডে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) গ্যাস্ট্রিক (Gastric): এটি পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি পাকস্থলীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) পালমোনারি (Pulmonary): এটি ফুসফুসে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়। এটি ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (Spinal Accessory): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার মেঝে হতে উৎপত্তি লাভ করে গলবিল, স্বরযন্ত্র ও গ্রীবা অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি একটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়।

কাজ: এটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal): এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে জিহ্বা ও গ্রীবা অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি একটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়।

কাজ: এটি জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

একনজরে মানুষের করোটিক স্নায়সমূহের নাম, শাখা, প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও কাজ

ক্রমিক	নাম	শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
I	অলফ্যাট্টরি	-	সংবেদী	নাসিকা গহ্বর	আণ সংবেদ বহন
II	অপটিক	-	সংবেদী	চোখের রেটিনা	দৰ্শন সংবেদ বহন
III	অকুলোমোটর	-	চেষ্টীয়	চক্রপেশি	চক্রপেশির সঞ্চালন
IV	ট্রাইলিয়ার	-	চেষ্টীয়	চক্রপেশি	চক্রপেশির সঞ্চালন
V	ট্রাইজেমিনাল	অপথ্যালমিক	সংবেদী	অক্ষিপত্র, নাসিকা	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মন্তিকে প্রেরণ
		ম্যাক্রিলারি	সংবেদী	উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মন্তিকে প্রেরণ
		ম্যাভিবুলার	মিশ্র	মুখবিবরের অক্ষীয় পেশি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন
VI	অ্যাবডুসেপ	-	চেষ্টীয়	চক্রপেশি	চক্রপেশির সঞ্চালন
VII	ফ্যাসিয়াল	প্যালেটাইন	সংবেদী	মুখবিবরের ছাদ	স্বাদ গ্রহণ
		হায়োম্যাভিবুলার	মিশ্র	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	স্বাদ গ্রহণ ও গ্রীবা সঞ্চালন
VIII	অডিটরি	-	সংবেদী	অন্তঃকর্ণ	শ্রবণ সংবেদ গ্রহণ ও ডারসাম্য রক্ষা

ক্রমিক	নাম	শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
IX	গ্লোফ্যারিনজিয়াল	-	মিশ্র	জিহ্বা ও গলবিল	স্বাদগ্রহণ ও গলবিল সংযোগলন
X	ডেগাস	ল্যারিঙ্গিয়াল	মিশ্র	স্বরযন্ত্র	স্বরযন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		কাডিয়াক	মিশ্র	হৃৎপিণ্ড	হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		গ্যাস্ট্রিক	মিশ্র	পাকছলি	পাকছলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
		পালমোনারি	মিশ্র	ফুসফুস	ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে
XI	স্পাইনাল অ্যাকসেসরি	-	চেষ্টীয়	গলবিল, স্বরযন্ত্র ও গ্রীবা	মাথা ও কাঁধের পেশি সংযোগলন
XII	হাইপোগ্রোসাল	-	চেষ্টীয়	জিহ্বা ও গ্রীবা	জিহ্বার সংযোগলন নিয়ন্ত্রণ করে

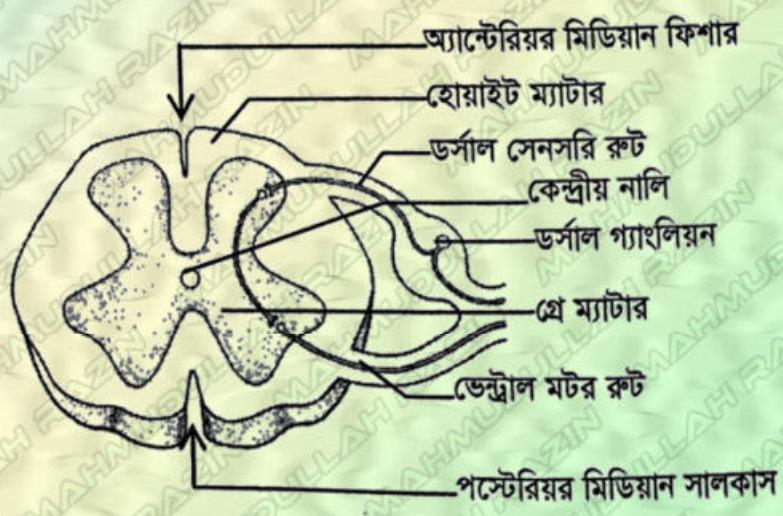
মানুষের 12 জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম ধারাবাহিকভাবে স্মরণ রাখা বেশ কঠিন। একটি ইংরেজি বাক্য মনে রাখলে করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম স্মরণ রাখা সহজ হবে, যেমন-

On occasions of training the attractive faces are greatly valued and highlighted.
(OOO-TTA-FAG-VAH)

সুমুন্নাকাণ্ড (Spinal cord)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির অংশ মস্তিষ্কের মেডুলা অবলগ্নাটার পশ্চাত অংশ হতে সৃষ্টি হয়ে মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশের নিউরাল নালির মধ্য দিয়ে লাঘার অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত থাকে তাকে সুমুন্নাকাণ্ড বলে। এটি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় 45 সেন্টিমিটার ও মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় 42 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়। সুমুন্নাকাণ্ডের প্রস্থ অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-সার্ভাইক্যাল ও লাঘার অঞ্চলে এটি 13 মিমি এবং থোরাসিক অঞ্চলে এটি 6.4 মিমি প্রস্থ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর সম্মুখ-পৃষ্ঠভাগে একটি 3 মিমি গভীর খাঁজ থাকে। একে অ্যান্টেরিয়াল মিডিয়ান ফিশার (anterior median fissure) বলে। এটি সুমুন্নাকাণ্ডের পশ্চার্ধদিকে ক্রমশ অগভীর হয়ে যায়। তখন একে পস্টেরিয়াল মিডিয়ান সালকাস (posterior median sulcus) বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় লাঘার কশেরকার সংযোগ স্থলে এসে সুমুন্নাকাণ্ড হৃষ্টাং সরু হয়ে যায়। একে কোনাস মেডুলারিস (conus medullaris) বলে। কোনাস মেডুলারিস থেকে সুমুন্নাকাণ্ডের পরবর্তী অংশ সূক্ষ্ম তন্ত্র মতো। একে ফিলিয়াম টার্মিনালি (filium terminale) বলে। এটি নন-নিউরাল প্রকৃতির এবং কক্ষিক পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। মস্তিষ্কের মতো সুমুন্নাকাণ্ড বাইরের দিকে মেনিনজেস দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে।

সুমুন্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের গহ্বর প্রসারিত থাকে। এক্ষেত্রে একে সেন্ট্রাল ক্যানাল বা কেন্দ্রীয় নালি (central canal) বলে। এ নালিতে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লাইড বিদ্যমান থাকে। সুমুন্নাকাণ্ডের ভেতরের অংশ গ্রে ম্যাটার ও বাইরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত। গ্রে ম্যাটার সুমুন্নাকাণ্ডের ভেতরে ইংরেজি H এর মতো বিস্তৃত থাকে। এটি স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া এবং রক্তনালি সমৃদ্ধ। গ্রে ম্যাটারের চারদিকে হোয়াইট ম্যাটার বিস্তৃত থাকে। এটি স্নায়ুতন্ত্র নিউরোগ্লিয়া ও রক্তনালি নিয়ে গঠিত।



চিত্র : ৮.১৩ মানুষের সুমুন্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

সুষম্নাকাণ্ডের কাজ

- ১। সুষম্না স্নায় এবং মন্তিকের মধ্যে সকল ধরনের সংবেদ আদান-প্রদান সুষম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।
- ২। এটি হাঁটা-চলার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৩। এটি হাত ও পায়ে সৃষ্ট যে কোন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- ৪। এটি ব্যথা, চাপ ও তাপ অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

সুষম্না স্নায় (Spinal nerves): সুষম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্টি মিশ্র প্রকৃতির যেসব স্নায় সুষম্নাকাণ্ড ও দেহের মধ্যে আঞ্চাবাহী, সংবেদী ও স্বয়ংক্রিয় উদ্দীপনা বহন করে তাদের সুষম্না স্নায় বলে। মোট 31 জোড়া স্নায় সুষম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে 8 জোড়া মেরুণ্ডের সারভাইক্যাল অঞ্চলে, 12 জোড়া খোরাসিক অঞ্চলে, 5 জোড়া লাষ্বার অঞ্চলে, 5 জোড়া স্যাক্রাল অঞ্চলে এবং 1 জোড়া কক্ষিজিয়াল অঞ্চলে থাকে। সকল সুষম্না স্নায়ই মিশ্র প্রকৃতির। প্রতিটি স্নায় একটি ডর্সাল সেনসরি রুট (dorsal sensory root) এবং একটি ভেন্ট্রাল মটর রুট (ventral motor root) দ্বারা সুষম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি ডর্সাল রুটের সাথে একটি ডর্সাল গ্যাংলিয়ন যুক্ত থাকে। প্রান্তের দিকে প্রতিটি সুষম্না স্নায় দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পেশিতে গমন করে।

মন্তিক ও সুষম্নাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

মন্তিক	সুষম্নাকাণ্ড
১। এটি করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে।	১। এটি মেরুণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে।
২। এটি স্ফীত ও ডিম্বাকৃতির।	২। এটি লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির।
৩। বাইরের দিকে থেকে এটি সালকি ও গাইরি ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।	৩। এটি বাইরের দিক থেকে অ্যান্টেরিয়র ও পস্টেরিয়র ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।
৪। মন্তিক হতে 12 জোড়া স্নায় সৃষ্টি হয়।	৪। সুষম্নাকাণ্ড থেকে 31 জোড়া স্নায় সৃষ্টি হয়।
৫। এটি দেহের সকল যান্ত্রিক, জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	৫। এটি সুষম্না স্নায় ও মন্তিকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৮.৪ মানব সংবেদী অঙ্গ

যেসব অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে তাদের সংবেদী অঙ্গ বলে। মানবদেহে প্রায় 11 ধরনের সংবেদ গ্রাহক আছে। এদের মধ্যে পাঁচ ধরনের অঙ্গকে বিশেষ সংবেদ অঙ্গ (organs of special sense) বলা হয়। এগুলো হলো: দর্শন (vision), শ্রবণ (hearing), আগ্রহ (smell), স্বাদ (taste) এবং ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষাকারী অঙ্গ। প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষে এসব অঙ্গ অতি বিকশিত হওয়ার কারণেই মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে টিকে আছে। এপুত্তকে কেবল মানুষের দর্শন এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

চোখ: আলোকসংবেদী ও দর্শন অঙ্গ (Eyes: Photoreceptor and Vision organs)

চোখ মানুষের আলোকসংবেদী অঙ্গ বা দর্শনেন্দ্রীয়। মাথার সম্মুখদিকে দুপাশে দুটি চোখ বিদ্যমান। করোটির অপটিক ক্যাপসুলে (optic capsule) প্রতিটি চোখ বসানো থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে-

- (১) চক্ষু পল্লব, (২) চক্ষুপেশি, (৩) চক্ষু গ্রহি এবং (৪) চক্ষু গোলক।

নিম্নে চোখের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো:

- ১। চক্ষু পল্লব (Eye lids): প্রতিটি চোখের উপরে ও নিচে পেশিবহন, পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। এদের চক্ষু পল্লব বলে। এদের কিনারায় লোম বিদ্যমান। এ লোমগুলোকে চোখের পাঁপড়ি (eye lashes) বলে। চোখের সম্মুখ কোণে ভঁজ খাওয়া গোলাকৃতির লোমবিহীন একটি মাংশল অংশ থাকে। একে প্লিকা সেমিলুনারিস (plica semilunaris) বা নিকটিটেচিং পর্দা (nictitating membrane) বা তৃতীয় চক্ষু পল্লব বলে।

কাজ: চক্ষু পল্লব চোখকে খোলা রাখে বা বন্ধ করে। এরা ধূলোবালি, তীব্র আলো, পানি, বাতাস ও আঘাত হতে চোখকে রক্ষা করে। এরা চোখের অশ্রুর প্রলেপ ও অশ্রু প্রবাহ রক্ষা করে।

২। চক্ষুপেশি (Eye muscles): ছয়টি ভিন্ন ধরনের পেশি দিয়ে প্রতিটি চক্ষু গোলক চক্ষুকোটরে সংযুক্ত থাকে। পেশিগুলোর মধ্যে ৪টি রেকটাস পেশি এবং ২টি অবলিক পেশি। এসব পেশিতে করোটিক স্নায়ু প্রসারিত থাকে। মানুষের চোখের পেশিগুলো হলো:

- মেডিয়াল রেকটাস (Medial rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের ভেতরের দিকে ঘূরতে সহায়তা করে।
- ল্যাটারাল রেকটাস (Lateral rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের বাইরের দিকে ঘূরতে সহায়তা করে।
- সুপিরিয়র রেকটাস (Superior rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের উপরের দিকে ঘূরতে সহায়তা করে।
- ইনফেরিয়র রেকটাস (Inferior rectus): চক্ষু গোলককে চক্ষুকোটরের নিচের দিকে ঘূরতে সহায়তা করে।
- সুপিরিয়র অবলিক (Superior oblique): চক্ষু গোলককে অপটিক স্নায়ু-কর্ণিয়ার অক্ষ বরাবর ঘূরতে সহায়তা করে।
- ইনফেরিয়র অবলিক (Inferior oblique): চক্ষু গোলককে অবলিক পেশির বিপরীত দিকে ঘূরতে সহায়তা করে।



চিত্র ৮.১৪ মানব চোখের ত্রিমাত্রিক ও বাহ্যিক গঠন এবং চোখের পেশি

৩। চক্ষু গ্রস্তি (Eye glands): মানুষের চোখে তিনি ধরনের গ্রস্তি থাকে, যথা-

- ল্যাক্রাইমাল গ্রস্তি (Lacrimal glands): চক্ষু গোলকের উপরে ও সামনে অবস্থিত।
- হার্ডেরিয়ান গ্রস্তি (Harderian glands): চক্ষু গোলকের পশ্চাতে অক্ষীয় দিকে অবস্থিত।
- মেবোমিয়ান গ্রস্তি (Meibomian glands): চক্ষু পল্লবের কোণায় অবস্থিত।

কাজ: ল্যাক্রাইমাল গ্রস্তি নিঃসৃত লোণা ও জীবাণুরোধক তরলকে অশ্রু (tear) বলে। অশ্রু প্রধানত পানি, লবণ, অ্যান্টিবডি ও লাইসোজাইম (ব্যাকটেরিয়ানশক এনজাইম) নিয়ে গঠিত। এটি চোখকে সিক্ক, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণু মুক্ত রাখে। হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রস্তি নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ চক্ষু পল্লব ও কর্ণিয়াকে পিছিল এবং অশ্রুর বাস্পায়ন রোধ করে। রাখে।

৪। চক্ষু গোলক (Eye ball): চক্ষু গোলকই চোখের মূল অংশ। এটি একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরার মতো। এটি চক্ষুকোটরে (orbital cavity) ছয়টি পেশি দ্বারা বুলে থাকে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণ অংশই দখল করে রাখে। চক্ষু গোলকটি তিনি স্তর বিশিষ্ট প্রাচীর এবং তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত।

চক্ষু গোলক বা মানুষের চোখের গঠন

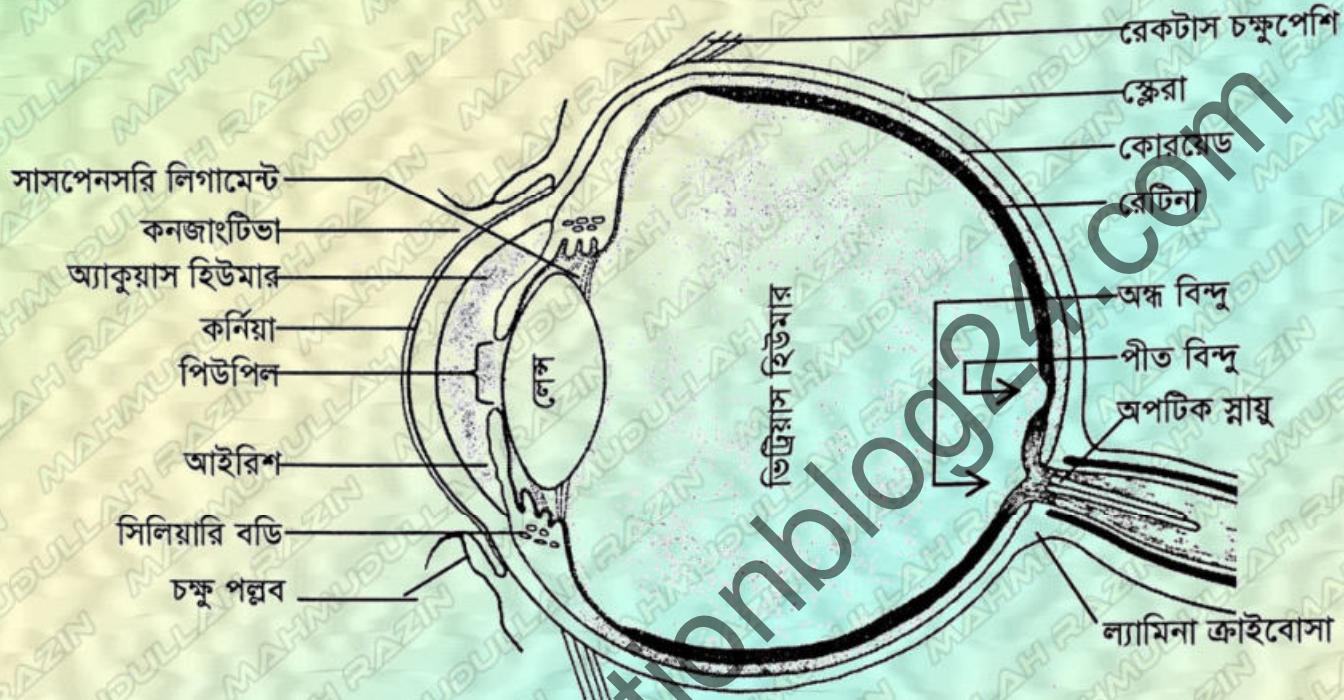
(ক) চক্ষু গোলকের প্রাচীর (Eye wall)

মানুষের চক্ষু গোলকের প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। স্তরগুলো হলো-(১) স্কেরা, (২) কোরঞ্জেড এবং (৩) রেটিনা।

১। স্কেরা (Sclera): চক্ষু গোলক প্রাচীরের সর্ব বাহিরের সাদা বর্ণের স্তরকে স্কেরা বলে। এটি অস্তুষ্ট, মজবুত, স্থিতিস্থাপক ও তন্ত্রময় যোজক কলা নির্মিত। এর সামনের দিকের এক-ষষ্ঠাংশ স্বচ্ছ ও স্ফীত হয়ে কর্ণিয়া (cornea) গঠন করে। কর্ণিয়ার উপরের অংশ একটি স্বচ্ছ ও পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে, একে কনজাংটিভা (conjunctiva) বলে।

চোখের পশ্চাত দিকে যে অংশ দিয়ে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে স্কেরার সে অংশকে ল্যামিনা ক্রাইবোসা (lamina cribrosa) বলে।

স্কেরার কাজ: স্কেরা চক্ষু গোলকের সমর্থনকারী প্রাচীর গঠন করে এবং এর সকল অংশকে ধারণ করে। এটি চোখের ভেতরের সকল গঠনকে সুরক্ষা দেয় এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে। এতে চক্ষুপেশিসমূহ সংযুক্ত থাকে। কর্ণিয়াকে চোখের জানালা (window of eye) বলা হয় কেননা এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে। কনজাংটিভা চোখকে বাইরে আঘাত, জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে এবং চোখ পরিষ্কার ও ভেজা রাখে।



চিত্র ৮.১৫ মানব চোখের লম্বচেদ

২। **কোরয়েড (Choroid):** চক্ষু গোলক প্রাচীরের মধ্যবর্তী পরিবাহী (vascular) ও কালো স্তরকে কোরয়েড বলে। এটি যোজক কলা নির্মিত, মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত, স্নায়ুজালক ও রক্তজালিকা সমৃদ্ধ স্তর। কর্ণিয়ার সংযোগস্থল বরাবর কোরয়েড স্কেরা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্ণিয়ার পেছনে একটি বৃত্তাকার, রঙিন ও সকোচনশীল ডায়াফ্রাম (diaphragm) গঠন করে। একে আইরিশ (iris) বলে। আইরিশের কেন্দ্রে একটি ৩-৪ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার ছিদ্র থাকে, একে পিউপিল (pupil) বলে। পিউপিলের মধ্যদিয়ে আলোক প্রবেশ করে। কোরয়েডের অপর একটি অংশ আইরিশের পেছনে গোলাকার ও স্ফীত একটি অঙ্গ গঠন করে। একে সিলিয়ারি বডি (ciliary body) বলে। সিলিয়ারি বডি থেকে সাসপেনসরি লিগামেন্ট (suspensory ligament) নামক কতগুলো তন্তু একটি দ্বিউভল লেন্সকে (biconvex lens) পিউপিলের পেছনে আইরিশ ও ডিট্রিয়াস বডির মাঝে ঝুলিয়ে রাখে। লেন্সটি প্রায় ১০ মিলিমিটার ব্যাস ও ৩.৭-৪.৫ মিলিমিটার পুরুষ বিশিষ্ট। এটি বাইরের দিকে বৃহদাকৃতির কোষের এপিথেলিয়াম স্তর এবং কেন্দ্রের দিকে নিউক্লিয়াসবিহীন ঘন সন্নিবেশিত কোষ দ্বারা গঠিত। লেন্স রক্তসংবহনবিহীন। এটি পার্শ্ববর্তী তরল হতে পুষ্টি গ্রহণ করে।

কোরয়েডের কাজ: কোরয়েডের রক্তজালক থেকে স্কেরা ও রেটিনা পুষ্টি গ্রহণ করে। এটি চোখে প্রবেশকৃত অতিরিক্ত আলোক শোষণ করে। এর আইরিশ চোখের বর্ণ নির্ধারণ করে। চোখের আইরিশ ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মতো এবং এর পিউপিল চোখে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। কোরয়েডের সিলিয়ারি বডি থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার তরল নিঃসৃত হয়। কোন বস্তু হতে আগত আলোকরশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনায় পতিত হয়।

৩। **রেটিনা (Retina):** চক্ষু গোলক প্রাচীরের সর্ব ভেতরের স্তরকে রেটিনা বলে। এটি আলোকসংবেদী স্তর এবং ১০টি উপস্তর নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে রডকোষ ও কোনকোষ নামক আলোকসংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত উপস্তরটি প্রধান। রেটিনার বাইরের দিকে রডকোষ থাকে এবং এরা আলোক ও অঙ্ককারে সংবেদনশীল। রেটিনার কেন্দ্রের দিকে কোনকোষ থাকে এবং এরা রঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের প্রতি চোখে প্রায় 120×10^6 টি রডকোষ এবং প্রায় 7×10^6 টি কোনকোষ থাকে। রডকোষ স্বল্প আলোতে এবং কোনকোষ তীব্র আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। রেটিনার একটি স্থানে অপটিক স্নায়ু সংযুক্ত হয়।

এ স্থানকে অঙ্কবিন্দু (blind spot) বলে। কারণ এখানে কোনো আলোকসংবেদী কোষ থাকে না। অঙ্কবিন্দুর উপরের দিকে একটি ডিম্বাকার ও হলুদ অঞ্চল বিদ্যমান। একে পীত বিন্দু (yellow spot) বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (fovea centralis) বলে। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

রেটিনার কাজ: রেটিনার কারণে দিনের আলোয় কিংবা রাতের আধারে বন্ধন রঙিন ও স্টেরিওস্কোপিক বা ত্রিমাত্রিক দর্শন সম্ভব হয়। রেটিনাতে বন্ধন সঠিক দর্শন ও অবস্থা পরিবর্তন অনুধাবন সম্পন্ন হয়। রেটিনা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাথে জড়িত।

(খ) চক্ষু গোলক প্রকোষ্ঠ (Eye chamber)

চক্ষু গোলকে তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে। যেমন-

১। অগ্র প্রকোষ্ঠ (Anterior chamber): এটি আইরিশ ও কর্ণিয়ার মাঝে অবস্থিত মাঝারি আকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটি অ্যাকুয়াস হিউমার (aqueous humour) নামক তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। অ্যাকুয়াস হিউমার তরল অনেকটা সেরিব্রোস্পিনাল ফ্লাইডের মতো।

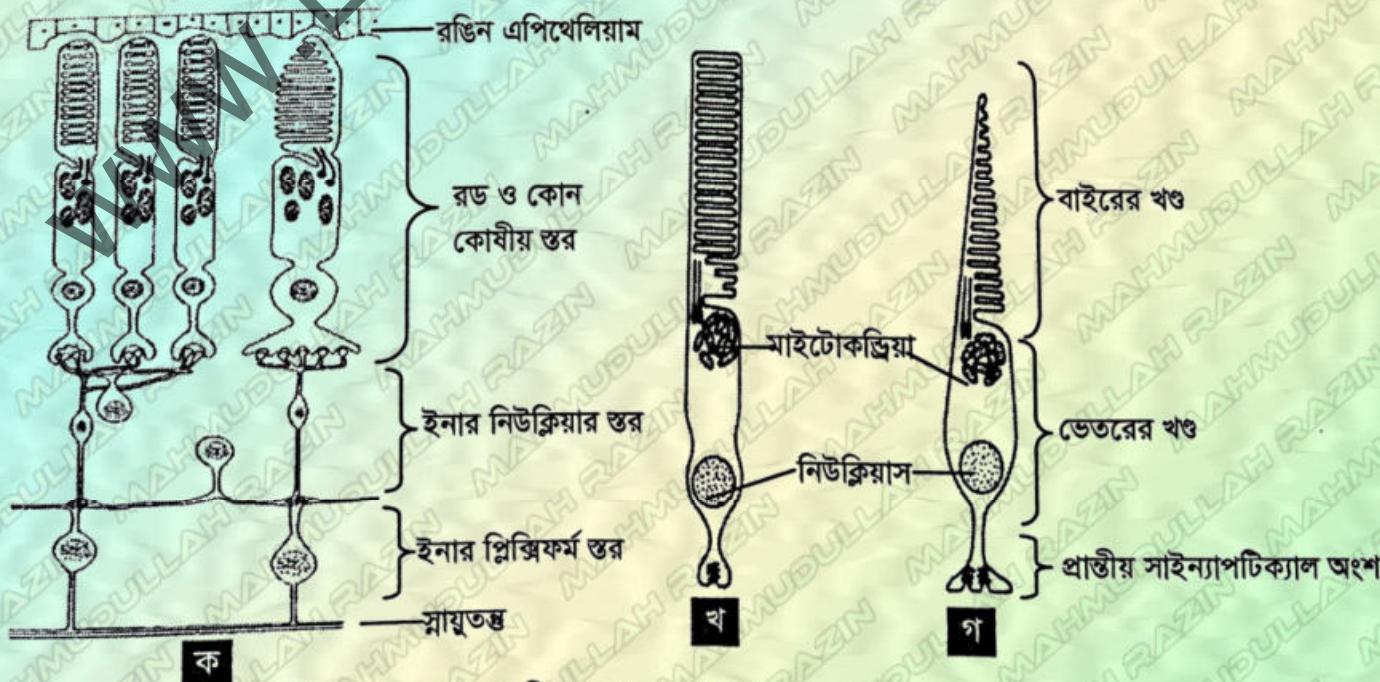
২। পশ্চাত প্রকোষ্ঠ (Posterior chamber): এটি লেস ও আইরিশের মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটিও অ্যাকুয়াস হিউমার তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

৩। ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ (Vitreous chamber): এটি লেস ও রেটিনার মধ্যবর্তী গোলাকৃতির বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। এটি চোখের চার-পন্থমাংশ গঠন করে। এটি ভিট্রিয়াস হিউমার (vitreous humour) নামক জেলির মতো তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রিয়াস হিউমারের 99% পানি এবং 1% কোলাজেন ও হায়ালোরোনিক অ্যাসিড। ভিট্রিয়াস বড় থেকে রেটিনার উপরে একটি সূক্ষ্ম ও রঙিন এপিথেলিয়াম স্তর সৃষ্টি হয়।

চক্ষু গোলকের কাজ: চক্ষু গোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান তরল-(i) চোখের সঠিক আকৃতি বজায় রাখে; (ii) চোখের অন্তঃচাপ ও বহিঃচাপ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) আলোকরণ প্রতিসরণ করে; (iv) রেটিনা ও লেসে পুষ্টি যোগায়।

রডকোষ ও কোনকোষ (Rod cell and Cone cell)

মানব চক্ষু গোলক প্রাচীরের রেটিনা স্তরে দুধরনের আলোকসংবেদী কোষ থাকে। এগুলো হলো রডকোষ ও কোনকোষ। রডকোষগুলো লম্বা, সরু এবং রেটিনাতে উলমুক্তভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি রডকোষ 2 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 50 মাইক্রোমিটার লম্বা। অন্যদিকে কোনকোষগুলো রডকোষ অপেক্ষা কিছুটা খাটো ও প্রশস্ত। প্রতিটি কোনকোষ 3-5 মাইক্রোমিটার পুরু এবং 40 মাইক্রোমিটার লম্বা। রেটিনাতে তিন ধরনের কোনকোষ থাকে যারা ভিন্ন ধরনের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল। ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ নীল বর্ণ, মধ্যম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ সবুজ বর্ণ এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনকোষ লাল বা হলুদ বর্ণ অনুধাবন করে।



চিত্র ৮.১৬ (ক) রেটিনার প্রস্তুত্বে (খ) রডকোষ (গ) কোনকোষ

গঠনিক দিক থেকে রডকোষ ও কোনকোষ প্রায় একই রকম। এদের প্রতিটি কোষ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। অংশগুলো হলো- (১) বাইরের খণ্ড, (২) ভেতরের খণ্ড এবং (৩) প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ। রডকোষগুলোর বাইরের খণ্ড রড (rod) আকৃতির। এতে রডোপসিন (rhodopsin) নামক আলোকসংবেদী রঞ্জক পদার্থ এবং ভিটামিন A থাকে। কোনকোষগুলোর বাইরের খণ্ড কোন (cone) আকৃতির। এতে আয়োডপসিন (iodopsin) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। উভয় কোষের ভেতরের খণ্ডে প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু থাকে। কোষসমূহের প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ স্ফীত হয়ে বাল্ব গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে।

রডকোষ ও কোনকোষের মধ্যে পার্থক্য

রডকোষ	কোনকোষ
১। রেটিনার বাইরের দিকে রডকোষ থাকে।	১। রেটিনার কেন্দ্রের দিকে কোনকোষ থাকে।
২। রডকোষ লম্বা ও সরু, ২ মাইক্রোমিটার পুরু এবং ৫০ মাইক্রোমিটার লম্বা।	২। কোনকোষ খাটো ও প্রশস্ত, ৩-৫ মাইক্রোমিটার পুরু এবং ৪০ মাইক্রোমিটার লম্বা।
৩। রডকোষ কেবল এক ধরনের।	৩। কোন কোষ তিন ধরনের।
৪। রডকোষ প্রতিচোখে প্রায় 120×10^6 টি, ফোবিয়া ছাড়া অন্যত্র সম্ভাবে বিস্তৃত।	৪। কোনকোষ প্রতিচোখে প্রায় 7×10^6 টি, ফোবিয়াতে অধিক ঘনত্বে এবং অন্যত্র হালকাভাবে বিস্তৃত।
৫। রডকোষের বাইরের খণ্ড রড (rod) আকৃতির এবং বিপুল পরিমাণ রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ।	৫। কোনকোষের বাইরের খণ্ড কোন (cone) আকৃতির এবং অল্প পরিমাণ আয়োডপসিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ।
৬। রডকোষ স্থিমিত আলোতে অধিক সংবেদনশীল, রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে স্ক্যাটোপিক দর্শন বলে।	৬। কোনকোষ উজ্জল আলোতে অধিক সংবেদনশীল, দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে ফটোপিক দর্শন বলে।
৭। রডকোষ বস্ত্র সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	৭। কোনকোষ বস্ত্র রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।
৮। রডকোষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে রাতকানা রোগ হয়।	৮। কোনকোষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে বর্ণাঙ্ক রোগ হয়।

মানুষের দর্শন কৌশল (Human visual perception mechanism)

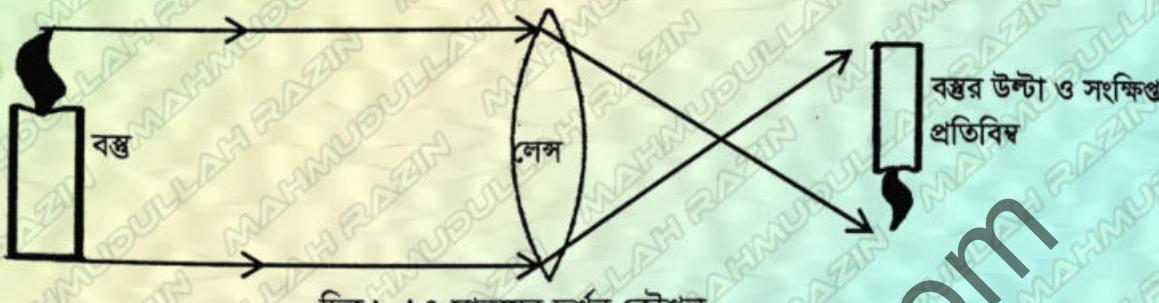
মানুষ দ্বিনেত্র দৃষ্টি (binocular vision) সম্পন্ন প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে। এধরনের দর্শনকে ঘণবীক্ষন দৃষ্টি বা স্টেরিওকোপিক দৃষ্টি (stereoscopic vision) বলা হয়। চোখের রেটিনাতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। দর্শনীয় বস্তু হতে আলোক তরঙ্গ সরাসরি রেটিনাতে পতিত হয় না। চারটি ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়। এদেরকে চোখের প্রতিসরণ মাধ্যম (refractive media) বলা হয়। এরা হলো- (১) কর্ণিয়া, (২) অ্যাকুয়াস হিউমার, (৩) লেন্স এবং (৪) ভিট্রিয়াস হিউমার।

চোখ খোলা থাকা অবস্থায় দর্শনীয় বস্তু থেকে আলোকরশ্মি প্রথমে কর্ণিয়ার উপর পতিত হয়। এরপর অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলোকরশ্মি রেটিনায় এসে পতিত হয়। আলোকরশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পিউপিল ছোট-বড় হয় এবং বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন ঘটে। আপত্তি আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্যদিয়ে প্রতিসূত হওয়ার সময় অভিসারী রশ্মিরূপে রেটিনার উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে রেটিনাতে বস্তুটির ছোট ও উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনায় বিদ্যমান আলোকসংবেদী রডকোষ ও কোনকোষসমূহ আলোক দ্বারা উদ্বৃত্তি হয় এবং এ আলোক অনুভূতি অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিক্ষের দৃষ্টি কেন্দ্রে পৌছায়। মস্তিক্ষের কার্যকারিতায় বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব সোঁজা হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি থাকার সুবিধা-

- ১। দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে।
- ২। কোনো বস্তুকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে।

- ৩। দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় হয়।
- ৪। চোখের রেটিনাতে অঙ্কবিন্দু থাকার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়।
- ৫। বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।
- ৬। বিভিন্ন কাজ সুনিপূনভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে।



চিত্র ৮.১৭ মানুষের দর্শন কৌশল

উপযোজন (Accommodation)

যখন কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী দর্শনীয় বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখাব জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে উপযোজন বলে। মানুষ দুচোখকে একই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে, লেপের বক্রতার পরিবর্তন করে এবং পিউপিলের সক্ষেচন-প্রসারণ ঘটিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে। চোখের আইরিশ, সিলিয়ারি পেশি, সাসপেনসরি লিগামেন্ট ও লেন্স সক্রিয়ভাবে উপযোজনে অংশগ্রহণ করে। উপযোজনের সময় চোখে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো হলো-

- দুচোখের সমকেন্দ্রীকরণ; □ সিলিয়ারি পেশির সক্ষেচন-প্রসারণ; □ সাসপেনসরি লিগামেন্টের সক্ষেচন-প্রসারণ;
- লেপের আকারের পরিবর্তন; □ চক্ষু গোলকের ঘূর্ণন; □ চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ এবং □ পিউপিলের সক্ষেচন-প্রসারণ।

উপযোজন কৌশল

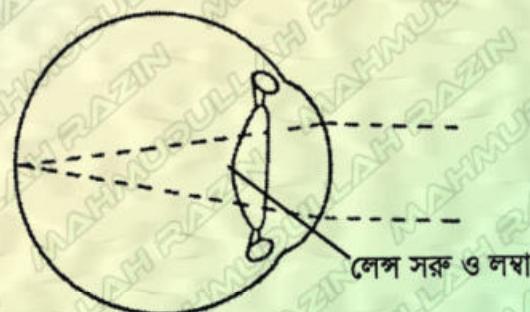
কাছে ও দূরের বস্তু দেখাব জন্য মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ীতে দুভাবে উপযোজন সংঘটিত হয়। যথা -

১। কাছের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া: চোখের সন্নিকটের কোনো বস্তুকে দর্শন করার সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি সক্ষেচিত হয় এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট প্রসারিত হয়। এতে লেপের বক্রতা বেড়ে গিয়ে তা মোটা ও খাটো হয় এবং এর ফোকাস দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাছের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে।

২। দূরের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া: চোখ থেকে দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুকে দেখাব সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হয় এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট সক্ষেচিত হয়। এতে লেপের বক্রতা কমে গিয়ে উহা সরু ও লম্বা হয় এবং এর ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলে দূরের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।



কাছের বস্তু দর্শন কৌশল



দূরের বস্তু দর্শন কৌশল

চিত্র ৮.১৮ মানব চোখের উপযোজন

মানব চোখের সীমাবদ্ধতা (Limitation of human eye)

- ১। মানব চোখের আকৃতি সুনির্দিষ্ট, তাই এর আলোক গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত থাকে।

২। এটি সুনির্দিষ্ট আলোক তীব্রতায় সাড়া দেয় এবং কেবল দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি দেখতে পায়।

৩। চোখ প্রতি মৃছার্তে বস্ত্র নতুন প্রতিবিম্ব দেখে।

৪। এটি কোনো বস্ত্র অস্পষ্ট প্রতিবিম্বকে আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে স্পষ্ট করতে পারে না।

৫। চোখ ক্যামেরার মতো কোনো বস্ত্র প্রতিবিম্বকে সংরক্ষণ করতে পারে না।

কান: শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ

(Ear: Hearing and Equilibrium organ)

কান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। মাথার দুপাশে চোখের পিছনে দুটি কান অবস্থিত। প্রতিটি কান করোটির অডিটরি ক্যাপসুলে (auditory capsule) অবস্থিত। মানুষের কানের তিনটি প্রধান অংশ থাকে, যথা-

১। বহিঃকর্ণ (External ear),

২। মধ্যকর্ণ (Middle ear) ও

৩। অন্তঃকর্ণ (Internal ear)।

নিম্নে কানের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেয়া হলো-

১। বহিঃকর্ণ (External ear): এটি কানের সর্ব বাইরের অংশ এবং কর্ণছত্র, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে গঠিত। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কেবল বহিঃকর্ণই দৃষ্টিগোচর হয় এবং ফলশ্রুতিতে অনেকে কান বলতে কেবল বহিঃকর্ণের কর্ণছত্রকে বুঝায় থাকে।

(ক) কর্ণছত্র (Pinna): মাথার দুপাশে বিদ্যমান বহিঃকর্ণের দৃশ্যমান চ্যাপ্টা ও নমনীয় অংশই হলো কর্ণছত্র বা পিনা বা অরিকল। এটি তৃক, পেশি ও কোমলাত্তি নির্মিত। এ গড় দৈর্ঘ্য ৫.৯-৬.৪ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ২.৯-৩. সেন্টিমিটার।

কাজ: পরিবেশ হতে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে কর্ণকুহরে প্রেরণ করা।



চিত্র ৮.১৯ মানুষের কানের গঠন

(খ) কর্ণকুহর (Auditory meatus): কর্ণছত্রের কেন্দ্রে বিদ্যমান ছিদ্র থেকে যে সরু নালি কানের কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে কর্ণকুহর বলে। এটি দৈর্ঘ্যে ২.৫ সেন্টিমিটার এবং ব্যাসে ০.৭ সেন্টিমিটার। এর অতর্ভাগ তৃকাবৃত এবং তুকে লোম ও মোম প্রতি বিদ্যমান।

কাজ: কর্ণকুহরের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌছে। এতে বিদ্যমান মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলোবালি, পতঙ্গ, জীবাণু ইত্যাদি প্রবেশে বাধা দেয়। এটি কর্ণপটহের অনুকূল উষ্ণতা ও অর্দ্ধতা বজায় রাখে।

(গ) কর্ণপটহ (Tympanic membrane): কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের সমূখ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাতলা ও গোলাকার পর্দাকে কর্ণপটহ বা কানের পর্দা (eardrum) বলে। এটি প্রায় ০.১ মিলিমিটার পুরু, ৯ মিলিমিটার ব্যাস এবং ১৪ মিলিগ্রাম ওজন বিশিষ্ট মজবুত ও নমনীয় পর্দা যার বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। এ পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহজে পুনর্গঠিত হয় না।

কাজ: এটি মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে বহিকর্ণকে মধ্যকর্ণ হতে পৃথক রাখে। এটি শব্দ তরঙ্গ দ্বারা স্পন্দিত হয় এবং এ স্পন্দনকে বৃদ্ধি করে মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।

২। মধ্যকর্ণ (Middle ear): এটি কানের মধ্যবর্তী অংশ। এটি একটি অসম আকৃতির পাশ্বীয়ভাবে চাপা বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ। করোটির টিমপ্যানিক অস্থির (temporal bone) ভেতরে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। মধ্যকর্ণ নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত:

(ক) **ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian tube):** এটি মধ্যকর্ণের গহ্বরের অক্ষীয়দেশ থেকে সৃষ্টি নাসাগলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নালি। যোড়শ শতান্তরীর ইতালিয়ান শৈল্যবিদ Bartolommo Eustachio এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

কাজ: এটি মধ্যকর্ণকে নাসাগলবিলের সাথে যুক্ত করে। এটি মধ্যকর্ণকে বায়ু প্রদান করে এবং মধ্যকর্ণে বিদ্যমান মিউকাস পরিষ্কার করে নাসাগলবিলে প্রেরণ করে। এটি কর্ণপটহের উভয় পার্শ্বের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে।

(খ) **কর্ণাস্থি (Ear ossicles):** মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি (ossicle=tiny bone) পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি শিকলের মতো অবস্থান করে। এগুলো মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি। অস্থিগুলো হলো—ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস।

(i) **ম্যালিয়াস (Malleus)-**এটি দেখতে হাতুরির মতো (hammer-shaped)। এর এক প্রান্ত কর্ণপটহের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ইনকাসের সাথে যুক্ত।

(ii) **ইনকাস (Incus)-**এটি দেখতে নেহাই (anvil-shaped)-এর মতো। এর এক প্রান্ত ম্যালিয়াসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত স্টেপিসের সাথে যুক্ত থাকে।



চিত্র ৮.২০ কর্ণাস্থি

(iii) **স্টেপিস (Stapes)-**এটি দেখতে ঘোড়ার জিনের পাদান্তির (stirrup-shaped) মতো। এর এক প্রান্ত ইনকাসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামক ছিদ্রের সাথে যুক্ত থাকে। স্টেপিস মানবদেহের সবচেয়ে ছোট ও হালকা অস্থি।

কাজ: অস্থি তিনটি শিকলের মতো অবস্থান করে বহিকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝে একটি সংযোগ সৃষ্টি করে। এদের মাধ্যমে কর্ণপটহে সৃষ্টি শব্দতরঙ্গ পরিবাহিত হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌছায়।

(গ) **ছিদ্রপথ (Openings):** মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে অবস্থিত পেরিওটিক অস্থি নির্মিত প্রাচীর গাত্রে দুটি ছিদ্র বিদ্যমান। ছিদ্র দুটি পাতলা পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে। উপরের ডিম্বাকৃতির ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস (fenestra ovalis) বা কানের ডিম্বাকৃতির জানালা (oval window) এবং নিচের গোলাকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা রোটাভা (fenestra rotunda) বা কানের গোলাকৃতির জানালা (round window) বলে।

কাজ: ফেনেস্ট্রা ওভালিস দিয়ে শব্দ তরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। অন্তঃকর্ণের ককলিয়ায় শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টির পর অতিরিক্ত শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটাভা দিয়ে অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফিরে এসে প্রশমিত হয়।

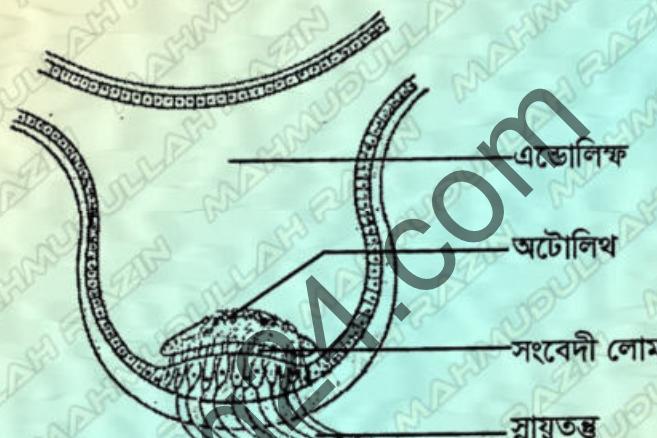
৩। অন্তঃকর্ণ (Internal ear): করোটির অডিটরি ক্যাপসুলের (auditory capsule) পেরিওটিক অস্থির অভ্যন্তরে অন্তঃকর্ণ অবস্থান করে। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ হলো পাতলা পর্দা জাতীয় মেম্ব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ (membranous labyrinth) নামক একটি জটিল অঙ্গ। এ অঙ্গটি এন্ডোলিম্ফ (endolymph) নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। পেরিলিম্ফ (perilymph) নামক তরল পদার্থপূর্ণ অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ (bony labyrinth) দ্বারা মেম্ব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ পরিবেষ্টিত থাকে। এন্ডোলিম্ফ ও পেরিলিম্ফ সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন থাকে।

মেম্ব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ এর মূলদেহ ইউট্রিকুলাস (utricle) এবং স্যাকুলাস (sacculus) নামক দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস আকারে বড় এবং উপরে অবস্থান করে। স্যাকুলাস ছোট এবং ইউট্রিকুলাসের নিচে অবস্থান করে। স্যাকুলোইউট্রিকুলার নামক একটি সরু ও সংক্ষিপ্ত নালি দ্বারা দুটি প্রকোষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ম্যাকুলা (macula) নামের কতগুলো সংবেদী কোষ থাকে এবং এগুলো থেকে সংবেদী লোম বের হয়। লোমগুলো কানের পাথর বা অটোলিথ (otolith) সমন্বিত জেলিতে ঢুবে থাকে। এসব সংবেদী কোষ ও লোম মানুষের মাথার অবস্থান ঠিক রাখে।

(ক) ইউট্রিকুলাস (Utriculus): ইউট্রিকুলাস বা ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস কানের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। এটি একটি ভেস্টিবিউল বা গোলাকার প্রকোষ্ঠ এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি (semicircular canal) নিয়ে গঠিত। নালিগুলোর মধ্যে দুটি উল্লম্বিক এবং একটি অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে। প্রতিটি নালির এক প্রান্ত কিছুটা স্ফীত হয়ে আম্পুলা (ampulla) গঠন করে। আম্পুলার অভ্যন্তরে ক্রিস্টে (cristae) নামের সংবেদী লোমবাহী কঠগুলো কোষ থাকে। সংবেদী লোমগুলো চুনময় জেলির মতো অটোলিথ (otolith) দ্বারা আবৃত থাকে।



চিত্র ৮.২১ মানুষের অন্তঃকর্ণ



চিত্র ৮.২২ ইউট্রিকুলাসের প্রস্তুতি

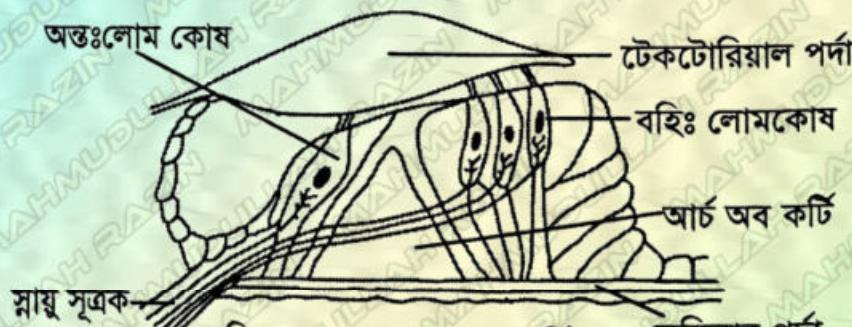
কাজ: এটি দেহের ভারসাম্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখে।

(খ) স্যাকুলাস (Sacculus): এটি কানের শব্দ অনুভূতি সৃষ্টিকারী অংশ। এটি একটি নলাকার প্রকোষ্ঠ এবং ইউট্রিকুলাসের নিচের দিকে অবস্থিত। স্যাকুলাসের অক্ষীয় দিক হতে শামুকের খোলকের মতো পঁয়াচানো 35 মিলিমিটার লম্বা একটি নালির সৃষ্টি হয়। একে ককলিয়া (cochlea) বলে। ককলিয়া তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠকে ক্ষেলা ভেস্টিবুলি (scala vestibuli), মাঝের প্রকোষ্ঠকে ক্ষেলা মিডিয়া (scala media) এবং নিচের প্রকোষ্ঠকে ক্ষেলা টিম্পানি (scala tympani) বলে।

মাঝের প্রকোষ্ঠ ক্ষেলা মিডিয়া উপরে রেসনার পর্দা (Reissner's membrane) ও নিচে বেসিলার পর্দা (basilar membrane) দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং এতে শ্রবণ অঙ্গ অরগান অব কর্টি (organ of corti) বিদ্যমান থাকে। ইতালিয়ান শৈল্যবিদ Gaspare Corti (1822-1876) এর নামানুসারে এ অঙ্গটির নামকরণ করা হয়েছে।

অরগান অব কর্টি বেসিলার মেম্ব্রেন, সংবেদী লোমকোষ, সমর্থনকারী কোষ এবং টেকটোরিয়াল মেম্ব্রেন দ্বারা গঠিত। এতে লোমকোষের সংখ্যা প্রায় 5 হাজার। এর প্রতিটি লোমকোষের সাথে অডিটরি স্নায়ুর নিউরন যুক্ত থাকে এবং প্রতিটি লোমকোষ থেকে একাধিক লোম সৃষ্টি হয়ে ককলিয়ার নালির এন্ডোলিম্ফে (endolymph) বিস্তৃত থাকে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দতরঙ্গের প্রভাবে অরগান অব কর্টি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

কাজ: শব্দ তরঙ্গ থেকে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টি করে।



চিত্র ৮.২৩ অরগান অব কর্টি বেসিলার পর্দা

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

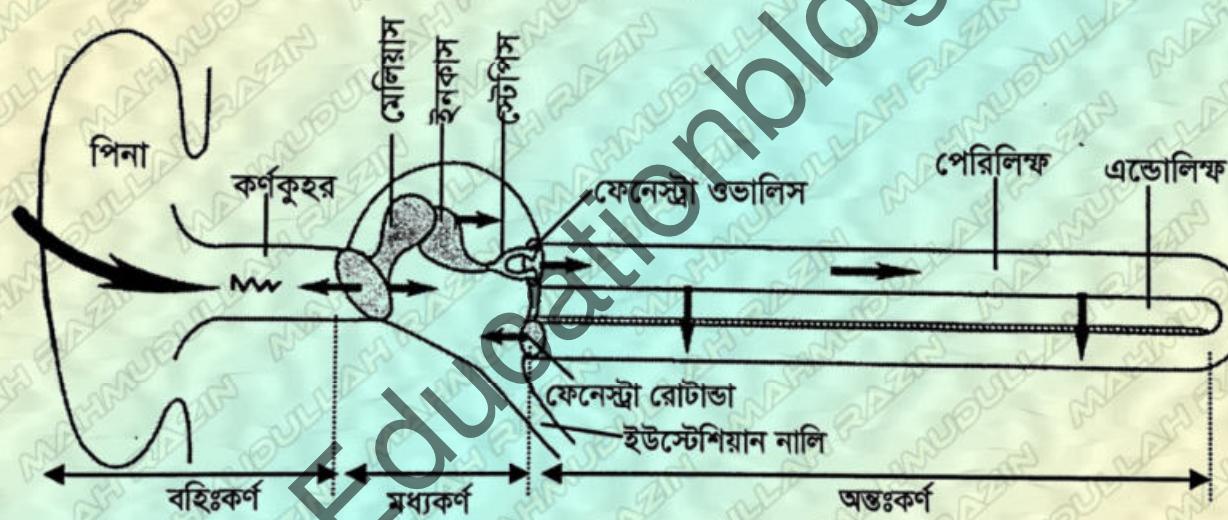
মানুষের কান একসাথে দুটি ভিন্নধর্মী কাজ সম্পাদন করে। এদের একটি শ্রবণ ও অন্যটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা। এ দুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই।

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল

মানুষের অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাসের ম্যাকুলি এবং অর্ধবৃত্তাকার নালিগুলোর অ্যাম্পুলার ত্রিন্ডির সংবেদী কোষসমূহ ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। এসব কোষ থেকে যে সংবেদী লোম বের হয় সেগুলো এডেলিফে ডুবে থাকে। এডেলিফে CaCO_3 সমৃদ্ধ অটোলিথ বিদ্যমান থাকে। মানুষের মাথা কোনো এক তলে হেলে গেলে ঐ পাশে বেশি অটোলিথ প্রবাহিত হয় এবং সংবেদী লোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো উদ্বীপিত হয়। এ উদ্বীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ তার আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশির সঙ্কোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

শ্বণ কৌশল

পরিবেশে সৃষ্টি শব্দতরঙ্গ পিনা বা কর্ণছত্রে সংগৃহীত হয়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কর্ণপটহকে আঘাত করে। এতে কর্ণপটহে কম্পণের সৃষ্টি হয়। কর্ণপটহ থেকে শব্দতরঙ্গ কর্ণস্থিসমূহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের পেরিলিফে পৌছায়। পেরিলিফে শব্দতরঙ্গের শক্তি প্রায় 20 গুণ বৃদ্ধি পায়। পেরিলিফে কম্পন সৃষ্টি হলে ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোমশ কোষগুলো উদ্বীপিত হয়ে স্নায়ু উদ্বীপনার সৃষ্টি করে। এ উদ্বীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্বণ কেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। অতিরিক্ত শব্দতরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটাভার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে ফিরে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে মানুষের কানের শ্বণ কৌশল দেখানো হলো-



চিত্র ৮.২৪ মানুষের কানের ভেতরে শব্দতরঙ্গের গতিপথের সরল চিত্র

৮.৫ রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical coordination)

দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে সমন্বয় ঘটানোর অন্যতম উপায় হলো রাসায়নিক সমন্বয়। মানবদেহে তিনি ধরনের রাসায়নিক সমন্বয় দেখা যায়, যথা -

১। এডোক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে অন্তঃক্ষেত্রে গ্রহিত ক্ষরিত হরমোন রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে কোষে কোষে সমন্বয় সাধন করে। যেমন, পিটুইটারি গ্রহিত ক্ষরিত Thyroid stimulating hormone রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে থাইরয়েড গ্রহিতে পৌছে এবং অধিক হরমোন উৎপাদনের জন্য উহাকে উদ্বীপিত করে।

২। প্যারাক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে স্থানীয় কোনো একটি কোষে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ বহিঃকোষীয় তরল দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কোষকে প্রভাবিত করে। যেমন- অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যাসের α -কোষ থেকে নিঃসৃত গ্লুকাগন পার্শ্ববর্তী β -কোষের নিঃসরণকে বাধা দেয়।

৩। অটোক্রাইন সমন্বয়: এক্ষেত্রে একই কোষে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ ঐ কোষের কার্যকে প্রভাবিত করে। যেমন- রক্তনালির প্রাচীরের এডোথেলিয়াল কোষে উৎপাদিত Platelet activating factor ঐ কোষেই কাজ করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রহি (Endocrine glands)

মানবদেহের অধিকাংশ রাসায়নিক সমন্বয় ঘটে হরমোনের মাধ্যমে। দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নালিবিহীন অন্তঃক্ষরা গ্রহি থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ক্ষরিত হয়। যেসব নালিহীন গ্রহি ক্ষরিত রাসায়নিক বার্তাবাহক বা হরমোন রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে তাদের অন্তঃক্ষরা গ্রহি বলে। মানবদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রহির নাম, অবস্থান, গঠন, ক্ষরিত হরমোনের নাম ও কার্যাবলি নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো-

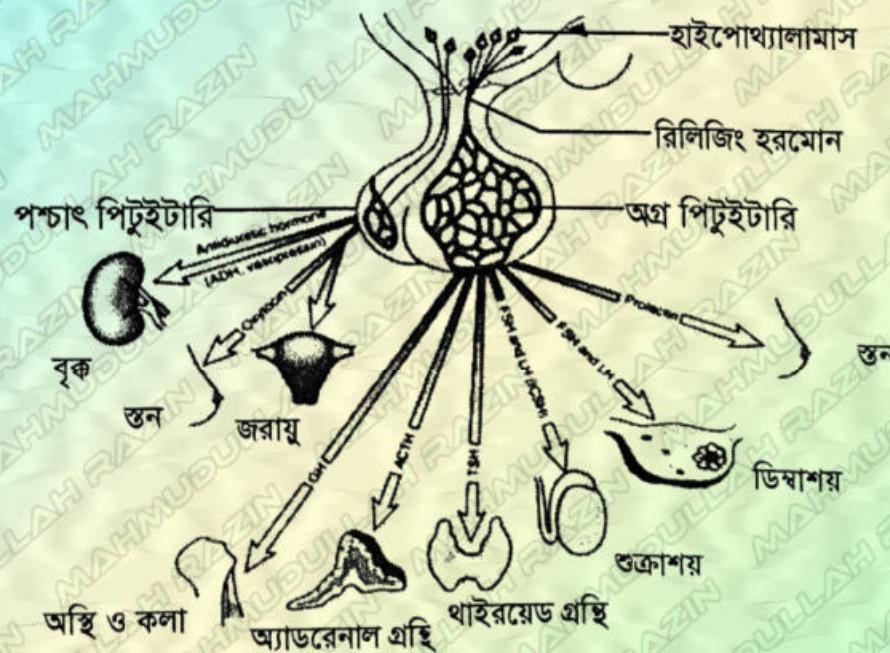
I. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)

মন্তিক্ষের হাইপোথ্যালামাস অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রহি হিসেবে কাজ করে। এ গ্রহি থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় সেগুলো মূলত পিটুইটারি গ্রহির ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব হরমোনকে পূর্বে রিলিজিং ফ্যাক্টর (releasing factors) বলা হতো। হাইপোথ্যালামাস ক্ষরিত হরমোনসমূহ হলো-

হরমোন	যা নিয়ন্ত্রণ করে-
১। গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন (GHRH)	গ্রোথ হরমোন (GH) ক্ষরণ
২। থাইরোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (TRH)	থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) ক্ষরণ এবং প্রোল্যাকটিন (PRL) ক্ষরণ
৩। কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (CRH),	অ্যাড্রিনোকরটিকেট্রফিক হরমোন (ACTH) ক্ষরণ
৪। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (GRH)	লুটিনাইজিং হরমোন (LH) এবং ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ক্ষরণ
৫। সোমাটোস্ট্যাটিন (SS)	গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ রোধ
৬। ডোপামিন (DA)	প্রোল্যাকটিন ক্ষরণ রোধ

II. পিটুইটারি গ্রহি (Pituitary gland)

এটি মন্তিক্ষের হাইপোথ্যালামাসের সাথে একটি বৌঢ়া দ্বারা সংযুক্ত মটরদানার মতো গোলাকার এবং 0.5 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট গ্রহি। একে হাইপোফাইসিস (hypophysis) নামেও অভিহিত করা হয়। এটি অগ্রপিটুইটারি খণ্ড বা adenohypophysis এবং পষ্টাধ্যপিটুইটারি খণ্ড বা neurohypophysis নামক দুই অংশে বিভক্ত। এ গ্রহি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রহির উপর প্রভাব বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রহিকে অস্থির রাজা বা প্রভু গ্রহি (master gland or Master of endocrine orchestra) বলে। পিটুইটারি গ্রহি ক্ষরিত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



ক্. নং	হরমোনের নাম	কাজ
অগ্র পিটুইটারি		
১।	মানব গ্রোথ হরমোন/সোমাটোট্রফিক হরমোন (Human Growth Hormone-HGH) or (Somatotrophic Hormone-STH)	(i) এটি কলা, অঙ্গ, পেশি ও অঙ্গঃঅঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) এটি বিভিন্ন খাদ্য বিপাক ত্বরান্বিত ও প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। (iii) এটি হৎপেশি ও অঙ্গ হতে সম্পত্ত গ্লাইকোজেন ভাসে।
২।	থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (Thyroid Stimulating Hormone-TSH)	(i) থাইরয়েড গ্রাহিকে হরমোন সংশ্লেষণ ও ক্ষরণে উদ্বৃত্তি করে। (ii) থাইরয়েড কলার আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৩।	অ্যাডরিনো কর্টিকোট্রফিক হরমোন (Adreno Corticotrophic Hormone- ACTH)	(i) অ্যাডরেনাল গ্রাহিক স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) মেলানোসাইট উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
৪।	লুটিনাইজিং হরমোন (Luteinising Hormone- LH)	(i) শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহকে উদ্বৃত্তি করে এন্ডোজেন বা টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়। (ii) ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম সৃষ্টি ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ ঘটায়।
৫।	ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone- FSH)	(i) শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্বৃত্তি করে শুক্রাণুজনন ঘটায়। (ii) ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভুলেশন ও ইস্ট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।
৬।	লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotropic Hormone- LTH)	(i) স্ত্রীদের শুক্রাশয়ের বিকাশ ও দুষ্ক ক্ষরণ ঘটায়। (ii) পুরুষ ও স্ত্রীদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।
৭।	মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulating Hormone- MSH)	(i) এটি মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাকের বর্ণ নির্ধারণ করে।

পচাঃ পিটুইটারি

৮।	অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন বা ভেসোপ্রেসিন (Anti Diuretic Hormone-ADH /Vassopressin)	(i) এটি রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। (ii) এটি বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অতি মৃত্যুগ্রস রোধ করে। (iii) পাকস্থলি ও অন্ত্রের সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।
৯।	অক্সিটোসিন (Oxytocin)	(i) এটি স্তনের পেশি সঞ্চোচন ঘটিয়ে দুষ্ক ক্ষরণে সাহায্য করে। (ii) এটি প্রসবের সময় জরায়ুর সঞ্চোচন ত্বরান্বিত করে।

III. থাইরয়েড গ্রাহি (Thyroid gland)

গ্রীবার সম্মুখো স্বরযন্ত্রের নিচে ট্রাকিয়া সংলগ্ন থাইরয়েড গ্রাহি অবস্থিত। প্রজাপতি সদৃশ্য বা ইংরেজি H আকৃতির থাইরয়েড গ্রাহি দুটি খঙ্গ নিয়ে গঠিত যারা ইথমাস (isthmus) নামক সংযোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। পরিণত মানুষের থাইরয়েড গ্রাহির ওজন 25 গ্রাম, এর প্রতিটি খঙ্গ $5 \times 3 \times 2$ সেন্টিমিটার আকৃতি বিশিষ্ট। বিভিন্ন আকারের থাইরয়েড ফলিকল (follicles) দ্বারা গঠিত গঠিত এবং যোজক কলা ও রক্তনালি দ্বারা উক্ত ফলিকলগুলো পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। থাইরয়েড গ্রাহি ক্ষরিত হরমোন ও এদের কাজ হলো-

- ১। থাইরক্সিন (Thyroxine/T4): (i) আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে, (ii) মস্তিষ্ক ও যৌনাপ্রের বিকাশ ঘটায়, (iii) হৎক্রিয়া বৃদ্ধি করে, (iv) দুষ্ক উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- ২। ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (Tri-iodothyronine/T3): (i) এটি আয়োডিন বিপাক, প্রোটিন সংশ্লেষণ ও লাইপোলাইসিস হার বৃদ্ধি করে, (ii) এটি জ্বণীয় বিকাশে ভূমিকা রাখে, (iii) এটি স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩। থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocacitonin/CT): (i) এটি অস্ত্রির ক্যালসিয়াম শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, (ii) এটি ফসফেট বিপাক ও পরিবহন উদ্দীপিত করে, (iii) এটি দেহের ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

IV. প্যারাথাইরয়েড গ্রহি (Parathyroid gland)

থাইরয়েড গ্রহির প্রতি খঙের সম্মুখ-পার্শ্বভাবে একটি করে মোট একজোড়া ক্ষুদ্র, ডিম্বাকৃতির প্যারাথাইরয়েড গ্রহি বিদ্যমান। ধানের দানার মতো এ গ্রহির ওজন 30 মিলিগ্রাম এবং ব্যাস 3-4 মিলিমিটার। এ গ্রহি থেকে প্যারাথরমোন (Parathormone) হরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ: (i) এটি অস্ত্রির ফসফেট ও ক্যালসিয়ামের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, (ii) এটি ফসফেটের রেচন হার বৃদ্ধি করে, (iii) এটি বৃক্কের ক্যালসিয়াম ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

V. থাইমাস গ্রহি (Thymus gland)

শ্বাসনালির দুপাশে দুটি থাইমাস গ্রহি থাকে। এটি অনাক্রম্যতত্ত্বের অংশ গঠন করে। শৈশবে এগুলো বড় থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের কিয়দংশ ঢেকে রাখে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। এগুলো অন্তঃক্ষরা গ্রহি কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ গ্রহি থেকে থাইমোসিন (Thymosin) হরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ: (i) এটি লিফেসাইট ও অ্যান্টিবডি গঠনে সহায়তা করে। (ii) এটি অস্তিত্বে খনিজলবণ জমতে সহায়তা করে।

VI. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স (Islets of Langerhans)

অগ্ন্যাশয়ের কতগুলো কোষ গুচ্ছকারে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে অন্তঃক্ষরা গ্রহির মতো কাজ করে। আবিক্ষারক Paul Langerhans (1869)-এর নামানুসারে এসব কোষগুচ্ছকে Islets of Langerhans বলে। চিত্র ৮.২৫ মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রহি

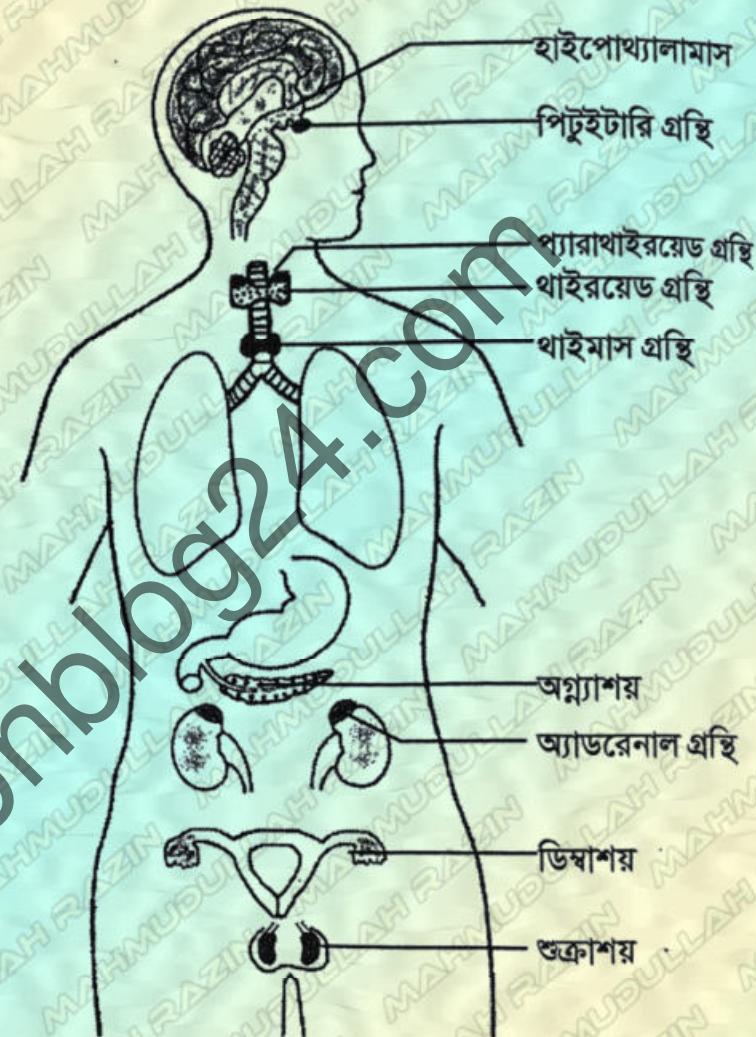
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স অগ্ন্যাশয়ের মাত্র ১-২% গঠন করে এবং আলফা (α), বিটা (β) ও ডেল্টা (δ) নামক তিনি ধরনের কোষ দ্বারা এগুলো গঠিত। এসব কোষগুচ্ছ থেকে ক্ষরিত হরমোন হলো-

□ ইনসুলিন (Insulin): বিটা (β) কোষ (আইলেটস কোষের 65-80%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন- (i) কোষে শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস করে, (ii) যকৃত ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।

□ গ্লুকাগন (Glucagon): আলফা (α) কোষ (আইলেটস কোষের 15-20%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন- (i) যকৃত ও পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং (ii) পরিপাক গ্রহির নিঃসরণ হার কমায়।

□ সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin): ডেল্টা (δ) কোষ (আইলেটস কোষের 5-15%) থেকে ক্ষরিত এ হরমোন দেহে α ও β কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus or diabetes): অগ্ন্যাশয়ের বিটা (β) কোষ যখন যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন করতে পারে না অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস বলে। এ অবস্থায় রক্তে অতিরিক্ত শর্করার (গ্লুকোজ) উপস্থিতির কারণে নানারকম শারীরিক অসামঘন্স্য দেখা দেয়। অনেকে এ রোগকে ‘সকল জটিল রেগের জননী’ বলে চিহ্নিত করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের বৃক্ষ, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, চোখ, দাঁত, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি সকল কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



VII. অ্যাডরেনাল গ্রস্তি বা সুপ্রারেনাল গ্রস্তি (Adrenal gland or suprarenal glands)

প্রতিটি বৃক্কের সম্মুখ প্রান্তে টুপির মতো হলুদ বর্ণের একটি করে গ্রস্তি থাকে। এদের অ্যাডরেনাল গ্রস্তি বা সুপ্রারেনাল গ্রস্তি বলে। ডান বৃক্কের গ্রস্তি ত্রিকোণাকৃতির এবং বাম বৃক্কের গ্রস্তি অর্ধচন্দ্রাকৃতির ও কিছুটা বড়। যোজক কলা গঠিত রেনাল ফেসিয়া বা গ্যারোটা ফেসিয়া (renal fascia or Gerota fascia) নামক একটি সাধারণ আবরণ দ্বারা বৃক্ক ও অ্যাডরেনাল গ্রস্তি উভয়েই আবৃত থাকে। প্রতিটি অ্যাডরেনাল গ্রস্তি প্রায় 5 সেন্টিমিটার লম্বা, 3 সেন্টিমিটার প্রশস্ত এবং 1 সেন্টিমিটার পুরুষ বিশিষ্ট। পরিণত মানুষের দুটি অ্যাডরেনাল গ্রস্তির ওজন 7-10 গ্রাম হয়ে থাকে। প্রতিটি গ্রস্তি বহির্ভাগে কর্টেক্স এবং অন্তর্ভাগে মেডুলা নিয়ে গঠিত। এ গ্রস্তি থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় তাদের নাম ও কাজ উল্লেখ করা হলো-

	হরমোনের নাম	কাজ
কর্টেক্স ক্ষরিত	গ্লুকোকর্টিকয়েড/কর্টিসল (Glucocorticoids/Cortisol)	(i) এটি যকৃত ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ উদ্দীপ্তি করে। (ii) এটি অক্ত থেকে চিনি ও লিপিড শোষণ হার বৃদ্ধি করে।
	মিনারেলোকর্টিকয়েড/অ্যালডোস্টেরন (Mineralocorticoids/ Aldosterone)	(i) এটি বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। (ii) এটি রক্তের প্লাজমার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। (iii) এটি পটাসিয়ামের (K) রেচন হার বৃদ্ধি করে।
	গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoids)	(i) এটি জনের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) এটি যৌন গ্রস্তি, যৌন অঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।
মেডুলা ক্ষরিত	এপিনেফ্রিন/অ্যারেনালিন (Epinephrine/ Adrenaline)	(i) এটি হৃৎক্রিয়া, রক্তচাপ ও শর্করা বিপাক হার বৃদ্ধি করে। (ii) এটি মৃত্যু উৎপাদন হ্রাস করে। (iii) এটি ভয়, উচ্ছাস ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
	নরএপিনেফ্রিন/নরঅ্যারেনালিন (Norepinephrine/ Noradrenaline)	(i) এটি দেহের রক্তচাপ ঠিক রাখে। (ii) এটি রক্তনালিকার সঙ্কোচন ঘটায়ে প্রয়োজনে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। (iii) চোখে অক্ষর উৎপাদন বৃদ্ধি করে চোখকে সিঙ্গ রাখে।

VIII. গ্যাস্ট্রিক গ্রস্তি (Gastric Glands) ও আংতিক গ্রস্তি (Intestinal glands)

পৌষ্টিকনালির প্রাচীরের অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রস্তি ও আংতিক গ্রস্তি থেকে ক্ষরিত হরমোনকে গ্যাস্ট্রিক হরমোন বলে এবং এরা খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের খাদ্য পরিপাকের সংশ্লিষ্ট হরমোনগুলোর বিবরণ এ পুস্তকের ৩য় অধ্যায় অর্থাৎ খাদ্য ও পরিপাক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

IX. পিনিয়াল বডি (Pinial body)

এটি একটি গোলাকার গ্রস্তি। একটি সরু বোঁটা দ্বারা এটি মন্তিকের ডায়েনসেফালনের ছাদে সংযুক্ত থাকে। এ গ্রস্তি থেকে মেলাটোনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যাহা তৃকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

X. শুক্রাশয় (Testis), ডিম্বাশয় (Ovaries) ও অমরা (Placenta) থেকে ক্ষরিত হরমোনের বিবরণ ও কাজ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরমোন (Hormone)

গ্রিক শব্দ *Hormao* = to excite বা উৎসেজিত করা হতে Hormone শব্দটির উৎপত্তি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Starling এবং Bayliss (1904) সর্বপ্রথম Hormone শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে ‘হরমোন হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়ে লসিকা বা রক্ত বাহিত হয়ে দূরবর্তী অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ বা কোষগুচ্ছসমূহকে প্রভাবিত করে।’

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রস্তি, জননাঙ্গ এবং পৌষ্টিকনালির কিছু গ্রস্তি হতে হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোনের জৈব সংশ্লেষণ, সম্ভব্য, জৈব রাসায়ন, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি এবং অন্তঃক্ষরা গ্রস্তিসমূহের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কিত অধ্যয়নকে এন্ডোক্রাইনোলজি (Endocrinology) বলে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য

১। হরমোন এক অঙ্গের কোনো কোষ হতে ক্ষরিত হয়ে রক্ত বা লসিকা দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী অন্য অঙ্গের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

২। হরমোন দেহে রাসায়নিক বার্তাবাহক (chemical messengers) হিসেবে কাজ করে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক সমন্বয় ঘটায়।

৩। ভিটামিনের মতো হরমোন খুব কম ঘনত্বে ও অল্পমাত্রায় কাজ করে।

৪। হরমোনের কোন ক্রমবধিষ্ঠ প্রভাব (cumulative effect) নেই, স্বীয় কার্য শেষে হরমোন বিনষ্ট হয় এবং রেচেন প্রক্রিয়ায় দেহ হতে নিঙ্গাত হয়।

৫। হরমোন দেহের কোনো ক্রিয়া বা প্রক্রিয়ার বিস্তারকে প্রভাবিত করে কিন্তু এসব ঘটনার সূচনা ঘটাতে পারে না।

৬। হরমোনের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিটামিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

৭। হরমোন কিছু প্রক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কিছু প্রক্রিয়ার দৈত নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। রক্তে প্লুকোজের মাত্রা, দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে একাধিক হরমোন অংশগ্রহণ করে।

৮। রাসায়নিকভাবে অধিকাংশ হরমোনই পেপটাইড, প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন বা স্টেরয়েড জাতীয়।

৯। অধিকাংশ হরমোনই পানিতে দ্রবণীয় বলে রক্ত বা লসিকা বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছাতে পারে।

১০। হরমোন দেহের বিভিন্ন কলা ও তন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১। হরমোন বহিঃকোষীয় তরলের উপাদান সঠিক রেখে কোষ ও তরলের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

১২। হরমোনের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার কারণে অধিকাংশ হরমোন গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করা যায়।

অনাল গ্রাহি (Endocrine glands) ও সনাল গ্রাহির (Exocrine glands) মধ্যে পার্থক্য

অনাল গ্রাহি বা অন্তঃক্ষরা গ্রাহি	সনাল গ্রাহি বা বহিঃক্ষরা গ্রাহি
১। দেহের নালিবিহীন গ্রাহিসমূহকে অনাল বা অন্তঃক্ষরা গ্রাহি বলে।	১। দেহের নালিযুক্ত গ্রাহিসমূহকে সনাল বা বহিঃক্ষরা গ্রাহি বলে।
২। অনাল গ্রাহি থেকে প্রাণরস বা হরমোন ক্ষরিত হয়।	২। সনাল গ্রাহি থেকে বিভিন্ন এনজাইম ও মিউকাস নিঃসৃত হয়।
৩। হরমোন রক্ত ও লসিকা দ্বারা বাহিত হয়।	৩। এনজাইম ও মিউকাস নালি দ্বারা বাহিত হয়।
৪। এসব গ্রাহি থেকে স্বল্প মাত্রায় হরমোন ক্ষরিত হয়ে দেহের দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	৪। এসব গ্রাহি থেকে অধিক মাত্রায় নিঃসৃত এনজাইম ও মিউকাসের কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষণিক।
৫। উদাহরণ - পিটুইটারি গ্রাহি, অ্যাডোরেনাল গ্রাহি, থাইরয়েড গ্রাহি ইত্যাদি।	৫। উদাহরণ- লালগ্রাহি, যকৃত, অঘ্যাশয়ের সনাল অংশ ইত্যাদি।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা

মানবদেহের বৃদ্ধিতে দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা রাখে। এগুলো হলো-পিটুইটারি গ্রাহি ক্ষরিত ঘোথ হরমোন (Growth Hormone-GH) এবং থাইরয়েড গ্রাহি ক্ষরিত থাইরেক্সিন হরমোন (Thyroxine Hormone or T4 hormone)। মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে এ দুটি হরমোন নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে-

দেহের বৃদ্ধিতে ঘোথ হরমোনের ভূমিকা

ঘোথ হরমোন বা সোমাটোট্রোপিক হরমোন বা সোমাটোট্রোপিন 191টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত এক শিকল বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু। মানুষের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিতে এ হরমোন প্রধান ভূমিকা রাখে বলে একে ঘোথ হরমোন বলা হয়। মানুষের বৃদ্ধিজনিত অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ এ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন-



চিত্র ৮.২৬ হরমোনের ক্রিয়া

১। **কক্ষালতস্ত্রের বৃদ্ধি:** গ্রোথ হরমোন অস্থি ও তরঙ্গাস্ত্রের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে। গ্রোথ হরমোনের বহুমুখী প্রভাব অস্থির বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত উপায়ে ভূমিকা রাখে:

- এ হরমোন ক্রিওসাইট ও অস্টিওসাইটে প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
- এটি অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।
- এটি ক্রিওসাইট ও অস্টিওসাইট বিভাজন হার হার বৃদ্ধি।
- এটি ক্রিওসাইট কোষকে অস্টিওসাইটে রূপান্তর করে, ফলে অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। **বিপাক:** গ্রোথ হরমোনের সুনির্দিষ্ট বিপাকীয় প্রভাব রয়েছে যা দেহের বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, যেমন-

- এ হরমোন কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহে পেশির বৃদ্ধি ঘটে।
- এটি দেহে সঞ্চিত অ্যাডিপোজ কলা থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে তুরান্বিত করে রক্তে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের ক্ষয়রোধ হয়।
- এটি দেহ কর্তৃক গ্লুকোজ ব্যবহারের হার কমায়।

৩। **আয়ন বৃদ্ধি:** গ্রোথ হরমোন দেহে বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যেগুলো দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। এটি অন্ত হতে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) শোষণ এবং বৃক্ষ হতে বিভিন্ন আয়ন পুনঃশোষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৪। **অঙ্গের আকার বৃদ্ধি:** এ হরমোন অবিরাম প্রোটিন সংশ্লেষণ উদ্দীপিত করে এবং মস্তিষ্ক ব্যতিত দেহের সকল নরম অসাদির আকার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক অবস্থা ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। **দুঃখ উৎপাদন:** এ হরমোন অধিক দুঃখ উৎপাদনে স্তন্ধাস্তিকে প্রভাবিত করে যা শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে।

৬। **লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি:** এটি এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoiesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৭। **ওষুধ হিসেবে ব্যবহার:** শিশুদের অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের হরমোন স্বল্পতার চিকিৎসায় গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বৃদ্ধি হওয়া ও স্থলতা রোধে গ্রোথ হরমোন খেরাপি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৮। **অস্বাভাবিক নিঃসরণ:** দেহে অস্বাভাবিক গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের কারণে মানবদেহে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-

- **বামনত্ত্ব (Dwarfism):** শিশুকালে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ না হলে মানুষ বামন হয়।
- **দৈত্যত্ত্ব (Gigantism):** শিশুকালে অস্থি গঠনের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষ দৈত্যাকৃতির হয়।

■ **গরিলাত্ত্ব (Acromegaly):** বয়স্ক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষের হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গরিলার মতো রূপ ধারণ করে।

দেহের বৃদ্ধিতে থাইরাস্কিন হরমোনের ভূমিকা

থাইরাস্কিন হরমোন (THs) মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে ভূমিকা রাখে-

১। এ হরমোন পিটুইটারি প্রাণ্তিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে এবং গ্রোথ হরমোনের ক্রিয়াকে তুরান্বিত করে।

২। এটি দেহের গাঠনিক প্রোটিনের সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

৩। থাইরাস্কিন হরমোন বিভিন্ন কলার বিভেদেন ও পরিপক্বার জন্য অত্যাবশ্যক। এর অভাবে অস্থির অসিফিকেশন ঘটে না এবং মানুষ পূর্ণাঙ্গে পরিণত হয় না।

৪। থাইরাস্কিন হরমোন সকল ধরনের খাদ্যের বিপাক হার বৃদ্ধি করে যা দেহের বৃক্ষির জন্য অত্যাবশ্যক।

৫। এ হরমোন নিউরনের বিকাশ ও পূর্ণতা এবং মায়েলিন আবরণ সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।

৬। এ হরমোন কক্ষালপেশীর বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। এ হরমোন তরঙ্গাস্ত্রের বিভেদেন ও পরিপক্বার জন্য অত্যাবশ্যক। এটি অস্থির দৈর্ঘ্যে ও বেধে বৃদ্ধি ঘটায়।

৮। এটি লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি, দুষ্ফ উৎপাদন, প্রজননতত্ত্ব ও পৌষ্টিকতত্ত্বের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৯। অতিরিক্ত বা অল্প থাইরাস্টিন ক্ষরণ উভয়েই দেহের জন্য ক্ষতিকর। দেহে অতিরিক্ত থাইরাস্টিন ক্ষরণ (hyperthyroidism) হলে গয়টার বা গলগণ (goitre) রোগ হয়। আবার কম থাইরাস্টিন ক্ষরণ (hypothyroidism) হলে শিশুদের ক্রিটিনিজিম (cretinism) এবং বয়স্কদের মিক্সিডেমা (myxedema) রোগ হয়।

দেহের বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের ভূমিকা

মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে অন্যান্য যেসব হরমোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-ইনসুলিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, সেক্স স্টেরয়েড, প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ রিলিজিং হরমোন, ক্যালসিটোনিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড ইত্যাদি।

দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে হরমোনের ভূমিকা

প্রায় 50 ধরনের হরমোন মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে জড়িত। এরা মানবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে নিম্নলিখিতভাবে ভূমিকা রাখে:

১। খাদ্য পরিপাক: গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, এন্টারোক্রাইনন, পেপটাইড YY ইত্যাদি হরমোন খাদ্য পরিপাককারী বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ উদ্দীপিত করে।

২। বিপাক ক্রিয়া: ইনসুলিন, গ্লুকাগন, থাইরাস্টিন, STH ও ACTH লিপিড বিপাকে; ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ইপিনেফ্রিন, ভেসোপ্রেসিন, থাইরাস্টিন, সেক্স হরমোন শর্করা বিপাকে এবং থাইরাস্টিন, টেস্টোস্টেরন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। রেচন: অ্যালডোস্টেরন হরমোন বৃক্তের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা এবং K⁺ রেচন হার বৃদ্ধি করে; ইপিনেফ্রিন হরমোন মৃত্র উৎপাদন হাস করে।

৪। রক্তচাপ: ইপিনেফ্রিন, নরইপিনেফ্রিন, ভেসোপ্রেসিন হরমোন হৎক্রিয়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৫। প্রোটিন সংশ্লেষণ: থাইরাস্টিন, গ্রোথ হরমোন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন হরমোন কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করে।

৬। পানি সাম্যতা রক্ষা: ভেসোপ্রেসিন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড বৃক্তকে অতিরিক্ত পানি শোষণে উদ্দীপিত করে দেহের পানি সাম্যতা রক্ষা করে।

৭। আয়ন পরিবহন: অ্যালডোস্টেরন হরমোন কোষ ও দেহতরলের Na^+ , K^+ আয়ন সাম্যতা রক্ষা করে।

৮। প্রজননে: ইস্ট্রোজেন ঝর্তুচক্র ও স্তনগ্রস্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোজেস্টেরন জরায়ুর প্রাচীরে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রস্থির বিকাশ ঘটায় এবং টেস্টোস্টেরন শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বৃদ্ধ করে।

৯। সন্তান প্রসবে: প্রসবের সময় রিলাস্টিন শ্রোগিনেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অঞ্জিটোসিন জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে প্রসব কাজ তুরান্বিত করে।

১০। বয়োসন্ধি: টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও গোনালোকর্টিকয়েড দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১। দুষ্ফ ক্ষরণ: গ্রোথ হরমোন, থাইরাস্টিন, ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন গর্ভবতী ও সন্তান প্রসবকারী মায়ের স্তনগ্রস্থির বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১২। দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ: মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তৃকের বর্ণ নির্ধারণ করে।

১৩। শোষণ: অ্যালডোস্টেরন হরমোন বৃক্তের Na^+ শোষণ, প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন হরমোন বৃক্তের Ca^{++} শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১৪। রোগ প্রতিরোধ: থাইমোসিন হরমোন লিফোসাইট ও অ্যান্টিবডি উৎপাদন উদ্দীপিত করে দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৮.৫ মানুষের আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব

বিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব নিয়ে বহুবছর যাবৎ গবেষণা করছেন। এসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর আজও বিজ্ঞানীগণ পায়নি, তবুও এসংক্রান্ত তাদের অনেক মতবাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা পেয়েছেন। মানুষের উদ্যোগতা, রাগ, অনুরাগ, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, আগ্রাসন প্রভৃতি আচরণ হরমোন নিয়ন্ত্রিত বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। Morris and Maisto (2002) এর মতে অন্তঃক্ষরা গ্রাহিত হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করে এবং মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ ও আচরণ প্রকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মন-মানসিকতার উপর রয়েছে হরমোনের যাদুকরি প্রভাব। হরমোনের কারণে ব্যক্তির মনমেজাজের উঠানামা হয়। মানুষের আচরণের অসঙ্গতি, মানসিক বিশ্ঞুজ্ঞান ও মনের বিকার সাধনেও রয়েছে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাব।

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রাহিত ক্ষরিত হরমোন মানুষের আচরণে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১। থাইরক্সিন (Thyroxine): অস্বাভাবিক মাত্রার থাইরক্সিন ক্ষরণ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, মনোযোগ ত্বাস করে, কাজের প্রতি অনগ্রহ সৃষ্টি করে এবং অনিদ্রা, ক্লান্তি ও উৎকঢ়ান বৃদ্ধি করে।

২। প্যারাথরমোন (Parathormone): এ হরমোন নিঃসরণ উত্তেজনার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

৩। মেলাটোনিন (Melatonin): মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রাহিত মেলাটোনিন হরমোন মানুষের ঘুম-জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোনের অসম ক্ষরণ মানুষের অনিদ্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। টেস্টোস্টেরন (Testosterone): শুক্রাশয় থেকে অধিক মাত্রায় টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণের ফলে মানুষের উগ্রতা বেড়ে যায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া ছেলেদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথাবলার দক্ষতা এবং অনুধাবন ক্ষমতা এ হরমোন ক্ষরণের সাথে সম্পৃক্ত।

৫। ইস্ট্রোজেন (Estrogen): মেয়েদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথাবলার দক্ষতা এবং অনুধাবন দক্ষতা ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণের সাথে সম্পৃক্ত।

৬। অ্যাডরেনালিন (Adrenaline): বৃক্ষ সংলগ্ন অ্যাডরেনাল গ্রাহিত ক্ষরিত অ্যাডরেনালিন হরমোন মানসিক চাপ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিগত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।

৭। ইপিনেফ্রিন (Epinephrine): Morris and Maisto (2002) এর মতে অ্যাডরেনাল গ্রাহিত ক্ষরিত ইপিনেফ্রিন হরমোন মানুষের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে।

৮। নরইপিনেফ্রিন (Norepinephrine): অ্যাডরেনাল গ্রাহিত ক্ষরিত নরইপিনেফ্রিন হরমোন মানুষের মানসিক চাপ, আক্রমণ ও পলায়ন আচরণ বেশিক্ষিত নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। অন্যান্য হরমোন (Other hormone): পিটুইটারি গ্রাহিত ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন অন্যান্য সকল হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ গ্রাহিত ক্ষরিত হরমোনগুলো মানুষের সকল ধরনের আচরণের সাথে জড়িত। এ গ্রাহিত থেকে অ্যাড্রিনাল কর্টিকোট্রিফিক হরমোন (ACTH) ক্ষরণের জন্যই মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভবপর হয়।

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণে অনেক মানুষে স্থায়ী বিষণ্নতা দেখা দেয় যা তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। সবচেয়ে শক্তিশালী হরমোনাজনিত ক্রিয়া সম্ভবত মানুষের প্রেম-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাৎক্ষণিক যৌন আকর্ষণ সাধারণত একটি হরমোনজনিত সাড়াদান। অনেকক্ষেত্রে হরমোনের ক্রিয়ার প্রভাব খুব নির্ভর হয়ে থাকে। যেমন- বছরের অন্য সময় অধিকাংশ মানুষ বিষণ্নতায় ভুগলেও বসন্তকালে প্রেমে পড়ে ও কবি হয়ে যায়।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

হরমোন হচ্ছে শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে সহায়তা করে। আমাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবেই সর্বদা হরমোন উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে দেহে প্রভাব বিস্তার করে। তবে কিছু হরমোনের মাত্রা বয়সকালে কমতে থাকে অথবা আমাদের দেহও পর্যাপ্ত হরমোন উৎপন্ন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে হরমোন প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়। এসব হরমোনের মধ্যে হিউমেন গ্রোথ হরমোন (Human growth hormone-

HGH) ও স্টেরয়েড হরমোন (এন্ড্রোস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন) প্রধান। শিশু ও বয়স্কদের কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় এসব হরমোন ব্যবহার করা হয়। তবে এদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যে বিপরীতমূলী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিশ্বব্যাপী পুরুষেরা যৌবন ধরে রাখার জন্য সেক্স হরমোন টেস্টোস্টেরন ও HGH ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে 1999 সালে পুরুষ হরমোন হিসেবে বিবেচিত টেস্টোস্টেরনের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয় মাত্র 64 হাজার ৪শ টি, অর্থাৎ 2008 সালে এ হরমোনের প্রেসক্রিপশন ছিল প্রায় 33 লক্ষ। মধ্যবয়সী পুরুষেরা বয়স ধরে রাখতে এ হরমোন ব্যবহার করছেন বলে সম্প্রতি এ তথ্যটি দিয়েছেন *The Los Angeles Times* পত্রিকা। এছাড়া বয়স ধরে রাখার জন্য কিংবা শরীরে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই HGH ব্যবহার করে থাকে। ক্রীড়াবিদরা দেহের অতিরিক্ত শক্তি ও দম পাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন গ্রহণ করছেন। এসব হরমোনের অতিরিক্ত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে মানুষের নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দেয়:

- ১। দেহ ও মূখমণ্ডলের ত্বকের বিভিন্ন অংশে আঘাতনি (acne) বা বিশ্রী দাগ পড়।
- ২। স্তন অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যায়, একে গাইনেকোমাস্টিয়া (gynecomastia) বলে।
- ৩। অপরিণত বয়সে মাথায় টাক দেখা দেয়।
- ৪। দেহের ভাল কোলেস্টেরল HDL (high density lipoprotein) এর মাত্রা কমে যায় এবং মন্দ কোলেস্টেরল LDL (low-density lipoprotein) এর মাত্রা বেড়ে যায়।
- ৫। HGH গ্রহণে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।
- ৬। অ্যাক্রোমেগালি (acromegaly) রোগ হয়, এক্ষেত্রে দেহে অস্বাভাবিকভাবে বেশি লোম গজায়।
- ৭। পেশির দুর্বলতা ও হৃৎরোগ দেখা দেয়।
- ৮। প্রোস্টেট ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।
- ৯। বৃক্কের অকার্যকারিতা, লিভার টিউমার, লিভার অকার্যকারিতা, শুক্র উৎপাদন ক্ষমতাহাস, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, যৌন ক্ষমতাহাস ইত্যাদি দেখা দেয়।
- ১০। আচরণে রক্তক্ষতা, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়।

বার্ধক্য রোধে নিজ থেকে হরমোন প্রয়োগ করা ঠিক নয়। আমাদের দেশে অনেক হাতুড়ে ডাক্তার অথবা যারা ফার্মেসিতে ওষুধ বিক্রি করেন অথবা সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারও তাদের প্রাত্যহিক প্র্যাকটিস জীবনে যৌন সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর হরমোন পরিষ্কা না করে সরাসরি হরমোন ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দেন বা ব্যবস্থাপত্র দেন। এটি কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বার্ধক্যের সব যৌন সমস্যা বা যৌন দুর্বলতার কারণই হরমোনজনিত নয়। কাজেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

সারসংক্ষেপ

- **নিউরোট্রান্সমিটার:** যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা কোনো গ্রিস্টিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে।
- **রিফ্রাকটরি পিরিয়ড:** স্নায়ু উদ্দীপনা নিউরন অতিক্রম করার সাথে সাথে ক্রিয়া বিভবের সমাপ্তি ঘটে এবং নিউরন পর্দা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ পর্দার বাইরের Na^+ ও ভেতরের K^+ পূর্ববস্থায় ফিরে আসে। একে নিউরনের রিফ্রাকটরি পিরিয়ড বলে এবং এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়।
- **স্যালিটারি কনডাকশন:** মায়েলিন আবরণযুক্ত অ্যাক্রিন দ্বারা এধরনের দ্রুত গতির স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনকে সাফিয়ে সঞ্চালন বা স্যালিটারি কনডাকশন বলে।
- **করোটিক স্নায়ু:** যেসব স্নায়ু মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপত্তিলাভ করে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে।

- স্টেরিওক্ষেপিক দৃষ্টি:** মানুষ দ্বিন্দের দৃষ্টি সম্পর্ক প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে। এধরনের দর্শনকে ঘণবীক্ষন দৃষ্টি বা স্টেরিওক্ষেপিক দৃষ্টি বলা হয়।
- হরমোন:** হরমোন হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়ে রক্তস্নাত দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ বা কোষগুচ্ছসমূহকে প্রভাবিত করে।

- শ্লায়ুতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ড 100 মিটার (328 ফুট) গতিতে শ্লায়ু উদ্বীপনা পরিবাহিত হয়।
- শ্লায়ুকোষ বা কলা ক্ষয়ের কারণে প্রচঙ্গ ব্যাথা, অনুভূতিহীনতা কিংবা পেশির নিয়ন্ত্রণহীনতার সৃষ্টি হয়।
- মানবদেহের সকল নিউরনকে একত্রে সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করলে এটি প্রায় 600 মাইল লম্বা হবে।
- নবজাতক শিশুর মস্তিষ্কের আয়তন প্রথম বছরেই প্রায় 3 গুণ বৃদ্ধি পায়।
- মানব মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি এবং মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।
- মানব মস্তিষ্কের পৃষ্ঠাতলের মোট আয়তন প্রায় 25000 বর্গ সেন্টিমিটার।
- যে কোনো সময় মানুষ তার মস্তিষ্কের মাত্র 4% কোষ বা নিউরন ব্যবহার করে।
- নিউরন মানবদেহের সবচেয়ে বড় কোষ হলেও এদের কখনোই মাইটোসিস বিভাজন হয় না।
- মানবদেহে যত শক্তি উৎপাদিত হয় তার একটি বড় অংশ (20%) ব্যবহার করে মস্তিষ্ক।
- মস্তিষ্কের মোট ওজনের 75%ই পানি যা এর বিভিন্ন শুরুতপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
- মস্তিষ্কে প্রায় 150,000 মাইল রক্তনালিকা থাকে যাতে উচ্চগতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- মানবদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রহি থেকে প্রায় 30 ধরনের হরমোন ক্ষরিত হয় যারা সুনির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করে।
- প্রকৃতপক্ষে দেহের সকল ধরনের জৈবিক কার্যাবলিতে হরমোনের হস্তক্ষেপ থাকে।
- ইনসুলিন হরমোন মানবদেহে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় 387 মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত।
- ইনসুলিন হরমোন আবিষ্কারের জন্য Frederick Banting ও John Macleod নামক দুজন বিজ্ঞানীকে 1923 সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুশীলনী

বৃত্তনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

- মানব মস্তিষ্ক হতে উদ্ভৃত করেটিক শ্লায়ুর সংখ্যা কত?

ক. ১২ জোড়া	খ. ১০ জোড়া	গ. ১০টি	ঘ. ১২টি
-------------	-------------	---------	---------
- হাইপোথালামাস মস্তিষ্কের কোন অংশে থাকে?

ক. প্রেসেনসেফালন	খ. মেসেনসেফালন	গ. রম্বেনসেফালন	ঘ. মেটেনসেফালন
------------------	----------------	-----------------	----------------
- সেরেব্রোমের কাজ-*i.* অনেকিক পেশির সংঘালন নিয়ন্ত্রণ করে, *ii.* বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা ও কর্মপ্রেণণা সৃষ্টি করে,
iii. এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; -নিচের কোনটি সঠিক?

ক. <i>i</i> ও <i>ii</i>	খ. <i>i</i> ও <i>iii</i>	গ. <i>ii</i> ও <i>iii</i>	ঘ. <i>i</i> , <i>ii</i> ও <i>iii</i>
-------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------

কান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। মাথার দুপাশে চোখের পিছনে দুটি কান অবস্থিত। প্রতিটি কান করেটির অডিটরি ক্যাপসুলে অবস্থিত। -উদ্বীপকের আলোকে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
- কোনটি মধ্যকর্পের অস্থি নয়?

ক. মেলিয়াস	খ. ইনকাস	গ. প্যাটেলা	ঘ. স্টেপিস
-------------	----------	-------------	------------
- উদ্বীপকে উল্লেখিত অঙ্গটির ক্ষেত্রে -*i.* এর কেন্দ্রভাগ এন্ডোলিফ্ফ নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে, *ii.* এতে বিদ্যমান ইউট্রিকুলাস ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ, *iii.* কানের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত- নিচের কোনটি সঠিক?

ক. <i>i</i> ও <i>ii</i>	খ. <i>i</i> ও <i>iii</i>	গ. <i>ii</i> ও <i>iii</i>	ঘ. <i>i</i> , <i>ii</i> ও <i>iii</i>
-------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------
- দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন কোনটি?

ক. সোমাটেট্রফিন	খ. থাইরক্সিন	গ. প্রোল্যাকটিন	ঘ. অ্যাড্রিনালিন
-----------------	--------------	-----------------	------------------

ନିଚେର ଉଦ୍ଦିପକ୍ଷେର ଆଲାକେ ୧୦ ଓ ୧୧ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଉଁ:-

হরমোনের নাম	উৎস	কাজ
	বিটা কোষ	
X	আলফা কোষ	
	ডেলটা কোষ	
পলিপেপ্টাইড		পাক অঙ্গীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে

- | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ১০. | উদ্বীপকে উল্লিখিত ছক কোন গ্রন্থিকে নির্দেশ করে ? | | |
| | ক. যকৃৎ | খ. অগ্ন্যাশয় | গ. লালাঘাস্তি |
| ১১. | উদ্বীপকে X চিত্রে চিহ্নিত যৌগটির কাজ কি ? | | ঘ. আন্তরিক গ্রন্থি |
| | ক. রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে | খ. রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস করে | গ. ইনসুলিন ও গুকাগন ক্ষরণে বাধা দেয় |
| ১২. | মস্তিষ্কের কোন অংশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? | | ঘ. pH এর মান নিয়ন্ত্রণ করে |
| | ক. সেরেব্রোম | খ. সেরেবেলাম | গ. থ্যালামাস |
| ১৩. | মস্তিষ্কের কোন অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পন্দনহার ইত্যাদি শুরুত্তপূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। | | ঘ. হাইপোথ্যালামাস |
| | ক. সেরেব্রোম | খ. সেরেবেলাম | গ. মেডুলা |
| ১৪. | অষ্টম করোটিক স্নায়ুর কাজ কি? | | ঘ. পনস্ |
| | ক. স্বাদ | খ. দর্শন | গ. শ্রবণ |
| ১৫. | পচার্থ পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন কোনটি? | | ঘ. স্বাগ |
| | ক. STH | খ. TSH | গ. FSH |
| ১৬. | নিচের কোনটি মিশ্র প্রকৃতির করোটিক স্নায়ু? | | ঘ. ADH |
| | ক. অপটিক | খ. ট্রিকলিয়ার | গ. অডিটরি |
| ১৭. | নিচের কোনটির গঠন পর্যাচানো? | | ঘ. ভেগাস |
| | ক. কর্ণছত্র | খ. ককলিয়া | গ. অ্যাম্পলা |
| | | | ঘ. ইনকাস |

সূজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)



- (ক) অঙ্কবিন্দু কি?
(খ) উপযোজন বলতে কি বুঝা?
(গ) উদ্দীপকের A চিহ্নিত অংশের গঠন ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের অঙ্গটির সার্বিক কার্যকলাপ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী-ব্যাখ্যা কৰ।

২। তাজুলের বয়স ২২ বছর হলেও তার মুখে কোনো দাঢ়ি গৌঁফ নেই। এ নিয়ে বন্ধুরা অনেক মসকরা করে। ডাক্তারের নিকট গেলে কয়েকটি পরীক্ষা করে বলেন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের অভাব তার এ অবস্থার জন্য দায়ী।

- (ক) মাস্টার গ্ল্যান্ড কোনটি?
(খ) হরমোন বলতে কী বোঝ?
(গ) উদ্ধীপকে উল্লেখিত যে রাসায়নিক পদার্থের কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য লেখ।
(ঘ) উদ্ধীপকে উল্লেখিত রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবদেহের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।